বেদান্ত প্রবেশ

("ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত" গ্রন্থের ভূমিকা)

GIFTED BY
RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্ত-বিদ্যার্ণব

ভূমিকা লেখক

মহামহিমোপাধ্যায় ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, M.A., D. Litt, কাব্য ব্যাকরণ ন্যায়তীর্থ, অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত।

এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত।

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

* * *

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

মুদ্রাকর :
এ. টি. দাস
রূপশ্রী প্রেস
১৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম মুদ্রণ—১৩৪৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৩৪৭

© শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায়

মূল্য—১৮.০০ টাকা।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :
ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত,
১ম খণ্ড—৫০.০০ টাকা,
২য় খণ্ড—৭০.০০ ,, ,
৩য় খণ্ড—৫০.০০ ,, ,
গায়ত্রী রহস্য (যন্ত্রস্থ),
মাতৃপূজা বা চণ্ডীরহস্য।
অপ্রকাশিত :
অপরোক্ষানুভূতি,
শান্তি গীতা,
রামগীতা,
নাম মহিমা।

দ্বিতীয় মুদ্রণের নিবেদন

পরমারাধ্য পিতৃদেব "বেদান্ত প্রবেশ" পুস্তকটি প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত করান ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে। "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদভাগবত" গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত "বেদান্ত প্রবেশ" একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ। বেদান্তের বিষয় সমূহ, বিশেষ করে ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বসমুদায় অতি সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় এতে লেখা হয়েছে। "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত" সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকবর্গ সহজে এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদনের জন্য নিজেকে উপযোগী করে তোলার কাজে "বেদান্ত প্রবেশ" এর সাহায্য প্রার্থনা করবেন—একথা লেখক স্বয়ং অনুমান করেছিলেন। এখন বাস্তবে তা উপলব্ধি করছি কারণ "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত" গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পাঠক এই পুস্তকটি পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন। পূর্বে মুদ্রিত "বেদান্ত প্রবেশ" নিঃশেষিত হওয়ায় ফার্মা কে, এল, এমের সত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় পুনরায় "বেদান্ত প্রবেশ" মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন। সার্ব্বজনীন হিতাকাঙ্খায় তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

পরমভক্তিভাজন, পণ্ডিত কুলতিলক ডঃ শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের এই ভূমিকা পুস্তকটির অভিনব ভূমিকা লিখন আমার ৺পিতৃদেবকে মহিমামণ্ডিত করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত ন্যায়তীর্থ মহাশয়কে স্মরণীয় করে রাখবে। ৮৮ বৎসর বয়স্ক এই পণ্ডিত প্রবরের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁকে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক পরম ভাগবত ডঃ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী মহোদয় সারগর্ভ মুখবন্ধ লিখে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নতুন সংস্করণে কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থেকে গিয়েছে। এর জন্য আমি দুঃখিত।

২১-ডি মহেন্দ্র রোড,
কলিকাতা—২৫,

শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায়

প্রথম মুদ্রণের নিবেদন

পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিককাল বেদান্ত ও শ্রীমদ্ ভাগবত আলোচনা করিয়া আসিতেছিলাম; উক্ত আলোচনায় উভয়ের আশ্চর্য্য ঐক্যভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং উভয়ের মিল একখানি খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ফলে মৎকৃত "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থের উৎপত্তি। বর্ত্তমান মুদ্রিত "বেদান্ত প্রবেশ" উক্ত "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থের ভূমিকারূপে লিখিত হইয়াছিল এবং উহা মূল গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত করিব, এই ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন উক্ত ইচ্ছা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু আমার ভ্রাতা, আত্মীয়, হিতৈষী বন্ধু এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তি, ভূমিকাটি পাঠ করিয়া, উহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায়, উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। যদি বর্ত্তমান গ্রন্থ, জিজ্ঞাসু পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়, এবং তাহা হইতে তাঁহাদিগের মূলগ্রন্থ পাঠের আগ্রহ অনুধাবন করিতে সমর্থ হই, অধিকন্তু মূলগ্রন্থ ছাপাইবার ব্যয়ভার বহন করিবার সামর্থ্য ভগবান প্রদান করেন, তবে উহা ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারি, নতুবা উহা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় থাকিয়া বহুদিনের জন্য বংশপরম্পরায় সহস্র সহস্র কীটের আহার সংস্থাপনের কারণ হইয়া সার্থকতা লাভ করতঃ ধন্য হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ভাগবতের শ্লোক সংখ্যাদি বহরমপুরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তক হইতে প্রদান করিয়াছি এবং শ্লোকের বাঙ্গলা অর্থ তাঁহারই পুস্তক হইতে বহুস্থানে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অথবা অধিকতর সরল করিবার জন্য অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। কিমধিকমিতি—

শ্রীরামপদ দেবশর্ম্মা



৺রামপদ চট্টোপাধ্যায়

॥ জন্ম ॥

১লা চৈত্র, বুধবার, ১২৭৯

১৫ই মার্চ, ১৮৭২

॥ মৃত্যু ॥

২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

বাবা,

আজ "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের" সমাপ্তি খণ্ড ও সেই সঙ্গে "বেদান্ত প্রবেশ" প্রকাশনের মাধ্যমে আমার কর্তব্য আংশিক সমাধা হ'ল। আপনার পূর্বপ্রকাশিত, বর্তমানে নিঃশেষিত, গ্রন্থদ্বয় "গায়ত্রী রহস্য" এবং "চণ্ডীরহস্য বা মাতৃপূজা" ও অন্য অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করার একান্ত বাসনা রইলো। ঈশ্বরের করুণায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে সে প্রচেস্টায় সফল হতে পারলে আমার জীবন ধন্য মনে করবো।

১৫ই পৌষ, ১৩৪৭

শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায়

ওঁম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

উৎসর্গ

পিতৃদেব!

আপনার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিবার সৌভাগ্য ছাত্র জীবনে কিছুদিন পাইয়াছিলাম; তাহা হইতেই শ্রীমদ্ ভাগবতের মাধুর্য্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া উহার আলোচনায় আগ্রহ জন্মে। কর্ম্ম-জীবনে সেই আগ্রহ মিটাইবার চেষ্টা ও প্রযত্ন বরাবরই ছিল। আজ জীবনের এই শেষ অংশে প্রায় পঁচিশ বৎসরেরও অধিককালের আলোচনার পরিণত ফল আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিবার সৌভাগ্য হওয়ায় ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম এবং সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। ইতি—

শ্রীচরণে প্রণত

শ্রীরামদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামঃ শরণম্।

বেদান্ত প্রবেশ—ভূমিকা।

মনীষী শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় বেদান্তবিদ্যার্ণব মহোদয়ের রচিত 'বেদান্ত প্রবেশ' গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। উক্ত বেদান্তবিদ্যার্ণব মহোদয় প্রণীত "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ ভাগবত" গ্রন্থের ভূমিকা—এই 'বেদান্ত প্রবেশ' গ্রন্থ। ইহার ভূমিকা অর্থাৎ ভূমিকার ভূমিকা লিখিতে হইবে। মূল ভূমিকাটিই একাদশ তল, অর্থাৎ একাদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত—তাহার উপর আর এক তল—রচনা অতীব দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ আমার মত ৮০ বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে ইহা অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অনিলহরি চট্টোপাধ্যায়ের মত পিতৃকীর্ত্তিরক্ষণপরায়ণ ব্যক্তির অনুরোধে আমি 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার' মত ঐ ভূমিকারই ভাব সংক্ষেপ করিয়া কিছু লিখিতেছি।

প্রথম কথা হইতেছে—'বেদান্ত' কাহাকে বলে?—'বেদান্তো নাম উপনিষৎ তৎ প্রমাণানি সূত্র ভাষ্যাদীনি'। বেদান্ত শব্দের অর্থ এই যে উপনিষৎ ও সেই উপনিষৎকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া যে সকল সূত্র অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র এবং ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছে, তাহার নাম বেদান্ত। এখন প্রশ্ন জাগে—ভাষ্য বহুবিধ একই ব্রহ্মসূত্রের শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীভাস্করাচার্য্য এবং আরও অনেকে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। (১) অদ্বৈত (২) বিশিষ্টাদ্বৈত (৩) দ্বৈতাদ্বৈত, (৪) শুদ্ধাদ্বৈত (৫) দ্বৈত (৬) শাক্তাদ্বৈত প্রভৃতি।

এই বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থ পাঠার্থীর প্রথমেই সন্দেহ হইতে পারে—কোন্ সম্প্রদায়ের বা কোন্ আচার্য্যের মতবাদকে শিরোধার্য্য করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে? ইহা কি স্বতন্ত্র 'বেদান্ত'—সম্প্রদায়? না পূর্বোক্ত কোন সম্প্রদায়ের বা আচার্য্যের মতের অন্তর্গত? ইহার উত্তরে বলিতে হয়—তিনি (গ্রন্থকার) কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিজেকে ধরা দেন নাই। ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে যখন যেরূপ সাম্প্রদায়িক মত প্রয়োজনে আসিয়াছে বা বিরুদ্ধমত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তখন একের গ্রহণ ও অপরের খণ্ডন করিয়াছেন। তবে, শ্রীমদ্ ভাগবত সহ ব্রহ্মসূত্রের সামঞ্জস্য বিধান অর্থেই ভক্তিবাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার ফলে শ্রীরামানুজাচার্য্যের আংশিক মতানুসরণ স্বতঃই আসিয়া পড়ে। গ্রন্থকার ভাগবতের প্রমাণানুসারে জ্ঞান ও ভক্তিকে প্রায় এক পর্য্যায়ে নিবিষ্ট করিয়াছেন। **সুতরাং তাঁহার এই মতবাদ 'স্বতন্ত্র' একটি 'ভাগবত—বেদান্ত' মত বলা যাইতে পারে।** শ্রীরামানুজাচার্য্য জ্ঞান ও ভক্তিকে একরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা

করেন নাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"আমি যে অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। আমি ভাষ্যকারগণের পদানুসরণ করিয়াছি।" তিনি কোন বিশিষ্ট ভাষ্যকারের মতানুসারে—ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন নাই—সকল ভাষ্যই তাঁহার মান্য, এজন্য—ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মতবাদ বলা যায় না। মনীষী বিদ্যার্ণব মহাশয় 'বেদান্ত প্রবেশ' গ্রন্থে যে ১১টি পরিচ্ছেদ গ্রহণ করিয়া বিচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—(১) ব্রহ্মসূত্র পরিচয় (২) ব্রহ্মতত্ত্ব (৩) সৃষ্টিতত্ত্ব (৪) মায়াতত্ত্ব (৫) দেশকালতত্ত্ব (৬) জীবতত্ত্ব (৭) কর্ম্মতত্ত্ব (৮) উপাসনাতত্ত্ব (৯) অবতার তত্ত্ব (১০) শ্রীমদ্ ভাগবত প্রসঙ্গ ও (১১) উপসংহার। এখন এই ১১টি পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ :—

(১) **ব্রহ্মসূত্র অর্থে**—"শাস্ত্র সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকৃতভাবে নিরূপণ"। ব্রহ্মসূত্রের ৪টি পাদ—প্রথম অধ্যায়ে 'সমন্বয়', দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অবিরোধ', তৃতীয় অধ্যায়ে 'সাধন' ও চতুর্থ অধ্যায়ে 'সিদ্ধি'। প্রতিপাদে অনেকগুলি অধিকরণ আছে, আবার অধিকরণ এক বা একাধিক সূত্রে গঠিত। অধিকরণে—বিচার প্রণালীসহ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। বিচার প্রণালী এইরূপ, প্রথমে বিষয়ের উল্লেখ, তাহাতে যেরূপ সংশয় হইতে পারে—তাহার উত্থাপন, সেই সংশয়কে খণ্ডিত করিবার জন্য বিচার প্রদর্শন, বিচারের পর নির্ণয়, তৎপরে প্রয়োজন বা সঙ্গতি প্রদর্শন। তবে বিচার দ্বারা পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করা যায় না। ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতিই চরম লক্ষ্য। ব্রহ্মতত্ত্ব স্বপ্রকাশ। তবে বিচার কেন? তাহার উত্তর—

২। **ব্রহ্মতত্ত্ব**—বড়ই দুরূহ। ইহা অনন্ত। যিনি বলেন, যে, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। যিনি বলেন, যে আমি জানিতে পারি নাই, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন (কেনোপোনিষৎ ২।১১)। ব্রহ্মতত্ত্ব যখন এরূপ দুরূহ, তখন কি ইহার আলোচনা নিরর্থক? তাহা নহে। ভাগবত বলিয়াছেন—(১।১৮।২এ) আকাশ অনন্ত, তাহার পারে যাইতে পারে না বলিয়া কি পক্ষিগণ আকাশপথে উড্ডীন হইবেনা? না, তাহাদের সামর্থ্যানুসারে পক্ষের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ অধিকার ও সামর্থ্য অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিবেন।

ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ—তিনি চিরপূর্ণ, অনন্ত, অর্থাৎ বৃহত্তম, এক ও অদ্বিতীয়। শূন্যবাদী বৌদ্ধমতের সঙ্গে বেদান্তমতের পার্থক্য এই যে, বেদান্তের পূর্ণ বা শূন্য দুইটাই ভাব পদার্থ। বৌদ্ধদের 'শূন্য' অভাব পদার্থ। ব্রহ্মকে 'অণোরণীয়ান্' ও 'মহতো মহীয়ান্' বলার ইহাই তাৎপর্য্য। বেদের প্রতিমন্ত্র, প্রতিস্তুতি, প্রতিকর্ম্ম একমাত্র পরমতত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে।

সবিশেষ নির্বিশেষ, মূর্ত্ত অমূর্ত্তভাব ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক হইলেও ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পৃথক্। বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন কি? পাশ্চাত্যদেশের দর্শনশাস্ত্রে এক এক দার্শনিক এক এক প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে 'লীলাকৈবল্য' মাত্র

উল্লিখিত হইয়াছে। বালক বা বালিকা যেমন ক্রীড়া করে, সেইরূপ ব্রহ্মও লীলাবশে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহার নিজের কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনবশে নহে। উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নির্দেশ করিলেই তাঁহার অপূর্ণতার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। জীবের প্রতি করুণা বা মুক্তির জন্য তাঁহার এই লীলা। ব্রহ্ম 'সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ'। তিনি স্বপ্রকাশ ও স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ।

৩। **সৃষ্টিতত্ত্ব**—সৃষ্টির মূল ব্রহ্ম। সৃষ্টি ব্রহ্মের সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত। মানবের পক্ষে সঙ্কল্প চিত্তের স্পন্দন। ব্রহ্মের ইচ্ছামাত্রই সঙ্কল্প। সৃষ্টি অনাদি। শক্তিমান্ যে শক্তি আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন, তাহাই মায়ানামে অভিহিত। গ্রন্থকার সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতির একটি সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন (৩২ পৃঃ)। বিবরণে প্রলয়াবস্থা হইতে ক্রমে কিরূপে জগৎসৃষ্টি হইল—তাহার কাল পরিমাণ—উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত; বিষ্ণুপুরাণ ও মনুসংহিতার মতে কল্প ও মন্বন্তরের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মূলে একই মহাশক্তি বিদ্যমান। এই মহাশক্তি শ্রীভগবানের সঙ্কল্প। সৃষ্টি অনাদি বলিয়া ইহার অভিব্যক্তি নূতন নহে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। গ্রন্থকার মতে—সৃষ্টি মিথ্যা বা ভ্রান্তি নহে। তবে সৃষ্ট জগতের অস্থিরতা ও নশ্বরতার নামই 'অসৎ'ভাব, আর যাহা নিত্য স্থির তাহাই ব্রহ্ম পদার্থ।

শঙ্কর বেদান্ত মতে—সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা। অবিদ্যার পূর্ণবিনাশ হইলে জগতের সত্তাও তাহার নিকট বিলুপ্ত হইবে, কোনরূপ দ্বৈতদর্শন থাকিবে না, তবে, ইহার অধিকারী চতুর্থাশ্রমী মাত্র।

৪। **মায়াতত্ত্ব**—এই মায়াকে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির সহিত সমপর্য্যায়ে অনেকে চিন্তা করেন। 'অজামেকং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্'—রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের সমষ্টিকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। সাংখ্যাশাস্ত্রের মতে প্রকৃতি জড় ও অচেতন, পুরুষ সান্নিধ্য বশতঃ ইহা হইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অচেতনা প্রকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টি হইতে পারে না—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া সাংখ্যমতকে দূষিত করিয়াছেন এবং এইমত অবৈদিক ইহাও বলিয়াছেন। এইজন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই মন্ত্রের 'অজা' শব্দে ছাগী অর্থ করিয়া অচেতনত্ব খণ্ডন করিয়াছেন এবং অন্যত্র 'অজা' শব্দের অর্থ যে জন্মরহিতা নিত্যা পরমেশ্বরের শক্তি ইহাই প্রকাশিত করিয়াছেন। ছাগী শব্দার্থ, অভিধাশক্তিবলে পাওয়া গেল এবং ব্যঞ্জনা শক্তি বলে 'ব্রহ্মশক্তি'ও বোধগম্য হইল। ইহা অলঙ্কার শাস্ত্রমতে 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার। সুতরাং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্যকার নহেন, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। মায়া সতী নহে, অসতী নহে, সদসতীও নহে—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা" অবিদ্যা বা মায়া। গ্রন্থকার সর্বসারোপনিষৎ হইতেও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর

ভাগবতের ২।৯।৩৩ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় মায়াশব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বেদান্তমতের অনুকূলই হইয়াছে। ব্যবহারিকদশায় জগতের জ্ঞান ভ্রমাত্মক নহে, পারমার্থিকদশায় দ্বৈতজ্ঞান না থাকায়—জগৎ মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা শ্রীমৎশঙ্করের মত—ইহাও গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে অন্যান্য দার্শনিকগণের মতভেদ আছে তাহাও এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। মায়া ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি।

৫। **দেশ-কাল-তত্ত্ব**—দেশ ও কাল অখিলের আশ্রয়। দেশ ও কালতত্ত্ব ভগবান্ হইতে তত্ত্বান্তর নহে। ব্রহ্ম বা ভগবান্ দেশকালতত্ত্বের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত।

৬। **জীবতত্ত্ব**—সৎস্বরূপ সেই দেবতা সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এই তিন দেবতার জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিব। (ছান্দোগ্য ৬।৩।২)

জগতের পঞ্চভূতাত্মক যে কোনও বস্তুতে সৎস্বরূপ চৈতন্য জীবাত্মরূপে বর্ত্তমান। কোথায়ও অনভিব্যক্ত, কোথায়ও অল্প অভিব্যক্ত, কোথায়ও তদপেক্ষা অধিক কোথায়ও বা সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। এই বস্তু বা দেহ উপাধি—আর তাহাতে—প্রবিষ্ট চৈতন্য-দেহী। দেহী দেহকে পরিচালিত করে। যাহাকে আমরা জড় বলি—সেই উপাধিরূপী জড়েরও বিপুল কার্য্যকারিতাশক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। তাহা মূলগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

মানবদেহধারী জীবের স্বরূপ কি? জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব এক নহে। 'আমি' বা 'আমার বর্ত্তমান দেহে অভিব্যক্তি' এক বস্তু নহে। আমার বর্ত্তমানদেহে মানবরূপে অভিব্যক্তি বর্ত্তমান জন্মে হইয়াছে। কিন্তু আমার জীবত্বের আরম্ভ বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ হইতে। আমিও অনাদি; বিশ্বসৃষ্টিও অনাদি।

স্থাবর পদার্থ হইতে ক্রমপরিণামে কখনও উদ্ভিদ্, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ, কখনও নিকৃষ্ট পশু প্রভৃতির ভিতর দিয়া বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণকুলে মানবদেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ জন্মের মৃত্যুতে আমার মানবদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহা উপাধির (দেহের) ধ্বংসমাত্র, জীব বা আত্মার নহে।

উপনিষৎ আলোচনায় আমরা চারিটি মহাবাক্যের সন্ধান পাই—

(১) "তত্ত্বমসি" (ব্রহ্মই তুমি) (ছান্দোগ্য) (২) "অহং ব্রহ্মাস্মি" (আমি ব্রহ্ম) (বৃহদারণ্যক) (৩) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (জ্ঞানই ব্রহ্ম) (ঐতরেয়ো উপঃ) (৪) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (এই আত্মা ব্রহ্ম) (মাণ্ডূক্য)—এই সকল বাক্যই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা বা ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞাপক।

ভাগবত (৪।২৮।৫৫) গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—"আমিও যে তুমিও সে, তুমিও যে আমিও সে, আমাদের পরস্পরের পার্থক্য নাই, ইহা বিশেষরূপে অনুধাবন কর"।

উপনিষৎ ও ভাগবতের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই।

গ্রন্থকার—ভাগবত দৃষ্টি বিচারে—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মত বিষয়ে স্থানে স্থানে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন—অর্থাৎ শঙ্কর সিদ্ধান্তে নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসকগণ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত হইবেন, আর সগুণ ব্রহ্ম উপাসকগণ বিভূতিবিশেষ লাভ করিবেন, ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি হইবেন না—এই ফল তারতম্য সঙ্গত নহে—ইহা এই গ্রন্থকারের মত। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, চতুর্থাশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসী অধিকারীর পক্ষেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে। গৃহস্থাদি অধিকারীর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বিধান থাকায় এবং ব্রহ্মসূত্র চার আশ্রমীরই আলোচ্য এইজন্য অধিকারিভেদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাহেতু ফলেরও তারতম্য বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার জীব ও ব্রহ্মের সহাবস্থান জ্যোতিঃ ও জ্যোতিষ্মানের একত্র স্থিতির সদৃশ প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত বাদও এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ অর্থ—সহাবস্থান। কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে। 'জীবো ব্রহ্মৈব' 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই 'এব'কার দ্বারা পূর্ণ অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষে—সহাবস্থান স্বীকৃত হইয়াছে তাহাতেও কিছু কিছু মতভেদ আছে। 'সালোক্য', 'সার্ষ্টি'—প্রভৃতি সিদ্ধিতেও সহাবস্থান স্বীকৃত, এবং ভেদাভেদবাদ বা অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্বৈতবাদে তাহা স্বীকৃত হয় নাই।

জীবের উপাধি বিশ্লেষণে গ্রন্থকার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র দৃশ্যমান স্থূলদেহই জীবের উপাধি নহে। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ—ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতি সম্মত। অন্নময় কোষই স্থূল শরীর, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষকেই লিঙ্গ শরীর বলা হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে সপ্তদশ সূক্ষ্ম অবয়বে সম্পন্ন লিঙ্গশরীর বলা হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় (সূক্ষ্ম) ও আত্মা। কোনমতে অষ্টাদশ অবয়বে লিঙ্গশরীর গঠিত বলা হইয়াছে। এই বিজ্ঞানময় কোষে বা লিঙ্গশরীরে অবস্থিত জীব লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে। যত দিন না লিঙ্গ শরীর রূপ আবরণ অপসৃত হয়, ততদিন জীব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই আবরণ শ্রীভগবৎ কৃপায় উপাসনা-ফলে জীব অপসারণ করিতে পারে, জীব তখন মোক্ষ লাভ করে। জীব নিত্য, কিন্তু আচরণ নিত্য নহে।

৭। **কর্মতত্ত্ব**—কর্ম বলিতে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞই প্রকৃষ্ট কর্ম। যজ্ঞ হইতে বৃষ্টির, বৃষ্টি হইতে অন্নের এবং অন্ন হইতে প্রাণীর উৎপত্তি। এইজন্য বৈধ কর্ম জীবের অপরিহার্য্য।

সেই কর্ম নিষ্কামভাবে করিলে কর্মের কষায় উৎপন্ন হয় না। কর্ম ব্রহ্মে অর্পিত হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধিতে কর্ম সম্পন্ন করিলে কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না। গ্রন্থকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, নিত্য তর্পণ করিবার পরে যদি মনে উদয় হয়, যে আমি তর্পণানুষ্ঠান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলাম তাহাতে আমার স্বর্গলাভ হইবে বা সুখভোগ ঘটিবে, তখন উক্ত তর্পণ যজ্ঞ হইল না। ইহা বিদ্যাধিকার হইতে অবিদ্যার অধিকারে পতিত হইল। আর যদি যাঁহাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হইতেছে, তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করুন, আমার কোন ফল কামনা নাই—তাহা হইলেই তাহা যজ্ঞের রূপ ধারণ করিল। এইরূপ সকল কর্মই শ্রীভগবৎ প্রীতি কামনায় করিতে পারিলে—সেই কর্ম বিদ্যাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই বিদ্যা বা জ্ঞানই মুক্তির কারণ। তবে, জীবের স্বরূপের সহিত কর্মের নিত্য সম্বন্ধ নাই, কিন্তু তথাপি সংরাধন অর্থাৎ শ্রীভগবানের সম্যক্ আরাধনারূপ কর্মের আবশ্যকতা আছে। তাহা দ্বারাই জীবের আবরণ উন্মোচিত হইয়া স্বরূপ প্রকাশিত হইবে।

৮। **উপাসনা তত্ত্ব**—ব্রহ্মে বা ভগবানে আমাদের নিত্য আসন—অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকিলেও আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদের অনুভূতি ইন্দ্রিয়দ্বারে আবদ্ধ। এই ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখীন, বহির্বিষয়েই আমাদের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এখন ইহাকে উপ-সমীপে অর্থাৎ আমাদের অনুভূতির মধ্যে শ্রীভগবানের আসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মনই বন্ধনের কারণ। বিষয়গ্রস্ত মনই জীবের বন্ধন। বিষয়কে এইজন্য বন্ধন অর্থে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখীন করিলে আর বিষয় প্রতীতি থাকে না। মন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, মনকে বশে আনিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন হয়। মনই সংসার। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়। উপাসনার অভ্যাস করিলে মনে বিষয়ের উপদ্রব থাকে না বা ক্রমে ক্রমে বিষয়ানুরাগ হ্রাস পায়। উপাসনা সাধারণতঃ দ্বিবিধ (১) আত্মোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা বা নিরাকার-উপাসনা।

(২) প্রতীকোপসনা বা সাকারোপসনা। প্রতীক শব্দের অর্থ অবয়ব, ব্রহ্মের অবয়বকে মূর্তিরূপে আমরা উপাসনা করি। যে কোন মূর্তি হউক না কেন—বিষ্ণু, শক্তি, গণেশ, শিব, বা সূর্য্য সবই ব্রহ্মের অবয়ব বা প্রতিচ্ছায়া। সর্বব্যাপক ব্রহ্মের বাহিরে ত কিছু নাই—সবই তাঁহার অন্তর্গত। এজন্য মূর্তিপূজা জ্ঞানীদেরও অনুষ্ঠেয় হইয়া প্রচলিত আছে। মূর্তিপূজা পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহার সর্ব অবয়ব সমকালে বিভু অনন্ত—ইহাই চিন্তনীয়। ব্রহ্মোপলব্ধি কর্মলভ্য নহে, উপাসনাদি কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে—স্বতঃ সিদ্ধরূপে ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বহু ক্লেশসাধ্য। প্রতীকোপাসনার সিদ্ধি অল্পক্লেশসাধ্য।

এই উপাসনা অধিকারিভেদে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগপথে পরিচালনা করিতে হইবে। যাঁহারা সন্ন্যাসী বৈরাগ্য সম্পন্ন, তাঁহাদের জ্ঞানযোগ, সংসারীর

পক্ষে কর্ম্মযোগ এবং যাঁহারা কাম্যকর্মে অত্যাসক্ত নহেন, ভগবৎকথায় স্বভাবতঃ অনুরক্ত তাঁহাদের ভক্তিযোগ পথ অবলম্বনীয়। ভাগবতে ভক্তিযোগের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অদ্বৈতভাবে জ্ঞানযোগের মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিযোগের মুক্তির প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাতে দ্বৈতভাব থাকিলেও ভক্ত ও ভগবানে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। জ্ঞান ও ভক্তির পন্থা : অধিকারি ভেদে চিন্তনীয়। সর্বোপরি শ্রীভগবানের কৃপাই অবলম্বনীয়।

৯। **অবতারতত্ত্ব**—গ্রন্থকারের মতে প্রত্যেক অবতারই পূর্ণ। তবে যে, অংশাবতার, পূর্ণাবতার, পূর্ণতমাবতার, প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহার কারণ, এই প্রকার উক্তির মূল—শক্তি প্রকটনের আপেক্ষিকতায়। অবতারে জীবভাব ও ব্রহ্মভাব উভয়ভাবই বর্ত্তমান। ভগবানে যে কোনভাব অর্পণ করা যাইতে পারে, তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মভাবের হানি হয় না। বেদেও অবতারবাদ আছে, ইহা পুরাণ কথিত বিষয়মাত্র নয়।

১০। **শ্রীমদ্ভাগবত প্রসঙ্গ**—গ্রন্থকার কেন ভাগবত সহ ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন—তাহার উত্তরে সহজভাষায় জানাইয়াছেন ইহা শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য—এই প্রেরণাবশে তিনি তাঁহার সমগ্রজীবনের পরিশ্রমে সেই উক্তিকে রূপায়িত করিয়াছেন। ভগবদবতার শ্রীচৈতন্যদেবের মুখনিঃসৃত এই বাণী যে সত্য—তাহা তিনি প্রমাণিত করিলেন।

১১। **উপসংহার**—এই পরিচ্ছেদে তিনি ভারতীয় ভাব যে বিজ্ঞান সম্মত, তাহা বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

সত্যই বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থখানি—বহুবিধ চিন্তার আকর ; ইহা ভারতীয় ধর্ম্মবিষয়ে অনুসন্ধিৎসুমনের পরম উপাদেয় সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহার প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আর শ্রীমান্ অনিলহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দেই। শত আশীর্বাদ করি, তিনি তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের কীর্ত্তিকে অক্ষয় করিয়া রাখিলেন। বর্ত্তমান যুগে এরূপ পুত্রও দুর্লভ। শ্রীভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার প্রচেষ্টায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের গৃহে গৃহে এই গ্রন্থখানি বিরাজ করুন॥ ইতি—

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

ভট্টপল্লী
১২ অগ্রহায়ণ ১৩৮১

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ ॥

মুখবন্ধ

আচার্য্য শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়ের সারস্বত সাধনার নির্যাস "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত" গ্রন্থ একটি প্রশস্য প্রয়াস, ভারতীয় অধ্যাত্মভূমিতে পবিত্র প্রয়াগ। জাহ্নবী যমুনার সংযোগই প্রয়াগ। জাহ্নবী ব্রহ্মদ্রবময়ী, যমুনা কৃষ্ণলীলাময়ী। হিমালয় হইতে উভয়ের উদ্ভব, প্রয়াগে উভয়ের একভাব। ব্রহ্মসূত্র জাহ্নবী স্রোত, শ্রীমদ্‌ভাগবত যমুনা প্রবাহ। মহর্ষি বাদরায়ণ হতে উভয়ের আবির্ভাব, আচার্য্য রামপদের গ্রন্থে উভয়ের সদ্‌ভাবে প্রয়াগ।

জাহ্নবী যমুনার রসসঞ্চারে ভারতভূমি শস্য সম্পদে শ্যামলা। ব্রহ্মসূত্রের বিচারচারু জ্ঞানচর্চায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের সরসমধুর ভক্তিচর্য্যায় ভারতচিত্তভূমি প্রশস্য সম্পদে সমুজ্জ্বলা। ব্রহ্মসূত্রে ভারতীয় মনীষার ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভারতীয় মনস্বিতার পূর্ণ প্রকাশ। মনীষা নির্বিশেষ নিরাকার পরব্রহ্মের শ্রবণ নিদিধ্যাসনে সাযুজ্য সাধনায় সদা অবহিত। মনস্বিতা সবিশেষ নরাকার পরব্রহ্মের শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন আত্মনিবেদনে নিত্য সেবাসাধনায় সদা নিমগ্ন। সাযুজ্য সাধনার ফল আনন্দ হওয়া। সেবা সাধনার ফল আনন্দকে আনন্দিত করা।

শক্তি ও আসক্তির তারতম্যে এই উভয় সাধনাধারা ভারতীয় অধ্যাত্মভূমিতে পৃথক্ পথে প্রবাহিত। বিচার চতুর চিত্ত মনীষার মহিমায় ও ভাবপ্রবণ মন মনস্বিতার মধুরিমায় তন্ময়। জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক ব্রহ্মসূত্রের আনুগত্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়, ও ভক্তিতুষ্ট সাধক শ্রীমদ্‌ভাগবতের আনুগত্যে ভগবদুপাসনায় রত। বিধিবিড়ম্বনায় উভয়ে নিজের উৎকর্ষ ও অপরের অপকর্ষ প্রকাশে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ।

ব্রহ্মসূত্রবিচাররত জ্ঞানলিপ্সু বলেন—নির্বিশেষ নিরাকার আবাঙ্‌মনোগোচর ব্রহ্মই সত্য। তদ্‌ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। সবিশেষ সাকার ব্রহ্ম মিথ্যা, জীব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। যা বস্তুতঃ নাই, অথচ প্রতীতির বিষয় হয়, তাই মিথ্যা। নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মই সদ্ বস্তু। যা অতীতে ছিল, বর্ত্তমানে আছে ভবিষ্যতে থাকবে অর্থাৎ ত্রিকালে অবাধিত, তা'ই সৎ। সাকার ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ অতীতে ছিল বর্ত্তমানে আছে কিন্তু ভবিষ্যতে থাকবে না। সাকার ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ অনাদি হলেও অনন্ত নয়। একমাত্র শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মই অনাদি অনন্ত। ঐ শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্ম কাল্পনিক অবিদ্যার কাল্পনিক সম্বন্ধবশতঃ সাকার ব্রহ্ম জীব ও জগদ্রূপে প্রতীত প্রতিভাত হন। জীব যদি অভেদ ভাবনার দ্বারা ঐ কাল্পনিক অবিদ্যার উচ্ছেদে সক্ষম হয়, তাহলে সাকার ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ ঐ এক অদ্বিতীয় মহাচৈতন্যে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্তই জ্ঞানপ্রিয় ভক্তিনিরপেক্ষ বেদান্তচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রালোচনায় চরম পরিণাম। শ্রীমদ্‌ভাগবতাস্বাদরত ভক্তিপ্রেপ্সু বলেন—সবিশেষ সাকার নরাকার ব্রহ্মই সত্য। নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম অপ্রমাণিত। যদি

তিনি বাক্য ও মনের অগোচরেই হবেন, তাহলে তাঁকে বোঝাতে নির্বিশেষ নিরাকার সত্য জ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হবে কিভাবে? যদি কোনো শব্দই তাঁকে বোঝাতে না পারে তাহলে অবাঙ্‌মনোগোচর শব্দটি নিরর্থক হয় না কি? অতএব বলতে হবে—সবিশেষ সাকার বেদবেদ্য ব্রহ্মই সত্য। জীব সত্য, জগৎও সত্য। জীব শ্রীমদ্‌ভাগবতানুগত্যে তদীয়ভাবনার দ্বারা সেবনোচিত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ সিদ্ধান্ত ভক্তিপ্রিয় জ্ঞানিরপেক্ষ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীমদ্‌ভাগবত পর্য্যালোচনার ফলশ্রুতি।

জ্ঞান ও ভক্তির দুটি ধারা পৃথগ্‌ভাবে স্ব স্ব বিভবে পৃথক্ পথে প্রবাহিত। উভয়ের অনুগামী পরস্পরের সিদ্ধান্তের শৈথিল্য প্রকাশে সতত ব্যাপৃত ও প্রীত।

গরুড়পুরাণ প্রণয়নরত মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐ উভয়ধারার সম্মেলনসাধনের সামঞ্জস্য স্থাপনের পন্থা প্রদর্শন করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরিচয় প্রদানে বলেছেন —'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাম্'। শ্রীমদ্‌ভাগবতের আলোকে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বোদ্ধব্য। মনস্বিতার মাধ্যমে মনীষার রহস্য সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর, শ্রীমদাচার্য্য ভাস্কর প্রভৃতি বেদান্তভাষ্যকারবৃন্দ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রদর্শিত পন্থায় অগ্রসর হন নাই। তাঁর সমন্বয়ের বাণী ফলবতী হয় নাই।

পরবর্ত্তীকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বেদব্যাসের সমন্বয়বাণীর মহত্ত্ব ও মর্য্যাদা স্বীকার করেছেন। "শ্রীমদ্‌ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত রহস্য প্রকাশক ভাষ্য" এই মনোভাব প্রকাশ করে তিনি চিরন্তন বিরোধের মূলোচ্ছেদ করেছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে বেদান্তাচার্যাবর্য্য শ্রীমজ্‌জীব গোস্বামী শ্রীমদ্‌-ভাগবতের আলোকে ব্রহ্মসূত্র-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সহায়তায় ব্রহ্মসূত্রের অর্থ প্রকাশে সুসামঞ্জস্য হয়। নিরাকার নরাকার, নির্বিশেষ সবিশেষ, অবাঙ্‌মনোগোচর বেদান্তবেদ্য এইরূপ বিরোধের লেশ থাকে না। সমস্তই স্বরূপই একান্ত সত্যরূপে সিদ্ধ হয়। শ্রীপাদ শ্রীজীব ব্রহ্মসূত্রের প্রতিটি সূত্রের আলোচনা করেন নাই, বেদান্তবিদ্যার্ণব গ্রন্থকার শ্রীরামপদ শ্রীভাগবতানুগত্যে ব্রহ্ম-সূত্রের সকল সূত্রের অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। 'ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ ভাগবত' গ্রন্থে জ্ঞান ও ভক্তির উভয়ধারা অবিরোধে মিলিত হয়েছে।

কাশ্যপগোত্রজাত ব্রাহ্মণ্যধর্মনিষ্ঠ শ্রীরামপদ এই মহাগ্রন্থে জ্ঞানভক্তিমার্গের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সুচারুভাবে উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থকারের মনীষা মনস্বিতা মননশীলতা বহুশাস্ত্রব্যুৎপত্তি পরিবেষণ পরিপাটী জ্ঞান গাম্ভীর্য্যভক্তিসৌন্দর্য্য অতুলনীয় অভিনন্দনীয়। জ্ঞানজাহ্নবীর ভক্তিযমুনার সঙ্গমে এই গ্রন্থ প্রয়াগে অবগাহন করে সকলে নির্মল হবেন, পবিত্র হবেন, ধন্যাতিধন্য হবেন এতে সন্দেহ নাই।

২রা পৌষ, ১৩৮৭,
কলিকাতা

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী

বিষয় নির্ঘণ্ট

ওঁম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

বেদান্ত-প্রবেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মসূত্র পরিচয়

মঙ্গলাচরণ :—

"অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

বৈদিক ঋষি শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতেছেন :—"আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া চল, আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া চল, আমায় মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল"। এই প্রার্থনাটি বুঝিতে হইলে, সদসতের, জ্যোতিরন্ধকারের, অমৃত ও মৃত্যুর তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। এই তত্ত্বানুসন্ধান পূজ্যপাদ মহর্ষি বাদরায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া, তিনি তাঁহার অতিমানুষী মেধা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ন্যায়-শাস্ত্রানুগত সূক্ষ্ম বিচার শক্তি, প্রভৃতির সহিত, দীর্ঘজীবন-ব্যাপী তপস্যালব্ধ অপরোক্ষানুভূতির সম্মিলন করিয়া তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "ব্রহ্মসূত্র" প্রণয়ন করেন।

ব্রহ্মসূত্র—উত্তর মীমাংসা—বেদান্ত দর্শন :—

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার রচনার দুইটী উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়, একটী স্থূল ও গৌণ, অপরটী সূক্ষ্ম ও মুখ্য। বেদান্ত বা উপনিষৎ আলোচনায় স্থূলদর্শীগণের আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে নানাপ্রকার বিরোধের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় ও তাহাতে বেদের স্বতঃ প্রামাণ্যের উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ মীমাংসা দ্বারা সন্দেহ অপসারণ করাই "ব্রহ্মসূত্র" রচনার স্থূল উদ্দেশ্য। এজন্য ইহার অপর নাম "মীমাংসা দর্শন"। কিন্তু বেদান্ত বা উপনিষৎ সমগ্র বেদ নহে; বেদের জ্ঞানকাণ্ড মাত্র এবং ইহা বেদের উত্তর বা শেষভাগে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম "বেদান্ত"। বেদের কর্ম্মকাণ্ড পূর্ব্ব বা প্রথম অংশে অবস্থিত। কর্ম্মকাণ্ডেও বিভিন্ন বেদের অথবা একই বেদের অথবা একই বেদের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন মন্ত্রের মধ্যে স্থূলদৃষ্টিতে বিরোধ প্রতীয়মান হয় এবং তজ্জন্য সন্দেহ উত্থিত হয়। একারণ মহর্ষি বাদরায়ণের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি কতকগুলি সূত্র প্রণয়ন করিয়া যুক্তি ও বিচারবলে উক্ত বিরোধ সমূহ মীমাংসা করতঃ সন্দেহ সকলের অপসারণ করেন।

তাঁহার কৃত এই সূত্র সকলও "মীমাংসা দর্শন" নামে পরিচিত। মনে হয়, শিষ্য গুরুর উপদেশ ও নির্দ্দেশ ক্রমেই উক্ত সূত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উভয় মীমাংসা দর্শনের মধ্যে একটিকে অপরটি হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য মহর্ষি জৈমিনি কৃত মীমাংসা "পূর্ব্বমীমাংসা" নামে, এবং তাঁহার গুরুমহর্ষি বাদরায়ণ কৃত মীমাংসা— "উত্তর মীমাংসা" নামে পরিচিত। এই শেষোক্ত মীমাংসা শাস্ত্র "বেদান্ত দর্শন" নামে পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ।

সূত্রপদের অর্থ :—

পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা উভয়েই সূত্রাকারে রচিত। "সূত্র" শব্দের অর্থ কি, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে :—

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ "সূত্রং" সূত্র বিদো বিদুঃ ॥

সূত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ, অল্পাক্ষর, সন্দেহের অবসর রহিত, সারবান, বহু-অর্থ-সন্নিবেশিত, যাহার একটিমাত্র অক্ষরও অবহেলা বা নিন্দা করিবার নাই, এরূপ রচনাকে সূত্র বলেন।

"ব্রহ্মসূত্র" এই লক্ষণাক্রান্ত "সূত্র" রচনার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য যে, সমগ্র ব্রহ্মসূত্র পুস্তকে যতগুলি সূত্র আছে, তাহাদের মধ্যে একটিরও একটি অক্ষর অধিক বা অপ্রয়োজনীয় নাই। প্রত্যেক অক্ষরটির অর্থগৌরব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান। মূল গ্রন্থ আলোচনায় ইহা বোধগম্য হইবে।

ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য :—

বিরোধ মীমাংসা এবং সন্দেহ অপসারণ মীমাংসা দর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য। কিন্তু বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রে উহা ভিন্ন অন্য মহদুদ্দেশ্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত। "ব্রহ্মসূত্র" নামই এই মহদুদ্দেশ্যের পরিচায়ক। "ব্রহ্মসূত্র্যতে যথাতথ্যেন নিরূপ্যতে"—এই ব্যুৎপত্তিতে "ব্রহ্মসূত্র" পদটী নিষ্পন্ন—ইহার অর্থ এই যে, শাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকৃতভাবে নিরূপিত হয়। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণই এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টা এই শাস্ত্রের উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের সহিত, জীবতত্ত্ব, জগতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, সিদ্ধিতত্ত্ব—অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এজন্য মহর্ষি বাদরায়ণ উক্ত তত্ত্ব সকলেরও আলোচনা তাঁহার শাস্ত্রে বিশদভাবে সূত্রবদ্ধ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই আলোচনায় যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সমুদায়ই উপনিষদের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি সূত্রে এই ভিত্তি, সূত্রের শিরোদেশে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। এই শাস্ত্রের সূত্র সমাবেশ, অধ্যায় ও পাদবিভাগ প্রভৃতি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত। সমগ্র শাস্ত্রে চারিটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে "সমন্বয়", দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অবিরোধ", তৃতীয় অধ্যায়ে "সাধন" এবং চতুর্থ

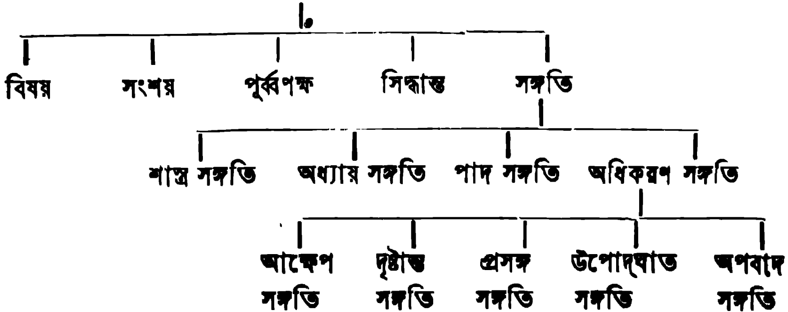
অধ্যায়ে "সিদ্ধি" সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ—প্রতি পাদে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা মূল গ্রন্থে প্রতি পাদের প্রারম্ভে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।

অধিকরণ :—

প্রতি পাদে অনেকগুলি "অধিকরণ" বর্ত্তমান। এক একটি অধিকরণ এক বা একাধিক সূত্রে গঠিত। প্রত্যেক অধিকরণে এক একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের বিচার ও ও মীমাংসা করা হইয়াছে। সমগ্র ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে ১৬৭টি অধিকরণ বর্ত্তমান—সুতরাং এই শাস্ত্রে ১৬৭টি স্বতন্ত্র বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। এই সমুদায় বিষয় পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। পরস্পরের মধ্যে আশ্চর্য্য সঙ্গতি বর্ত্তমান। "অধিকরণ" মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রণালী। ইহার পাঁচটী অঙ্গ :—(১) বিষয়, (২) সংশয়, (৩) বিচার, (৪) নির্ণয় ও (৫) প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করিয়া ইহার সমর্থন করিতেছি :—

বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়স্তথা।
প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ স্যাদঙ্গ পঞ্চকম্ ॥

প্রত্যেক অধিকরণে এই পাঁচটী অঙ্গ বর্ত্তমান আছে। মূল গ্রন্থে প্রত্যেক অধিকরণে ইহা স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। কিন্তু সংশয় প্রতি অধিকরণে এমন কি প্রায় প্রতি সূত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেই সংশয়ের সহিত পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি, স্পষ্ট কথিত আছে এবং তাহার পর সিদ্ধান্তবাদীর যুক্তি ও বিচার এবং সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; সুতরাং আশা করা যায় যে পাঠকের বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না। উপরের শ্লোকে উল্লিখিত "প্রয়োজনের" পরিবর্ত্তে অনেক ভাষ্যকার "সঙ্গতি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "সঙ্গতি" আবার অনেক প্রকার আছে। নিম্নে চিত্রে উহাদের উল্লেখ মাত্র করা গেল। সূক্ষ্মদর্শী পাঠক অতি অল্প চেষ্টাতেই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গতি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক অধিকরণে এবং প্রতি সূত্রে উহাদের উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মসূত্ররূপ দুরূহ শাস্ত্রের দুরূহতা বৃদ্ধি করি নাই।



তাৎপর্য্য নির্ণয়ের পদ্ধতি :—

আলোচ্য ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ সূত্রাকারে নিবদ্ধ হওয়ায় ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের পক্ষে নানাপ্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, একারণ প্রাচীন ভাষ্যকারগণ প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার জন্য কয়েকটী প্রকৃষ্ট পন্থা বা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উপায়গুলি তাঁহাদের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে ॥

(১) উপক্রম (২) উপসংহার (৩) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) (৪) অপূর্ব্বতা (পূর্ব্বে অনুল্লিখিত বিষয়ের উল্লেখ) (৫) ফল (৬) অর্থবাদ (প্রশংসা) ও (৭) উপপত্তি—ইহারাই প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের সহায়। প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণের জন্য উপরে লিখিত উপায়গুলির প্রত্যেকটীর প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উপায়গুলির মধ্যে অর্থবাদ একটি উপায়; উহা আবার তিন প্রকার :—(১) গুণবাদ (২) অনুবাদ ও (৩) ভূতার্থবাদ। তাঁহাদের ভাষাতেই ইহাদের পরিচয় দিতেছি :—

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদ স্তদ্‌ধানাবর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ ॥

ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। ইহাদের উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে প্রাচীন ভাষ্যকারগণ কি প্রকার সতর্কতার এবং নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহা বর্ত্তমান কালের পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা। মূল গ্রন্থ পাঠকালে কোনও বিশেষ সূত্রের প্রদত্ত অর্থ প্রকৃত অর্থ নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিবার ধৈর্য্য পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা করি। কেননা, আমি যে অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা আমার স্বকপোল কল্পিত অর্থ নহে। আমি ভাষ্যকারগণের পদানুসরণ করিয়াছি—সুতরাং সূত্র সকলের অর্থ, ভাষ্যকারগণের উপরে প্রদর্শিত পদ্ধতিতে গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনার সহিত নিষ্কাসিত অর্থ—এসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

ব্রহ্মসূত্রে বিচার প্রণালী দৃঢ়ভাবে ন্যায়ানুসারী :—

বলা বাহুল্য যে ব্রহ্মসূত্রে বিচার প্রণালী এত দৃঢ়ভাবে ন্যায়ানুসারী, যে ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রোক্ত কোনও প্রকার দোষ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন, যে "ব্রহ্মসূত্র" যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন, সে তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, তর্ক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে। বেদান্তদর্শনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্পষ্ট স্বীকার করে যে, বাক্য ও মন, বা ভাষা, বিচার ও চিন্তা সে

তত্ত্বে পৌঁছিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে। সে তত্ত্বের স্ফুরণ আমাদের দেশকালাবচ্ছিন্ন মনে হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। উপযুক্ত সাধনা দ্বারা চিত্তমল ক্ষালিত হইলে উহা স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। উক্ত সাধনা দেশকালাবচ্ছিন্ন অবস্থায়, দেশকালাবচ্ছিন্ন মনঃ-বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রভৃতি করণ দ্বারা সংসাধিত হয় বলিয়া, ন্যায়শাস্ত্রানুসারী বিচার পদ্ধতি আমাদের সাধনাক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য নহে। ব্রহ্মের বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত উচ্চাধিকারীর লক্ষ্যস্থান হইতে উহার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও সাধারণ জীব বা সাধকের লক্ষ্যস্থান হইতে তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে। তারপর সাধনার সিদ্ধিতে পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি হইলে তবে পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এ কারণ বেদান্ত দর্শনে যুক্তি বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ ফল অর্থাৎ সাধকের অপরোক্ষানুভূতির পর জীব ও জগৎ তাঁহার চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহাও সূত্রবদ্ধ করা হইয়াছে—ব্রহ্মসূত্র বুঝিবার ইহা মূল রহস্য।

অপরোক্ষানুভূতি লাভই প্রধান লক্ষ্য :—

হিন্দু দার্শনিকগণ, মানবীয় বুদ্ধি, তর্ক, বিচার প্রভৃতির শক্তি কতদূর, তাহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারা উক্ত শক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্তমত পোষণ করিতেন না। আবার অন্যপক্ষে তাঁহারা জানিতেন, যে মানব আত্মার শক্তি অসীম। তাঁহারাই উপনিষদে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

> বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
> ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ শ্বেতাশ্বতর ৫।৯
>
> একগাছি সূক্ষ্ম কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একভাগকে আবার শত খণ্ডে বিভক্ত করিলে, তাহার এক ভাগের যাহা পরিমাণ, জীবও তত্তুল্য সূক্ষ্ম চৈতন্যাংশ, কিন্তু তাহা হইলেও স্বরূপতঃ অনন্তই থাকে।

অর্থাৎ চৈতন্য-ঘন পরব্রহ্মের তুলনায় জীব যদিও অতি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তথাপি জীবের স্বরূপ অনন্ত, তাহাতে অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। সাধনায় স্বরূপ অভিব্যক্তি হইলে, অথবা অন্যকথায় জীবের নিজস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি হইলে, তাহার অনন্ত শক্তি প্রকটিত হয়। তাঁহারা আত্মার সহিত বুদ্ধি-মন-চিত্ত-অহঙ্কারাত্মক অন্তঃকরণের পৃথকত্ব ভুলিতেন না। শেষোক্তগুলি যে জড় প্রকৃতির সূক্ষ্ম পরিণতি এবং উহারা যে চৈতন্যের সহিত জড়ের সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বার স্বরূপ, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। ভাষা, চিন্তা, তর্ক, যুক্তি, বিচার প্রভৃতি অন্তঃকরণের ক্রিয়ার পরিচায়ক, এবং উহাদের সাহায্যে যতদূর যাওয়া যায়, তাহাই যে পরমতত্ত্বের সমগ্র জ্ঞান—ইহা তাঁহারা কখনই মনে করিতেন না। উহারা পরমতত্ত্বের আংশিক জ্ঞান লাভের উপায় মাত্র, ইহা তাঁহারা জানিতেন এবং ইহাদিগকে উপায় স্বরূপেই ব্যবহার করিতেন। এজন্য তাঁহারা উপনিষদে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তৈত্তিরীয় ২।৯
বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। তৈত্তিঃ ২।৯

ভাষা, চিন্তা, তর্ক, যুক্তি, বিচার দ্বারা পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার না হইলেও, অনুকূল তর্ক, পক্ষপাত রহিত ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি ও বিচার—চিন্তা ও ধারণা শক্তিকে প্রখর করে, এজন্য উহাদের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি উহাদের দ্বারা লাভ করা যায় না। উক্ত অপরোক্ষানুভূতিই তাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য। একারণ তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

অনুভূতিং বিনা মূঢ় বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত শাখাগ্র ফলাস্বাদন মোদবৎ॥ মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২২

মূঢ় ব্যক্তি অপরোক্ষানুভূতি লাভ না করিয়াও, শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া বৃথা আনন্দিত হয়। দর্পণে বা জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষশাখাগ্রে লম্বমান সুপক্ক ফলের আস্বাদনের ন্যায়, উহাদের উক্তরূপ ব্রহ্মজ্ঞান একান্ত অলীক। মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২২

ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ, অনুমান ও ঐতিহ্য প্রমাণগম্য নহেন :—

সূত্রকার ভগবান বাদরায়ণ, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ, অনুমান ও ঐতিহ্য প্রমাণগম্য নহেন—ইহা "তদব্যক্তমাহ হি"—৩।২।২৩ সূত্র প্রণয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র শাস্ত্র প্রমাণগম্য—ইহা "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ১।১।৩ সূত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মনে সন্দেহ হইতে পারে, যে লৌকিক গ্রন্থাদি যেমন মানবীয় চিন্তা ও ভাষা জ্ঞানের ফল—অর্থাৎ মানসিক চিন্তা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থরূপে প্রকটিত করা হয়, শাস্ত্রও ত তাই। উহা ভাষায় গ্রথিত মানবীয় চিন্তার ফলমাত্র; সুতরাং উহা "অবাঙ্‌মনসো-গোচর"—তত্ত্ব সম্বন্ধে কি প্রকারে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে? যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহাদের মনে এ প্রকার সন্দেহ উত্থিত হওয়া সম্ভব বটে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিপ্রসূত গ্রন্থ মাত্র নহে। মানবীয় যুক্তি, বিচার, তর্ক প্রভৃতি উহাতে ব্যবহৃত হইলেও উহারা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মুখ্য আলম্বন নহে। অনুসন্ধান বা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব বাহির করা বেদান্তদর্শনের বা ব্রহ্মসূত্রের, অথবা শুধু বেদান্তদর্শনের কেন, কোনও হিন্দু-দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা জানিতেন যে ভগবত্তত্ত্ব নিত্য সিদ্ধ—সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় উজ্জ্বলভাবে দেদীপ্যমান, উহা অনুভব করিতে অন্তর্মুখীন দৃষ্টির প্রয়োজন—তাহা লাভের জন্য যেরূপ সাধনার প্রয়োজন, তাহাও তাঁহারা শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব বা আত্ম তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি নিজ নিজ সাধনার দ্বারা লাভ করিয়া, জীব, প্রকৃতি, জগৎ প্রভৃতি যেরূপভাবে তাঁহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের নিজ নিজ ব্যবহারিক আচার, ব্যবহার,

চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি যেরূপ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া, জনসাধারণকে সেই পথে অগ্রসর হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করতঃ, লোকহিত সাধনের জন্য, সেই সমুদায় প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফল শাস্ত্রবদ্ধ করিয়া জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মে বা ভগবানে বা আত্মতত্ত্বে অনন্তভাব বিদ্যমান—ঋষিগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও নানাপ্রকার হইয়াছিল, একারণ শাস্ত্রে একই বিষয়ের উপদেশ বৈচিত্র্য—কিন্তু বৈচিত্র্য থাকিলেও বিরোধ নাই—ইহা প্রতিষ্ঠিত করা সূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণের বেদান্ত দর্শন বা উত্তর মীমাংসা দর্শন প্রণয়ন করিবার স্থূল উদ্দেশ্য, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। উপরোক্ত কারণে শাস্ত্র কেবল ভাষায় প্রকটিত মানবীয় চিন্তার ফল নহে। যিনি উপলব্ধির স্বরূপ, আমাদের প্রত্যেকের প্রতি উপলব্ধির মূলে যিনি, যাঁহার নিয়ন্তৃত্বে আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি কার্য্যকারী, তিনি যখন অপরোক্ষভাবে উপলব্ধির বিষয়ীভূত হইয়া শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছেন, তখন শাস্ত্র তাঁহার প্রমাণ স্বরূপ কেন না হইবে? তবে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সে অনুভূতি স্বরূপের অনুভূতি, জ্ঞান স্বরূপের জ্ঞান, ইহা জগতের নিদর্শনে সমুদ্রে শিশির পতন, প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যে তদুদ্ভূত কিরণকণার প্রত্যাবর্ত্তন ও অনুপ্রবেশ। যাহার উপলব্ধি, সে ত আপনাকে অনুভূতি সাগরে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে ত, তখন দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদের অতীত অবস্থায় উপনীত। যখন সেই অনুভূতি প্রকাশ করিবার অবস্থা তাহার হইল, তখন সে পুনরায় দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছেদের ভিতরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, সে অনুভূতির স্বরূপ-প্রকাশ তখন তিরোহিত। তাহা ছাড়া ভাষার অসমর্থতাও বর্ত্তমান। সুতরাং শাস্ত্রে ব্রহ্মের সমগ্র নির্দ্দেশ সম্ভব নহে, একারণ শ্রুতি "নেতি নেতি" মন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল অন্তরায় বিদ্যমান থাকিলেও প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার সাক্ষ্যের ন্যায় শাস্ত্রপ্রমাণ গ্রহণীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনে কর সুপ্রসিদ্ধ ইলোরা ও অজন্তা গুহামন্দিরের অতিমানুষী ভাস্কর ও চিত্র শিল্প দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমি সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া সত্যই আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহা হইলেও উক্ত দর্শন আমার দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়দ্বারে লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, সে বর্ণরঞ্জনা, রেখা বিন্যাস, মূর্ত্তির জীবন্তভাব, ভঙ্গিমার লালিত্য এবং সমুদায়ের সমবায়ে সৌন্দর্য্য সমাহার কি ভাষায় বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করা যায়? বর্ণনা যতই উজ্জ্বল, প্রকৃত দৃশ্যানুগামী হৃদয়গ্রাহী হউক না কেন, উহা দ্বারা কি আসল সৌন্দর্য্যের সামান্য অংশ মাত্রও প্রকাশ করা যায়? কিন্তু তাহা না গেলেও, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলিয়া উহা গ্রহণের অযোগ্য নহে। উক্ত বর্ণনা পড়িয়া যদি একজন সৌন্দর্য্যপিপাসুরও উক্ত গুহামন্দির দর্শনের অভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে উক্ত বর্ণনা সার্থক। শাস্ত্রের সার্থকতাও সেইরূপ। ব্রহ্ম ভগবান বা সত্য দর্শনের স্পৃহা জাগান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এবং সেই স্পৃহা জাগিলে যদি কোন জীব সত্য দর্শনের চেষ্টা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তবে শাস্ত্র সার্থকতা

লাভ করে। প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার সাক্ষ্য সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বধর্ম্মাধিকরণে গ্রহণীয়। উক্ত সাক্ষ্যে দ্বিধা, সংকোচ প্রভৃতি বর্ত্তমান নাই। উহা প্রত্যক্ষ-দর্শনলব্ধ আত্মিক বলে বলীয়ান্।

প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ঋষির অপরোক্ষানুভূতি লব্ধ উক্তি :—

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ঋষি পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া লোকহিতের জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতর ৩.৮

পাঠান্তর :—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যয়নায়॥

ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ

আমি তমঃ পারে (অজ্ঞানের অতীত) অবস্থিত, সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, (অথবা পাঠান্তরে) তাঁহাকে জানিলেই ইহলোকে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পরমপদ প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।

এই উক্তি মানবীয় যুক্তি তর্ক বিচারের ফল নহে। ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর সুস্পষ্ট বিবৃতি। ইহাতে দ্বিধা, সঙ্কোচ, সন্দেহ, সংশয় প্রভৃতির ছায়াপাত হয় নাই। ইহা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়তন্ত্রীকে বিশ্বসঙ্গীতের তানে প্রতিধ্বনিত করে। সুপ্তভাব জাগরিত করে, হৃদয়ের মলিনতা অপসারিত করে, অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত করে, বিশ্বাস দৃঢ় করে, মন উন্নত করে, বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার উপযোগী করে, আনন্দ প্রবাহ ছুটায় এবং হৃদয় মন শান্তিরসে প্লাবিত করে। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে অনুভূতি স্বরূপের অনুভব বা জ্ঞান স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান, আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে লব্ধ প্রপঞ্চ জগতের রূপ-রস-গন্ধাদির অনুভব বা জ্ঞান অপেক্ষা, লক্ষ লক্ষ গুণে ঘনিষ্ঠ, সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, প্রাণারাম, দ্বিধাসঙ্কোচশূন্য। উক্ত অনুভূতিতে বিতর্ক—বিকল্পের অবসর নাই। উক্ত অনুভূতি আত্মস্বরূপে স্পষ্ট ও গভীর ছাপ অঙ্কিত করে। উপরে যে শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা হইতে আমরা "তমঃ" পদের অর্থ অজ্ঞান এবং "অমৃত" পদের অর্থ অতিমৃত্যু বা পরমপদ, ইহা বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং ইহা হইতে আমরা প্রারম্ভে উদ্ধৃত "তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়" মন্ত্রাংশের—"তমঃ", "মৃত্যু" ও "অমৃত" পদকয়টির লক্ষ্য কি তাহা বুঝিতে পারিলাম।

ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণে উপগম্য :—

শাস্ত্রপ্রমাণে ব্রহ্ম উপগম্য হইলেও অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলেও, শুধু শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি লাভ হয় না। তাহার জন্য বিশেষ সাধনা বা আরাধনার প্রয়োজন। ইহা ভগবান সূত্রকার বাদরায়ণ বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" ৩।২।২৪ সূত্র প্রণয়ন করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। সংরাধনের দ্বারা চিত্তমল-ক্ষালন হইলে, স্বতঃসিদ্ধ সূর্য্যপ্রকাশ যেমন দোষবিরহিত চক্ষুর নিকট উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব, অনন্ত-জন্মার্জ্জিত অনন্ত প্রকারের কর্ম্মজনিত চিত্তমল ক্ষালিত হইলে, বিশুদ্ধ চিত্তে স্বতঃ উদ্‌ভাসিত হয়। ইহা কর্ম্মলভ্য নহে। কর্ম্মলভ্য ফল নশ্বর। কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্মের দ্বারা যে মল স্তরের পর স্তর সঞ্চিত হইয়া, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, চিত্তদর্পণ সম্পূর্ণরূপে আবরিত ও মলিনীকৃত করিয়াছিল কর্ম্ম দ্বারাই তাহা অপনীত হয়। কর্ম্ম যাহার উৎপাদক, কর্ম্মই তাহার ধ্বংসকারী হইবে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। চিত্তমল নাশ করিয়াই কর্ম্ম তাহার সার্থকতা লাভ করে। ভগবদনুভূতির উহা উৎপাদক নহে। ভগবত্তত্ত্ব স্বয়ম্প্রকাশ, যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য্য উদিত হইয়া আপনাকে ও বিশ্বস্থ অপরাপর সমুদায় প্রকাশ করে, সূর্য্যদর্শন করিতে হইলে অপর আলোকের প্রয়োজন হয় না; সেইরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে কাহারও অপেক্ষা রাখে না। একবার প্রকাশিত হইলে, ইহার স্নিগ্ধ, শান্ত, নির্ম্মল, স্থির জ্যোতিঃ চিরসমুজ্জ্বল থাকে। সুতরাং ভগবদনুভূতি একবার লাভ করিতে পারিলে, অবিদ্যাপাশ চিরতরে ছিন্ন হয়, অজ্ঞান সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয়, এবং শাশ্বত শান্তি লাভ হইয়া থাকে। তখন হৃদয়গ্রন্থি অহঙ্কার অপগত হয়। সমুদায় সংশয় ছিন্ন, কোটী জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও তজ্জনিত ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন :—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডক ২।৮

পরমতত্ত্বের জ্ঞান কর্ম্ম লভ্য নহে—ইহা অপৌরুষেয় :—

বেদান্ত বা উপনিষদে ঋষিগণের অপরোক্ষানুভূতি-লব্ধ ফল মন্ত্রবদ্ধ আছে। উহাদের সাহায্যে উপযুক্ত অধিকারী পরমতত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত সংরাধনের অনুষ্ঠান করিলে, চিত্তমল ক্ষালনে পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহ। এই কৃতকার্য্যতা পুরুষের প্রচেষ্টা দ্বারা লভ্য নহে। প্রচেষ্টার সহিত ইহার সম্বন্ধই নাই। প্রচেষ্টা কর্ম্মের নামান্তর মাত্র। উপরে বলা হইয়াছে, যে উক্ত ফল কর্ম্মলভ্য নহে। ইহা আপনাকে আপনি প্রকাশিত করে। একারণ এ জ্ঞান অপৌরুষেয়। এ জ্ঞান প্রত্যেকের নিজস্ব। বেদ এই জ্ঞান লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করেন, একারণ বেদও

"অপৌরুষেয়" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান বাদরায়ণ উপরে উদ্ধৃত ৩।২।২৪ সূত্রে "প্রত্যক্ষ" পদদ্বারা বেদকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন কারণ বেদ যে জ্ঞানের উপদেশ দেন, সে জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান—প্রত্যক্ষলব্ধ। এ কারণ "বেদ" প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত জ্ঞান অনুমানগম্য—যুক্তি-বিচারের দ্বারা লভ্য—উহা প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ নহে। এজন্য ইহা "অনুমান" নামে উক্ত সূত্রে স্থানলাভ করিয়াছে। অতএব আমরা বুঝিলাম যে, বেদ ও তাহাতে উপদিষ্ট জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং কোনও পুরুষোচ্ছিষ্ট নহে—এ কারণ বেদ অপৌরুষেয়।

"বেদ" শব্দের অর্থ কি ?

"বেদ" শব্দ "বিদ্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—জানা বা অনুভূতির বিষয় হওয়া অথবা অনুভূতি। "বেদন" "নিবেদন" উভয়ই "বিদ্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "বেদন' শব্দের অর্থ "জানা", "নিবেদন" শব্দের অর্থ "জানান"—"বেদ" শব্দ এই উভয় অর্থকেই লক্ষ্য করে। সুতরাং ইহার অর্থ একদিকে "জানা" বা পরম তত্ত্বের অনুভূতি, অন্যদিকে "জানান" বা অনুভূতি স্বরূপের অনুভূতি জাগান। সুতরাং "বেদ" পদ হইতে আমরা উপাস্য-উপাসকের ভাবের আদান প্রদান, একের স্পন্দনে অপরের প্রতিস্পন্দন উৎপাদন বুঝিলাম। এই ভাবের আদান প্রদান, স্পন্দন প্রতিস্পন্দনের উৎপাদন কি করিয়া হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, উপাস্য-তত্ত্ব, উপাসক তত্ত্ব ও উপাসনা তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়, অর্থাৎ, অন্য কথায় ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে হয়। আমরা ক্রমশঃ এই আলোচনায় অগ্রসর হইব এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব, মায়া বা প্রকৃতি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিব। ভগবদ্ কৃপা ভিন্ন এ সমুদায়ের ধারণা সম্ভব নহে। এ কারণ ভগবচ্চরণে ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করতঃ গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মতত্ত্ব

ব্রহ্মতত্ত্ব—অনন্ত, অসীম, দুর্ব্বিগাহ্য :—

ব্রহ্মতত্ত্ব বড়ই দুরূহ। পূর্ব্বে উদ্ধৃত মুণ্ডকশ্রুতির ২।৯ মন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন—ভাষায় উহা ব্যক্ত করা যায় না, মনে চিন্তায় উহার ধারণা করা যায় না। মানবের চিত্ত, মনঃ, বুদ্ধি সে তত্ত্বের নিকট পৌঁছুছিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে। যিনি বলেন, যে তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যিনি বুঝেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তায় আয়ত্ত করিবার বস্তু নহে, তিনিই ব্রহ্মতত্ত্বের কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। শ্রুতি ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

"যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ"। কেনপনিষৎ ২।১১

ব্রহ্মতত্ত্ব যখন এরূপ দুর্ব্বিগাহ্য, তখন কি উহার আলোচনা নিরর্থক? তাহা নহে। ব্রহ্মের সমগ্র জ্ঞান মানবের পক্ষে অসম্ভব। আকাশ অনন্ত, কোনও পক্ষী কি উড্ডয়ন করিয়া উহার পারে পৌঁছুছিতে পারে? তাহা পারে না বলিয়া কি পক্ষীগণ উড্ডয়ন পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে? তাহা নহে। তাহারা নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে আকাশ পথে উড্ডীন হইয়া উহাদের পক্ষলাভের সার্থকতা সম্পাদন করে। ব্রহ্মতত্ত্বও সেইরূপ অনন্ত, অসীম, দুর্ব্বিগাহ্য। সাধকগণ নিজ নিজ সাধনার সামর্থ্যানুসারে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া আপন আপন সাধনায় সার্থকতা লাভ করেন। ভাগবত ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথাসমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ।
ভাগ: ১।১৮।২৩

পক্ষীগণ নিজ নিজ উড্ডয়ন শক্তির সামর্থ্যানুসারে আকাশের অতি অল্পাংশমাত্রেই পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত বা ব্রহ্মজ্ঞগণ নিজ নিজ অধিকার ও সামর্থ্যানুসারে বিষ্ণুগতি, ব্রহ্মতত্ত্ব, বা ভগবত্তত্ত্বের আংশিক জ্ঞান মাত্র লাভ করিতে পারেন।

সুতরাং সকলেরই ব্রহ্মজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান। ব্রহ্মের সমগ্র জ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। নিজ নিজ অধিকার ও সামর্থ্যানুসারে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর খণ্ডজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে, মানব জনমের সার্থকতা লাভ হয়।

অনন্ত—চিরপূর্ণ :—

১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় বলা হইয়াছে, ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বৃহত্তম—সর্ব্ববিষয়ে বৃহত্তম। তাঁহাতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত ভাব, অনন্ত গুণ, অনন্ত রূপ বিদ্যমান। সূত্রকার ভগবান বাদরায়ণ—"অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্"—৩।২।২৬ সূত্রে ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। অনন্তের অংশ অসম্ভব। অংশ কল্পনা করিলেই অনন্তের অনন্তত্ব বর্ত্তমান থাকে না। অনন্ত চিরপূর্ণ, এজন্য শ্রুতি গাহিয়াছেন :—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ বৃহদারণ্যক ৫।১

প্রপঞ্চের বাহিরে ত্রিপাদবিভূতি পূর্ণ, আবার একপাদ বিভূতিতে অবস্থিত প্রপঞ্চও পূর্ণেরই অভিব্যক্তি—অতএব পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

গণিত শাস্ত্রের মূল সূত্র ১+১=২, ১−১=০। কিন্তু অনন্ত, চিরপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বে গণিতের এ মূল সূত্র প্রযোজ্য নহে। সেখানে পূর্ণ+পূর্ণ=পূর্ণ এবং পূর্ণ−পূর্ণ=পূর্ণ অর্থাৎ গণিতের সঙ্কেতানুসারে ১+১=১, ১−১=১। যুক্তি, বিচারে আমরা বুঝিতে পারি, যে অনন্ত বা পূর্ণবস্তু দুইটী হইতে পারে না। যদি জগতে দুইটী অনন্ত বা পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে একে অপরের অনন্তত্বের বা পূর্ণতার হানির কারণ হয়। সুতরাং অনন্ত বা পূর্ণবস্তু এক অদ্বিতীয় হওয়া উচিত। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য ৬।২।১)। গণিতের আলোচনায় আমরা জানি যে সমান্তর সরল রেখা অনন্তে মিলিত হইয়া বৃত্তাভাস সৃজন করে। ক্ষেপণী (Parabola), যাহার প্রান্তবিন্দুদ্বয় ক্রমশঃ দূর হইতে দূরতর হইতে থাকে, তাহারাও অনন্তে মিলিত হয়। হাইপারবোলা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, সুতরাং গণিতের সাহায্যে আমরা পাইলাম যে প্রপঞ্চগত সমুদায়ই সসীম এবং সমুদায়ের পরিণতি এবং মিলন অনন্তে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রও সেই একই শিক্ষা দেয় যে সমুদায় বিরোধের সমাধান অনন্তে এবং সেই অনন্ত ব্রহ্ম। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।৯।৩৩ গদ্যাংশে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত গদ্যাংশ ও উহার অর্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব "ব্রহ্ম" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে আমরা পাইতেছি, যে তিনি অনন্ত—সে কারণ সর্ব্বব্যাপী, চিরপূর্ণ, এক ও অদ্বিতীয়।

চিরপূর্ণের একদিকে অনন্ত এবং একদিকে শূন্য :—

৪।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় আমরা শূন্যতত্ত্ব বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এবং আমরা বুঝিয়াছি যে চিরপূর্ণের একদিকে অনন্ত এবং একদিকে শূন্য, অথবা শূন্য ও পূর্ণ একই বস্তুর বিভিন্ন লক্ষ্যস্থানানুসারে দুইটী ভাব এবং দুইটী নাম। কারণ অনন্তের সহিত দিক্ আরোপ করা যায় না। কেবল আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য ঐ প্রকার

বলিতে হয় মাত্র। যাহা হউক এ শূন্য বৌদ্ধের অভাবাত্মক শূন্য নহে, ইহা ভাবাত্মক শূন্য নহে, ইহা ভাবাত্মক সত্য। এই শূন্য ও অনন্তের মধ্যস্থলে জগদ্বৈচিত্র্য; উচ্চগণিতের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে, অনন্ত ও শূন্যের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র গাণিতিক আকার প্রকার, নামরূপ প্রকটিত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মাত্মক অনন্ত ও ব্রহ্মাত্মক শূন্যের মধ্যে জাগতিক বিভিন্ন আকার প্রকার ও নামরূপ। গাণিতিক বিভিন্ন আকার প্রকার, নামরূপ যেমন একই রূপ গাণিতিক সঙ্কেতের (Equation) বিভিন্ন পরিণতিতে উৎপন্ন এবং তাহাতে অবস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগতিক অনন্ত বৈচিত্র্যময় আকার প্রকার নামরূপ একই শূন্য-পূর্ণাত্মক ব্রহ্ম হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়া এবং তাহাতে অবস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। ব্রহ্ম যে শূন্য-পূর্ণাত্মক ইহা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (শ্বেতাশ্বতর ৩।২০)। বলা বাহুল্য যে "অণীয়ান্" এর শেষ পরিণতি শূন্যে এবং "মহীয়ানের" শেষ পরিণতি অনন্তে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অণু, মহান্, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি দেশকালপরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তু নিচয়ে প্রযোজ্য। যে বস্তু একাধারে প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত, দেশকালপরিচ্ছিন্ন এবং দেশকালাতীত, তাহাতে উক্ত প্রকার ভেদ প্রযোজ্য নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন বস্তুর নিদর্শনে পরম-তত্ত্বকে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" বলিয়াছেন,—ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে তিনি এক সময়ে একদেশে "অণোরণীয়ান্" এবং অন্য কালে অন্য স্থানে "মহতো মহীয়ান্"—তিনি সমকালে, একাধারে "অণোরণীয়ান্" ও "মহতো মহীয়ান্"—অর্থাৎ শূন্য ও অনন্ত। আমাদের দেশকাল প্রভাবে প্রভাবান্বিত বুদ্ধি ও তৎজাত যুক্তি বিচারে "শূন্য" ও "অনন্ত" পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পরমতত্ত্বে আমাদের যুক্তি বিচার কার্যকারী নহে, সমুদায় দৃশ্যতঃ বিরোধের সমাধান সেখানে। সেখানে দেশকাল বস্তু পরিচ্ছেদ বর্তমান নাই—ইহা "ত্রিপাদবিভূতি-মহানারায়ণোপনিষৎ" সুস্পষ্ট বলিয়াছেন :—"দেশতঃ-কালতঃ-বস্তুতঃ-পরিচ্ছেদ-রহিতং ব্রহ্ম", সুতরাং অণু, মহান্, স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি তাঁহাতে প্রযোজ্য নহে। তিনি যখন অণু, তখনই মহান্, যখন শূন্য, তখনই অনন্ত।

সমুদায় বাদ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে :—

অতএব আমরা বুঝিলাম যে ব্রহ্মে একাধারে সমুদায় বিরোধী গুণের সমাধান ও পরিণতি। তিনি সমকালে একাধারে নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকার, নিরীহ-ক্রিয়াশীল। তিনি অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, অরূপ হইলেও সমকালে সান্ত, পরিচ্ছিন্ন ও উরুরূপ। ভক্তের অভীষ্ট পূরণের জন্য নিজের অনন্তত্ব প্রভৃতি পরিহার করিয়া সান্ত, ইষ্টমূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হন। ইহা ভগবান সূত্রকার—"স্বার বিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ" ৩।২।৩৪ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে ভক্ত তাঁহাকে

যে ভাবে ভজনা করে, তাহাকে তিনি সেই ভাবেই প্রতিভজন করেন, অর্থাৎ অভীষ্ট পূরণ করেন। এইজন্য ভগবান গীতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"। গীঃ ৪।১১। তবে ভগবদ্ রহস্য এই, যে তিনি দৃশ্যতঃ সান্ত, পরিচ্ছিন্ন, কোনও বিশিষ্টরূপ ধারণ করিলেও তাঁহার সমুদায় রূপ সমকালে বিভু, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী। ভগবান সূত্রকার "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্" ৩।৩।৯ সূত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক অদ্বিতীয়, সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদ রহিত বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করিবার কিছুই নাই। তাঁহার সান্ত পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান ইষ্টমূর্ত্তিতে হস্তপদাদি অবয়ব পরিদৃষ্ট হইলেও, উহারা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাঁহার স্বরূপ ও বিগ্রহে ভেদ নাই, দেহ-দেহী ভেদ নাই। ইহা ভগবান সূত্রকার—"অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ" ৩।২।১৪ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই কারণ শ্রীমদ্‌ভাগবত সেই পরম তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন :—"তং সর্ব্ববাদ বিষয় প্রতিরূপশীলম্" (১২।৮।৪৩)—তিনি সমুদায়বাদ সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতিরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সমুদায়বাদ কি অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, জড়বাদ, নাস্তিকবাদ ইত্যাদি সমুদায় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে। উপরে যে অপরোক্ষানুভূতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত স্বতঃই আসিয়া পড়ে যে, যে সাধক নিজ সাধনার সামর্থ্য ও অধিকার অনুসারে, ব্রহ্মতত্ত্বের যতটুকু অনুভব করিয়াছেন, তিনি ততটুকু তাঁহার প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান বলিয়া জোরের সহিত প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কেহই সমগ্রভাব অনুভব করিতে পারেন নাই, একারণ সমগ্র প্রকাশ কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ঘটিলে অনুভূতি কি প্রকার হয়, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। যখন প্রকাশের অবস্থা হয়, তখন সে অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে না। উহার ক্ষীণ আভাস বর্ত্তমান থাকিলেও ভাষার এবং বাক্যের অসমর্থতা হেতু তাহার প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এজন্য শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম কোনও কালে উচ্ছিষ্ট হন নাই"। তাঁহার আরও একটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য উক্তি আছে—"অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেন চিনির পাহাড় সদৃশ, ক্ষুদ্র পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ভক্ত জীবকুল উহার সমগ্র উদরসাৎ করিতে প্রচণ্ড ক্ষুধায় ধাবিত হইলেও সামান্য কণামাত্র পাইয়াই পূর্ণতৃপ্তিলাভ করিতেছে। শুকদেবাদি বিশেষ জ্ঞানী ভক্তেরা ঐ শ্রেণীর মধ্যগত কিঞ্চিৎ বড় পিপীলিকাদিগের ন্যায় ঐ পর্ব্বত হইতে অপেক্ষাকৃত বড় এক কণা শর্করামাত্র লইয়াই তৃপ্ত ও শান্ত হইতেছেন"। ব্রহ্ম যাহা, তাহাই। সমুদায় বাদের তিনি একমাত্র আশ্রয়। একারণ কি অদ্বৈতবাদ, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কি দ্বৈতবাদ, কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, কি অন্যান্য যে কোনও বাদ কেহই ব্রহ্মের সমগ্র নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং হইতে পারে না। প্রত্যেকেই ব্রহ্মের একদেশমাত্র নির্দ্দেশ করিয়া নিজ নিজ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ভগবান সূত্রকার, "নেতি নেতি" শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রকটন প্রসঙ্গে—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি

প্রতিষেধতি, ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।”—৩।২।২২ সূত্র প্রণয়ন করিয়া এই তত্ত্বই বিশদ্‌ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে উক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য। এই একই কারণে ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন :—

“মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহম্”।

ভাগবত ১১।২১।৪১

বেদ কর্ম্মকাণ্ডে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে আমাকেই দেবতারূপে ব্যক্ত করে এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে।

ভাগবত ১১।২১।৪১

প্রকৃতপক্ষে বেদের প্রতি মন্ত্র, প্রতি স্তুতি, প্রতি কর্ম্ম একমাত্র পরমতত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে। বেদের আদি মধ্যে ও অন্তে একমাত্র ব্রহ্মই প্রতিপাদিত। শ্রীমদ্ ভাগবত একটি শ্লোকে ইহা বড়ই সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—

যথা হিরণ্যং সুকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ॥

ভাগ : ১১।২৮।২০

যেমন সমস্ত হিরণ্ময় দ্রব্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যাকারে উৎপত্তির পূর্ব্বে স্বর্ণ বর্ত্তমান, পশ্চাৎ অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যাকারের ধ্বংসের পরেও একই স্বর্ণ বর্ত্তমান, মধ্যে ব্যবহার্য্যমান কেয়ুর কুণ্ডলাদি আকারে পরিণত অবস্থায়, সেই স্বর্ণই বর্ত্তমান, সেইরূপ বিশ্বের আদিতে, অন্তে ও মধ্যে, আমি নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছি।

বিশ্ব সম্বন্ধে যাহা—বেদ সম্বন্ধেও তাহা। ফলতঃ বিশ্ব বেদ হইতে উদ্‌ভূত ইহা মৎকৃত “গায়ত্রী রহস্য” গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে আর পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। অন্যত্র ভাগবত এই একই কথা বলিয়াছেন :—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ভাগ : ২।৯।৩২

ইহার সরল অর্থ ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে।

কি লৌকিক, কি বৈদিক সমুদায় নাম মুখ্যভাবে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে :—

সমুদায়বাদ যখন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অস্তিত্ব লাভ করে, তখন তাঁহাকে যে কোনও নামে অভিহিত করা হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ভাগবত এই জন্যই বলিয়াছেন :—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ভাগ: ১।২।১১

তত্ত্ববিদ্‌গণ এক অদ্বয় জ্ঞানকেই কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান্‌ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

বুঝিতে হইবে যে এই তিনটি নাম অনন্ত নামের উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কি লৌকিক, কি বৈদিক সমুদায় নাম মুখ্যভাবে সেই পরমতত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে এবং কেবল গৌণভাবে তত্তৎ নামধেয় পদার্থকে নির্দ্দেশ করে। ইহা সূত্রকার ভগবান্‌ বাদরায়ণ "চরাচর ব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎতদ্‌ ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ" ২।৩।১৭ সূত্রে প্রতিপাদিত করিয়াছেন, ইহার বিস্তারিত আলোচনা মূল গ্রন্থে উক্ত সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে।

সবিশেষ-নির্ব্বিশেষভাব, মূর্ত্তামূর্ত্তভাব, ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্ন :—

"ব্রহ্ম" শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনায় আমরা পাইলাম—তিনি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, নিরংশ, চিরপূর্ণ, এক, অদ্বিতীয় এবং "শূন্য" পূর্ণেরই নামান্তর মাত্র; তিনি, যেমন ভাষায় বলিতে গেলে, একদিকে মহৎ হইতে মহত্তম, অন্যদিকে অণু হইতে অণুতম, সমুদায় বিরোধের পরিসমাপ্তি অনন্তে; একারণ ব্রহ্ম এককালে একাধারে নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, নির্গুণ-সগুণ ইত্যাদি। কাল, আধার, বিশেষ, গুণ, আকার, ক্রিয়া প্রভৃতি সমুদায় প্রপঞ্চ জগতের অন্তর্ভুক্ত, আবার প্রপঞ্চ জগৎ ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর নহে ইহা ক্রমশ: পরিস্ফুট হইবে। এখন ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, তাহা হইলে স্বরূপের দিক হইতে যিনি—নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার, নিরীহ, তিনিই প্রপঞ্চের দিক হইতে সবিশেষ, সগুণ, সাকার, ক্রিয়াশীল, একই বস্তুর দুই প্রকার দর্শন মাত্র। এই প্রকার দর্শনে বস্তুর স্বরূপ হানি হয় না। ইহা ভগবান সূত্রকার "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয় লিঙ্গং সর্ব্বত্রহি" ৩।২।১১ সূত্রে ও "উভয় ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" ৩।২।২৭ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত সূত্রদ্বয়ের আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহার সবিশেষ-নির্ব্বিশেষভাব, মূর্ত্তামূর্ত্তভাব, তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। তিনি গুণও বটে, গুণীও বটে, আবার গুণাতীতও বটে। আমি যদি সমুদায়ে ব্রহ্ম দর্শন না করিয়া অন্যরূপ দর্শন করি, তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ হানি হয় না, আমার রোগদুষ্ট চক্ষু: যদি স্বয়ম্প্রকাশ সূর্য্য দর্শন করিতে না পারে, অথবা তাহার জ্যোতিঃরূপ না দেখিয়া অন্যরূপ দেখে, তাহাতে সূর্য্যের স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না, আমার পিত্ত দূষিত রসনা যদি শর্করার মিষ্টত্ব অনুভব করিতে না পারে, তাহাতে শর্করার মিষ্টত্বের অপলাপ হয় না, সেইরূপ প্রপঞ্চগত জীব আমি যদি পরমতত্ত্বের প্রকৃত দর্শন লাভ করিতে না পারি, তাহাতে তত্ত্বের স্বরূপ হানি হয় না। তত্ত্ব নিজ অপ্রচ্যুত স্বরূপে চির বর্ত্তমান থাকেন।

কার্য্য কারণ শৃঙ্খল অনুবর্ত্তন করিতে করিতে আমরা পাই, একমাত্র মূল কারণ ব্রহ্ম :—

জগতে কারণ-কার্য্যশৃঙ্খল বর্ত্তমান। ইহা অতিশয় স্থূলদৃষ্টি মানবের চক্ষেও প্রতীত হয়। শ্রুতিও ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

"কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি"

(ত্রিপাদবিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ)

—কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি হয় না।

পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে আমাদের আহার্য্য অন্নোৎপত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই অন্নোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে, আমরা পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি, বীজ, ক্ষেত্রে তাহার রোপণ ও বৃষ্টির দ্বারা তাহার পোষণ প্রভৃতি দেখিতে পাই। বৃষ্টির কারণ মেঘ, তাহার কারণ অনুসন্ধানে দেখিতে পাই—সাগর ও জলাশয়াদি হইতে জল সূর্য্য কিরণে শোষিত হইয়া বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হওতঃ মেঘে পরিণত হয়। এই প্রকার প্রত্যেক কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে, আমরা কারণ-কার্য্য-শৃঙ্খল, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে যতদূর পারি, ততদূর লইয়া গিয়া এমন একস্থানে পৌছাই, যে তাহার পশ্চাতে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি যাইতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়া শৃঙ্খল যে সেখানে ভগ্ন হইল, তাহা নহে। অধিকতর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেহ তাহারও পশ্চাতে উক্ত শৃঙ্খলের অস্তিত্ব অনুধাবন করিতে পারেন। সুতরাং পরিসমাপ্তি কোথায়? কারণের কারণ, তাহার কারণ, তাহারও কারণ ইত্যাদি খুঁজিয়া আমরা অনন্তদূর যাইলেও যদি অনুসন্ধানের নিবৃত্তি না করি, তাহা হইলে "অনবস্থা" দোষ সংঘটিত হয়। ন্যায়শাস্ত্রানুসারে এই দোষের পরিহার প্রয়োজন। এই দোষ পরিহারের জন্য এক মূল কারণ অনুমান করিয়া লইয়া উক্ত অনুসন্ধান শেষ করিতে হয়। সমুদায় কার্য্যের মূল কারণ যদি এক না হয়, তবে অনুসন্ধানের শেষ হয় না। মূল কারণ যদি কার্য্য ভেদে বিভিন্ন হয়, তবে বিভিন্ন হইবার কারণ কি, এ প্রশ্ন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এজন্য সমুদায়ের মূল কারণ এক স্থানে, ইহা অনুমান করিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্মই সেই মূল কারণ—ইহা হইতেই সমুদায় কার্য্যের উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহাদের কারণানুসন্ধানের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি যে শুধু তাঁহাদের অনুমানের উপর, তাহা নহে। বৈদিক ঋষি সাধনালব্ধ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে মূল কারণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান শুধু কথার কথা নহে। উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারিলে প্রত্যেকে এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এবং উপযুক্ত অধিকারী হইবার উপদেশও শাস্ত্রে প্রদত্ত আছে। যিনি এই উপদেশ পালন করিবেন, তিনি উক্ত জ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। শ্রুতি অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ এই জ্ঞান মন্ত্রবদ্ধ করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লীর ১ মন্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ইহা ১।১।২ সূত্রের ভিত্তি স্বরূপ মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ সূত্রকারও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ১।১।২ সূত্র প্রণয়ন করিয়া উক্ত শ্রুতি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন এবং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার পরিসমাপ্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ :—

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে একটি ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে, উপাদান মৃত্তিকার, কর্ত্তা কুম্ভকারের এবং করণ কুলাল চক্রাদির প্রয়োজন। একটি স্বর্ণালঙ্কার গঠন করিতে হইলে উপাদান স্বর্ণের, কর্ত্তা স্বর্ণকারের এবং করণ নানাপ্রকার যন্ত্রাদির প্রয়োজন। উপাদানাদি কারণ নিমিত্ত কারণ হইতে ভিন্ন। কিন্তু উপরে যে মূল কারণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা একমাত্র। সুতরাং উক্ত মূল কারণ জগতের এবং তদন্তর্গত বস্তুজাতের উপাদান কারণ বটে, নিমিত্তাদি কারণও বটে। এ কারণ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম জগতের এবং তদন্তর্গত বস্তুজাতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? শ্রুতি ইহার উত্তর দিয়াছেন :— "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" তৈত্তিঃ ২।৭—তিনি আপনাকেই বহুরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। সূত্রকার এই তত্ত্ব "আত্মকৃতেঃ" ১।৪।২৬, "পরিণামাৎ" ১।৪।২৭ ও "তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎসঃ" ২।৩।১৪ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে উক্ত সূত্রত্রয়ের আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২।৭ মন্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তাকে ক্লীবলিঙ্গ "তৎ" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "তৎ" শব্দ ব্রহ্মের বাচক। গীতা ১৭।২৩ শ্লোকে ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"—ওঁ, তৎ ও সৎ এই তিনটি ব্রহ্মের নির্দ্দেশ।

বিশ্ব প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ হইলেও ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পৃথক্ :—

এখন প্রশ্ন উঠে ব্রহ্ম যখন নিজেকেই বিশ্বরূপে প্রকটিত করিলেন, তখন বিশ্ব কি তাঁহা হইতে পৃথক্ বা অপৃথক্? পূজ্যপাদ সূত্রকার এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া "তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ"—২।১।১৫ সূত্রে ইহার উত্তর দিয়াছেন। মূল গ্রন্থে এই সূত্রের আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ হইলেও ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পৃথক্। কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন হইলেও উহা কারণ নহে, সেইরূপ বিশ্ব—তদ্কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও বিশ্ব ব্রহ্ম নহে। "প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ" ৩।২।২৮ সূত্রের আলোচনায়ও এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ গীঃ ৯।৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ গীঃ ৯।৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ গীঃ ৯।৬

—আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া, উহার অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত-ভাবে অবস্থান করিতেছি।—ভূতসকল কারণস্বরূপ আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি আকাশের ন্যায় নিঃসঙ্গ বলিয়া, সে সকলে (ঘটাদিতে মৃত্তিকার ন্যায়) অবস্থিত নহি। আমার অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ার শক্তি দেখ—আমার আশ্রয়ে জগৎ অভিব্যক্ত হইলেও, একদৃষ্টিতে ভূতসকল আমাতে স্থিত নহে। তুমি কি মনে কর, বিশ্ব আমার পরিণাম—তাহা নহে, তাহা নহে। নিত্য-স্থির-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বরূপ আমি পরিণামী কিরূপে হইব? পরিণাম আমার সংকল্পাত্মিকা অচিন্ত্য শক্তি মায়ার কার্য্য। আমি নিত্য অসঙ্গ, কাহারও সহিত আমার সংশ্লেষমাত্র নাই—এ দৃষ্টিতে ভূতসকল আমাতে অবস্থান করিবে কিরূপে? আমি ভূতধারক, ভূতজনক, ভূতপালক হইলেও ভূতে অবস্থিত নহি। বায়ু আকাশে অবস্থিত থাকিয়াও যেমন সর্ব্বত্র সঞ্চরমাণ, উহার স্বতন্ত্র সঞ্চরণের কোনও প্রতিবন্ধক নাই, আকাশও বায়ুর আধার হইলেও এবং বায়ুর সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে অন্তরে বাহিরে বিরাজিত থাকিলেও, বায়ু তাহার কোনও প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থাপিত করিতে পারে না। আমার ও ভূতের সম্বন্ধও সেইরূপ। পরস্পর আধার-আধেয় হইলেও পরস্পর পরস্পরের সহিত অসংশ্লিষ্ট।

জীব দেহ ধারণ ও পালন করিয়া অহঙ্কার বশে দেহে সংশ্লিষ্ট থাকে—দেহকে আমি বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য দেহগত সুখদুঃখাদি ভোগ করে। ভগবান্ নিরহঙ্কার, তাঁহার সেরূপ কোনও সংশ্লেষ নাই, এজন্য তিনি সর্ব্বদা অসক্ত, উদাসীন। সুতরাং ব্রহ্ম, বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এবং জগন্ময়, বিশ্বরূপ হইলেও তিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্। বিশ্বের অভিব্যক্তি তাঁহার সংকল্পাত্মিকা মায়া হইতে। এই মায়াকেই গীতার ৯।৫ শ্লোকে "ঐশ্বর যোগ" বলা হইয়াছে। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি।

ভগবানের "অপরা" ও "পরা" প্রকৃতি পরস্পর বিরোধী নহে—সৃষ্টিকর্ত্তার সংকল্পানুসারে পৃথক্ভাবে অভিব্যক্তি :—

ব্রহ্ম বা ভগবান্ আপনাকে বিশ্বরূপে প্রকটিত করিলেও, তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বা মায়া ইহার কারণ। "মায়া" সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা পরে করা হইবে। মূল গ্রন্থের উপরে উদ্ধৃত ১।৪।২৭ ও ২।১।১৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকগুলি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে বিশ্ব, ব্রহ্ম বা ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও, ব্রহ্ম বিশ্ব

হইতে ভিন্ন। প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিলেও তিনি প্রপঞ্চগত দোষ গুণে আসক্ত হন না। তিনি নিজের অবিকৃত স্বরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন। এই বিষয়টি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য আচার্য্যগণ ব্রহ্মশক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) স্বরূপ শক্তি (২) তটস্থা শক্তি ও (৩) বহিরঙ্গা শক্তি। স্বরূপ শক্তি বিকাশে ব্রহ্ম বা ভগবান্ নিত্য তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত—কখনও স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না। বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে বিশ্ব এবং তদন্তর্গত ভোগ্য বিষয় সৃষ্ট এবং তটস্থাশক্তি বিকাশে বিশ্ব এবং তদন্তর্গত ভোগ্য বিষয় সকলের সার্থকতা বিধানের জন্য ভোক্তা জীব সৃষ্ট। ভোক্তা ও ভোগ্য এবং তাহাদের সমাবেশেই জগদ্ব্যাপার। গীতায় ৭।৫ শ্লোকে এই উভয় শক্তিকে যথাক্রমে অপরা ও পরা প্রকৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। "অপরা" ও "পরা" বিশেষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে ইহারা পরস্পর বিরোধী,—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের সঙ্কল্পানুসারেই পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্তি এবং পৃথক্ প্রতীতি। ভগবান্ সত্য সংকল্প—তিনি যাহা সংকল্প করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। সূত্রকার "অভিধ্যোপদেশাচ্চ" ১।৪।২৪ সূত্রে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং জগতে বিবিধ বৈচিত্র্য প্রতীয়মান হইলেও সে সমুদায়ের মূল একস্থানে এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টিকর্ত্তার সংকল্প বশতঃ সংঘটিত, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

জগতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব সমুদায় ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত :—

কেবলমাত্র জগৎ বা ভোগ্য সৃষ্টি হইলেই সৃষ্টি উদ্দেশ্য সফল হয় না। ভোগ্যের সার্থকতার জন্য ভোক্তার প্রয়োজন। এজন্য চৈতন্যময় ভগবানের নিজ স্বরূপ শক্তির নিকটস্থ শক্তি অর্থাৎ তটস্থা শক্তি বিকাশ করিয়া ভোগ্যে অনুপ্রবেশ। ছান্দোগ্য শ্রুতি ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :— "অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ" (ছান্দোগ্য ৬।৩।৩)।

—ভোগ্য বিষয়ে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিলেন।

ভোগ্য ও ভোক্তা, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, দৃশ্য ও দ্রষ্টা, ঘ্রেয় ও ঘ্রাতা প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের সার্থকতা সম্পাদন করে; নতুবা একের অভাবে অন্য নিরর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং সৃষ্টি উদ্দেশ্য সফলীকৃত করিবার জন্য ভোগ্যের সহিত ভোক্তার, জ্ঞেয়ের সহিত জ্ঞাতার একান্ত প্রয়োজন। সূত্রকার উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৩।৩ মন্ত্রের ভিত্তিতে—"সংজ্ঞা-মূর্ত্তি-কৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ" ২।৪।২০ সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। স্থূলদৃষ্টি দর্শকের চক্ষেও ভোক্তৃ ভোগ্যাত্মক জগৎ প্রতিভাত হয়। শ্রুতি জগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলিয়াছেন—অগ্নি-ভোক্তা সোম-ভোগ্য, অগ্নি—পুং তত্ত্বাববোধক, সোম—স্ত্রীতত্ত্বাববোধক, অগ্নি—পিতৃশক্তি সোম—মাতৃশক্তি, অগ্নি—জীবাত্মা বা পুরুষ, সোম—প্রকৃতি জড় বিজ্ঞানও [illegible] রহস্ত—প্রোটন-ইলেকট্রন, ধনাত্মক-ঋণাত্মক তড়িৎ শক্তি প্রভৃতি নামে প্রচার করিয়াছেন। ইহাদের কিছুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, যদিও ইহারা ব্রহ্ম নহে [illegible]

ইহাদিগের হইতে ভিন্ন বটে। পুরুষ স্থক্তের মন্ত্রে আমরা জানি তাঁহার অত্যল্প ক্ষুদ্র অংশে অগ্নীষোমাত্মক বা ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক অথবা জড়-চেতনাত্মক জগৎ এবং তাঁহার অনন্ত অংশ স্বরূপে অবস্থিত। সর্ব্বসময়ে মনে রাখিতে হইবে, যে অংশ ও পাদ কল্পনা কেবলমাত্র বোধ সৌকর্য্যার্থে, তত্ত্বতঃ নহে। অতএব আমরা বুঝিলাম যে—ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত জগত্তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সংজড়িত। উহারা কেহই পৃথক্ তত্ত্বান্তর নহে। একই তত্ত্বের বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন দর্শন মাত্র। সমুদায়ে ব্রহ্মদর্শনই প্রকৃত দর্শন। অন্যপ্রকার দর্শন সংসার রোগদুষ্ট বিকৃত দর্শন। এই রোগ নাশ হইলে দর্শন, বিকৃতি-ভাব হইতে মুক্ত হয় এবং সম্যক দর্শন বা প্রকৃত দর্শন লাভ হয়।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ?

উপরের প্রকরণে বলা হইয়াছে, যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফলীকৃত করিবার জন্য ভোক্তার সহিত ভোগ্যের, জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের প্রয়োজন। যদি ইহা সত্য হয় তবে মনে প্রশ্ন উঠে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তরের আভাষ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৫।২৪ শ্লোকে পাই। এই শ্লোকের ভিত্তি আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৪।১-২-৩-৪ মন্ত্রে দেখিতে পাই। বাহুল্য ভয়ে উক্ত মন্ত্রগুলি উদ্ধার করিতে বিরত হইলাম। ভাগবতের শ্লোকটি এই :—

> স বা এষ তদাদ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
>
> মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥ ভাগ : ৩।৫।২৪
>
> —"সে (প্রলয়) সময়ে একমাত্র তিনি প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সুতরাং স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও অন্য দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান নাই, অতএব মায়াদি শক্তি লীন হইয়া থাকাতে দৃশ্য এবং দ্রষ্টার অভাবে আপনি যেন অভাব করিয়া মানিতেন, কিন্তু চিচ্ছক্তি দেদীপ্যমানা ছিল, ইহাতে আপনি একেবারে নাই, এমত বোধ করেন নাই"। শ্রীমদ্রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদ।

ব্রহ্ম, ভগবান্ বা পরমতত্ত্ব জ্ঞান-স্বরূপ বটে। প্রলয়ে জ্ঞানস্বরূপের—জ্ঞানের ব্যভিচার নাই। তখনও তাঁহার অনন্ত জ্ঞান বিরাজমান। কিন্তু তাহা হইলেও জ্ঞেয়ের অভাবে তখন তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ছিল না। তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইলেও তখন তিনি জ্ঞাতা ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের কোনও নিদর্শন ছিল না। জড় বিজ্ঞান দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। সূর্য্য প্রকাশ স্বরূপ, প্রকাশিকা শক্তি সূর্য্যে বিদ্যমান, কিন্তু প্রকাশ্য না থাকিলে উক্ত প্রকাশিকা শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। প্রকাশ্য বস্তুর উপর প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হইলে, তবে

প্রকাশিকা শক্তি অনুভূত হয়। সেইরূপ জ্ঞেয় পদার্থের উপর জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞানালোক প্রতিফলিত হইলে, তবে জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ইহার নিদর্শনে আমরা সহজে বুঝিতে পারি, যে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি, সমুদায় শক্তিতে শক্তিমান ব্রহ্মে অনন্তগুণে বিদ্যমান থাকিলেও, শক্তি সুপ্তাবস্থায় লীন থাকায় এবং দৃশ্য, শ্রাব্য, ঘ্রেয় প্রভৃতি বর্ত্তমান না থাকায়, তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব, শ্রোতৃত্ব, ঘ্রাতৃত্ব অপ্রকটীকৃত ছিল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান অব্যভিচারীভাবে বর্ত্তমান থাকায়, তিনি উক্ত জ্ঞাতৃত্ব, শ্রোতৃত্ব, ঘ্রাতৃত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধে নিজেকে যেন অভাবগ্রস্তমত অনুভব করিয়াছিলেন। যদিও তিনি "আত্মারাম, আপ্তকাম, নিজলাভপূর্ণ", তাঁহার অভাব থাকা সম্ভব নহে, তথাপি অভাবগ্রস্তের মত অনুভব, তাঁহার নিজের ইচ্ছাবশতঃই হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল তাহার উত্তর নাই। এই ইচ্ছাই তাঁহার মায়া। এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জ্ঞেয়ের বিধান, দৃশ্যের প্রসার, শ্রাব্যের মধুর নিক্বণ, ঘ্রেয়ের সুরভি উচ্ছ্বাস, ভোগ্যের বিচিত্র সজ্জা এবং উহাদের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য, আপন তটস্থা শক্তিকে প্রকটীকৃত করিয়া, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, ভোক্তা সাজিয়া উহাদের সম্ভোগ এবং তজ্জনিত আনন্দলাভ ও আনন্দ বিতরণ। সুতরাং বুঝা গেল, কি জ্ঞাতা—জ্ঞেয়, কি দ্রষ্টা—দৃশ্য, কি শ্রোতা—শ্রাব্য, কি ঘ্রাতা—ঘ্রেয়, কি ভোক্তা—ভোগ্য সকলই ব্রহ্মের শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত। উহাদের কেহই তত্ত্বান্তর নহে। তাঁহার ইচ্ছাতেই বিভিন্ন প্রকারে অভিব্যক্তি এবং বিভিন্ন ক্রিয়া বৈচিত্র্য। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন :—

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

শ্বেতাশ্বতর ১।১২

—সর্ব্বদাই আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মস্বরূপে অবস্থিত এই ব্রহ্মকে জানিবে, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই। ভোক্তা-জীব, ভোগ্য-জগৎ এবং প্রেরিতা ঈশ্বর এই তিনই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম এইরূপে জানিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর ১।১২

সৃষ্টির প্রয়োজন কি ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম চিরপূর্ণ, নিরংশ, এক, অদ্বিতীয়। যদি তাহা হয় তবেত তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই, কোনও অভাব নাই এবং সেকারণ অভাব পূরণেচ্ছা নাই। বিশেষতঃ স্বরূপে তিনি নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, জগদ্ সৃষ্টির পর তাঁহার সবিশেষ, সগুণ ভাবাদি পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি ? লোকদৃষ্টান্তে দেখা যায়, যে প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোনও কার্য্য করে না,

তবে জগদ্‌সৃষ্টির কারণ কি ? জগদ্‌সৃষ্টির প্রয়োজন স্বীকার করিলেই সৃষ্টিকর্ত্তার কোনও প্রকার অভাব বর্ত্তমান আছে এবং সেই অভাব পূরণই প্রয়োজন, এ প্রকার স্বীকৃতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ে কোনও কামনা থাকে না, সুতরাং অভাব নাই। শ্রুতি মন্ত্রটি এই :—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

কঠ ২।৩।১৪, বৃহঃ ৪।৪।৭

—যখন মর্ত্ত্য সাধকের হৃদয়স্থ কামনা সমুদায় হইতে মুক্তি প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া ইহলোকেই ব্রহ্ম উপভোগ করেন।

যখন মর্ত্ত্য সাধনা প্রভাবে এই প্রকারে সমুদায় কামনা হইতে মুক্তিলাভ করে, কোনও অভাব জ্ঞান তাহার থাকে না, তখন স্বস্বরূপে অপ্রচ্যুতরূপে বর্ত্তমান ব্রহ্মের অভাব কোথা হইতে আসিবে ? সুতরাং তাঁহার জগদ্‌সৃষ্টির প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে ভগবান বাদরায়ণ—"ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" ২।১।৩৩ সূত্রে তাঁহার সৃষ্টির প্রয়োজন নাই, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া, পরসূত্রে বলিলেন, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" ২।১।৩৪—যে ইহা তাঁহার লীলামাত্র, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। লোকদৃষ্টান্তে দেখা যায়, যে স্তনন্ধয় শিশু, ধূলিপূর্ণ অঙ্গনে বসিয়া, মুষ্টি মুষ্টি ধূলা নিজের মস্তকে, সর্ব্বাঙ্গে এবং চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতেছে, সঙ্গীবালকগণকেও সেইরূপ সাজাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাস্য উচ্ছ্বাসে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কোনও যুক্তি-বিচার নাই, বিকার নাই, দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, নিজের আনন্দেই নিজে বিভোর। ভগবান্ বা ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি ও এইরূপ বালকের অহৈতুক ধূলি নিক্ষেপ, কেবল খেলা মাত্র এবং আনন্দ উপভোগ। একা একা খেলায় চমৎকারিত্ব থাকে না—একারণ বহুত্বের সংঘটন। সকলে এক প্রকার হইলেও খেলায় বৈচিত্র্য থাকে না, নিতান্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে, একারণ জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য খেলায়, প্রত্যেক উপকরণের অর্থাৎ প্রত্যেক স্থাবর জঙ্গমাদির আকৃতি প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেক জীবের গতি, ভঙ্গী, স্বর, চিন্তাপদ্ধতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। জগতে অতীত ও বর্ত্তমান সংখ্যাতীত মানবের মধ্যে কোনও দুইজন এক প্রকারের নহে। এই বিভিন্নতার অবান্তর কারণ নির্দ্দেশের প্রচেষ্টা শাস্ত্র করিয়াছেন। কিন্তু মূলে লীলা বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য, সেই লীলাময়ের সংকল্পই মুখ্য কারণ।

সৃষ্টি সংকল্পের কারণানুসন্ধান নিরর্থক :—

এই সংকল্প হইবার কারণ কি ? তাহার কোনও উত্তর শাস্ত্র দেন নাই। দিবার কথাও নহে। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র কর্ত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কে আছে ? সুতরাং সংকল্প কেন হইল, তাহার উত্তর অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন,

শ্রুতি অঙ্গীকার করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "অনবস্থা" দোষ পরিহারের জন্য, এক মূল কারণ, শ্রুতি অনুমান করিয়া, অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া উহা মন্ত্রবদ্ধ করিয়াছেন। সেই "অনবস্থা" দোষ পরিহারের জন্যও, স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জগৎস্রষ্টার সংকল্পের কারণানুসন্ধান নিরর্থক। চৈতন্যময় বিশ্বস্রষ্টার সংকল্প কেন হইল, তাহারও অনুসন্ধান নিরর্থক।

স্বপ্রকাশ সূর্য্যের আত্মপ্রকাশ কি করিয়া হয়, সে কারণ অনুসন্ধান যেমন নিরর্থক, চৈতন্যময় বিশ্বস্রষ্টার সংকল্প কেন হইল, তাহারও অনুসন্ধান নিরর্থক। সংকল্প চৈতন্যাত্মক—চেতনেরই সংকল্প হইয়া থাকে, অচেতনের সংকল্প হইতে পারে না। সুতরাং যিনি চৈতন্যময়, তাঁহার সংকল্প কেন হইল, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া যা, আর তিনি চৈতন্যময় কেন, এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানও তাই। উভয়ের প্রভেদ নাই। শ্রুতি চৈতন্যের সহিত সংকল্পের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন :—"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি।" ছান্দোগ্য ৬।২।১-৩ এই শ্রুতির অর্থ ১।১।৫ সূত্রের শিরোদেশে দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন, যে সৃষ্টির পূর্ব্বে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, এক অদ্বিতীয় "সৎ" স্বরূপে ছিল। এই "সৎ" যে ব্রহ্ম, তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বে উদ্ধৃত গীতায় ১৭।২৩ শ্লোকে "সৎ" শব্দ যে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে, তাহা আমরা জানিয়াছি। সুতরাং প্রারম্ভে উদ্ধৃত শ্রুতির "অসতো মা সদ্গময়" মন্ত্রাংশে যে "সৎ" শব্দ আছে,তাহা যে পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা সুস্পষ্ট। উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে "ঐক্ষত" পদ আছে, এই পদের অর্থ—আলোচনা করিলেন, সংকল্প করিলেন—এই সংকল্পের কর্ত্তা কে? শ্রুতি বলিতেছেন "তৎ" অর্থাৎ সেই 'সৎ' স্বরূপ, যাঁহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ তাদাত্ম্য ভাবে লীন ছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে, যে শ্রুতি ক্লীবলিঙ্গ "তৎ" শব্দ "ঐক্ষত" পদের কর্ত্তৃরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে বুঝিতে হইবে, যে সংকল্পকর্ত্তাকে পুরুষ বা স্ত্রী বলা যায় না—কোনও কিছু আরোপ তাঁহাতে করা যায় না। অনির্দ্দেশ্য বলিয়াই "তৎ"—কিছু উহাতে অপ্রযোজ্য নহে, আবার কিছুর দ্বারা উহার সমগ্র নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। একারণ যাহা "তৎ" তাহাই "সংকল্প"। সাধারণ জীবের পক্ষে, আমার সংকল্প তোমার সংকল্প ইত্যাদি ব্যবহার হয়—অর্থাৎ আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব হইতে "সংকল্প" ভিন্ন, কিন্তু পরমতত্ত্বের পক্ষে তাহা নহে। তাঁহাতে স্বজাতীয়—বিজাতীয়—স্বগত —কোনও প্রকার ভেদ বর্ত্তমান নাই। তাঁহার দেহ দেহী ভেদ নাই। ইহা ভগবান সূত্রকার ৩।২।১৪ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব বুঝিতে হইবে, যে তিনিও যাহা, তাঁহার সংকল্পও তাহাই। তবে অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির জন্য, সংকল্পের প্রকট ও অপ্রকটভাব। গায়কের গান গাহিবার শক্তির ন্যায়। গায়ক কি সর্ব্বসময়ে গান করেন? তাহাত করেন না। নিজ ইচ্ছায়, কোনও সময়ে উক্ত শক্তি প্রকটন করিয়া, আনন্দানুভব করেন ও আনন্দ দান করেন।

ব্রহ্মের সৃষ্টিও তাই। কখনও সংকল্পশক্তি প্রকটন করিয়া জগৎসৃষ্টি করেন, এবং তাহাতে আনন্দ পান, এবং সৃষ্টগণকে আনন্দাভিমুখে অগ্রসর করান। মূলে এই আনন্দানুভব আছে বলিয়াই, সূত্রকার "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (২।১।৩৪) বলিয়া ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতিও "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈত্তিঃ ২।৭) বলিয়াই পরক্ষণেই বলিতেছেন—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥" (তৈত্তিঃ ২।৭)

—তিনি রস স্বরূপ, বিশ্ব জগৎ এই রসের কণা পাইয়া আনন্দলাভ করে।

এই আনন্দ বিতরণ এবং নিজে আনন্দলাভের জন্য তিনি স্বয়ং আপনাকে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করিলেন। যিনি ক্রীড়ক, তিনিই ক্রীড়া, তিনিই ক্রীড়োপকরণ, তিনিই ক্রীড়ার সঙ্গী। সমুদায় আনন্দের উপাদানে গঠিত। সমুদায়ের আদি, মধ্যে, অন্তে, সমুদায়ের অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন কিছুই নাই। সূত্রকারও ১।১।১৩ সূত্রে "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"—তিনি আনন্দময় বলিয়া বুঝাইয়াছেন। আনন্দময়ের আনন্দ উপভোগের জন্য এবং নিজ স্বরূপভূত ক্রীড়ার সহায় এবং উপকরণগণকে আনন্দ দিবার জন্যই বিশ্বসৃষ্টি। তাঁহার বৈষম্য, নৈর্ঘৃণ্য বর্ত্তমান নাই, তিনি আনন্দ, সকলেই তাঁহার কাছে সমান। ভগবান্ সূত্রকারও "বৈষম্য—নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি"—২।১।৩৫ সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

জগতে দুঃখকষ্টের অনুভূতি ভবরোগের নিদর্শন :—

তবে যে জগতে দুঃখকষ্ট পরিদৃষ্ট হয়, উহাদিগকেও কি আনন্দ বলিতে হইবে? তাহা হইলে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার সংঘটিত হইবে না কি? ইহার উত্তর সম্যক দর্শনের অভাব, প্রকৃত দৃষ্টির অপলাপ ভবরোগ ইহার কারণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পিত্তরোগদুষ্ট রসনায় শর্করা তিক্ত বোধ হইলে, শর্করার মিষ্টত্বের অপলাপ হয় না, রোগের উপসর্গ পরিলক্ষিত হয় মাত্র। সেইরূপ আনন্দময়ের আনন্দ উপভোগের নিদর্শন, দুঃখময় বলিয়া মনে হইলে, বুঝিতে হইবে, যে মন বিশেষ রোগগ্রস্ত। এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাও শাস্ত্রে কথিত আছে।

জগৎ ক্রীড়ায় সাধক ও শাসক নিয়ম :—

কিন্তু এই উত্তর ত হৃদয়গ্রাহী নহে। দুঃখের দারুণ পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া "ত্রাহি ত্রাহি" ডাকিতেছি, অথচ মনে করিতে হইবে, যে দুঃখ দুঃখই নহে, সম্যক্ দৃষ্টির অভাব ইহার কারণ—ইহা কি মন বুঝিতে চাহে? ইহা কি মনে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া, দুঃখের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার উপশম করিতে সমর্থ হয়? জগৎ স্রষ্টা যদি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং তিনিই যদি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং জীব যদি তাঁহারই অংশ, তবে সুখী-দুঃখী, ধনী-নির্ধন, রাজা-ভিক্ষুক এ প্রকার বৈষম্য কেন? জগৎ কেন দুঃখনিলয় করিয়া তিনি সৃষ্টি করিলেন!

সর্ব্বশক্তিমান্ কি ইহা অন্যপ্রকার করিতে পারিতেন না? ইহাতে কি তাঁহাতে বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ আসিয়া পড়ে না? পূজ্যপাদ সূত্রকার এই সমুদায় আপত্তি উত্থাপিত করিয়া—২।১।২৩ ও ২।১।৩৫ সূত্রে সমাধান করিয়াছেন। উহার সবিস্তার আলোচনা মূলগ্রন্থে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য, এখানে উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। তবে প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি, যে আমরা আমাদের ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করি, যে প্রত্যেক খেলায়, সহযোগী ও প্রতিযোগীর বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী, নতুবা খেলায় বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব থাকে না। ঐ সমুদায় সহযোগী ও প্রতিযোগীগণকে, স্ব স্ব ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিচালিত করিবার জন্য, খেলার প্রবর্ত্তক কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। যদি কোন বিশেষ ক্রীড়ক উক্ত নিয়ম মানিয়া না চলেন, উহার অপব্যবহার ও ব্যভিচার করেন, তবে তাঁহাকে শাসন ও সাবধান করিবার জন্যও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, যে নিয়ম দুই প্রকারের হওয়া আবশ্যক—প্রথম সাধক নিয়ম, দ্বিতীয় শাসক নিয়ম। প্রতি খেলায়, উক্ত দ্বিবিধ নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে, সহযোগী ও প্রতিযোগী ক্রীড়কগণকে, ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন—নতুবা খেলা হৃদয়গ্রাহী হয় না। প্রত্যেক ক্রীড়ককে, উক্ত সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার মধ্যে, ঐ নিয়ম সকল মানিয়া, ক্রীড়া করিতে হয়। নতুবা খেলা সুষ্ঠু সম্পাদিত হয় না। খেলার উক্ত নিয়মানুসারে প্রতি খেলায় জয় পরাজয় আছে। উক্ত জয় পরাজয় খেলার অঙ্গ মাত্র—প্রবর্ত্তক, ক্রীড়ক ও দর্শকগণের আনন্দ বিধানই উক্ত জয় পরাজয়ের উদ্দেশ্য। যদি ক্রীড়ক, ক্রীড়ার নিয়মানুগত জয় পরাজয়কে খেলার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন, তবে তিনি খেলার আনন্দ হইতে বিচ্যুত হন না; তাহা না করিয়া, যদি তিনি উহাতে তাঁহার আমিত্ব আরোপ করিয়া মত্ত হইয়া পড়েন, ধনীপুত্রের মত ঘোড়দৌড় খেলায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়া পরাজিত হইবার পর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, নিরতিশয় দুঃখে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে, তাহা খেলার বা তাহার প্রবর্ত্তকের দোষ নহে। ক্রীড়কের নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির দোষ। বিশ্বক্রীড়নক ভগবানও, বিশ্বখেলা প্রবর্ত্তনের সময়, ক্রীড়কগণকে খেলায় সুষ্ঠু পরিচালিত করিবার জন্য, কতকগুলি সাধক, কতকগুলি শাসক, নিয়ম প্রণয়ন করিয়া, খেলার সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। সাধক নিয়মানুসারে, প্রত্যেক ক্রীড়ক,—কি ক্রীড়ক, কি ক্রীড়োপকরণ, কি রঙ্গমঞ্চ, সমুদায়ে ভগবদ্দর্শন করিলে, ক্রীড়ায় আনন্দের তুফান ছুটিতে থাকে। যদি কেহ, তাঁহার সীমাবদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলে, উক্ত নিয়মের অপব্যবহার বা ব্যভিচার করেন, তবে তাঁহাকে শাসক নিয়মাবলির ভিতর পড়িতে হয়। এই শাসক নিয়মাবলি—"কর্ম্মবাদ" নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনয়কারীগণ এই দ্বিবিধ নিয়ম পরম্পরা মানিয়া চলিতে বাধ্য। অভিনেতাগণ, এই নিয়মগুলি খেলারই অঙ্গরূপে মানিয়া লইয়া যদি অভিনয় করিয়া চলে, তবে অভিনয় সুষ্ঠু সম্পাদিত হয়, বৈচিত্র্য রক্ষা হয়, চমৎকারিত্ব, ক্রীড়ক, ও ক্রীড়ার প্রবর্ত্তক সকলকেই

আনন্দ প্রবাহে আপ্লুত করে। যদি কেহ উক্ত অভিনয়ে, আপন অভিনেতৃস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, নিজ কর্তৃত্ব, নিজ ব্যক্তিত্ব উহাতে আরোপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অভিনয়ের ব্যাপার পরম্পরা হইতে উদ্‌ভূত—প্রকৃত পক্ষে কল্পিত—এবং শাসক নিয়ম বা কর্ম্মবাদানুসারে অবশ্য ভোক্তব্য, সুখ দুঃখাদি যে ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কপট দ্যূতাভিনয়ে একজন ধনী সন্তান মহারাজ যুধিষ্ঠির সাজিয়াছেন। তিনি অভিনীত দ্যূতক্রীড়ার পণে পরাজিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, রাজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, চীরবসন ধারণ করতঃ বনগমন করিতে বাধ্য; অপর পক্ষীয় দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি পরিচ্ছদধারীগণের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইতে হইতে অভিনয় মঞ্চ হইতে অপসৃত হইতেছেন। তিনি যদি তাঁহার আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, আপনার কল্পিত অভিনেতৃস্বরূপেই তন্ময় হইয়া, আপনাকে পরাজিত, লাঞ্ছিত, সর্ব্বস্বহীন, অপমানিত মনে করিয়া কষ্ট পান, তবে সে দোষ তাঁহার নিজেরই; অভিনয়ের স্বত্বাধিকারীর বা প্রবর্ত্তকের নয়, অপর কাহারও নয়। সেইরূপ বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অভিনয়কারীগণ, যদি আপনাদের আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, অভিনয়ের ব্যাপার পরম্পরা আত্মস্বরূপে আরোপ করেন. তাহা হইলে সেজন্য সুখ দুঃখ যে তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে. ইহা কি আর বলিতে হয়? এ দোষ তাঁহার নিজের—অভিনয়ের নিয়ম প্রবর্ত্তনকারীর নয়।

বিশ্বরঙ্গমঞ্চে ক্রীড়ক, রঙ্গমঞ্চ, সাজ, পোষাক, দৃশ্যাবলি—সমুদায় একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি :—

ইহাও মনে রাখা আবশ্যক, যে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে—রঙ্গমঞ্চ, সাজ, পোষাক, দৃশ্যাবলি, ব্যাপার পরম্পরা—সমুদায় একের বহিরঙ্গাশক্তি বিকাশে উদ্‌ভূত। সেই একেরই তটস্থা শক্তি অভিনেতৃরূপে অভিনয়ের সার্থকতা সম্পাদন করেন এবং সেই একই অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষীরূপে উক্ত অভিনয় হইতে আনন্দ উপভোগ করেন। সেই অদ্বিতীয় এক হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। সুতরাং সুখ দুঃখ প্রভৃতি অভিনেতৃগণের বিকৃত বুদ্ধিতে উপলব্ধ হইলেও—সমুদায় আনন্দের খেলা, আনন্দময়ের আনন্দানুভূতি, আপনা দ্বারা আপনাকে সম্ভোগ, শক্তির সহিত শক্তিমানের খেলা, তাঁহার আত্মক্রীড়ার, আত্মরতির নিদর্শন, একের বহু হইবার সংকল্প সম্পূরণ, এক কথায় তাঁহার আত্মসংবেদন। প্রলয়ে শক্তি আপনাতে লীনা করিয়া অবস্থানের সময়, অব্যভিচারী জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিলেও শক্তিহীনভাবে অবস্থান করায় এবং জ্ঞেয় বর্ত্তমান না থাকায় তিনি আপনাকে অভাবগ্রস্তের মত অনুভব করিয়া থাকেন—ইহা তাঁহার স্বভাববশতঃই হইয়া থাকে—সে কারণ সৃষ্টি সংকল্প, বহুত্বের প্রকটন, জীব ও জগতের অভিব্যক্তি, বৈচিত্র্যের সমাবেশ, মহতের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান, চিরমুক্তের বদ্ধ বলিয়া ধারণা। পূজ্যপাদ সূত্রকারও "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্ ততোহস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ"—৩।২।৫ সূত্রে এই তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—মূল গ্রন্থে উক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

একমাত্র ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতিঃ :—

উপরে সূর্য্যকে "স্বপ্রকাশ, স্বয়ম্প্রকাশ" বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্য কি স্বপ্রকাশ? যদি তাহা হয়, তবে এ মূল কারণ এক হইল না—শ্রুতি তাহা স্বীকার করেন না। শ্রুতি বলেন যে একমাত্র ব্রহ্মই স্বয়ং জ্যোতিঃ; তাঁহার জ্যোতিঃতে সমুদায় জ্যোতিষ্মান্ :—

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ মুণ্ডক ২।২।৯
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

মুণ্ডক ২।২।১০

—সেই ব্রহ্মই শুভ্র-শুদ্ধ, নির্ম্মল এবং সমুদায় জ্যোতিঃর তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। আত্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মকে এইরূপই জানেন। তাঁহার জ্যোতিঃ কণা পাইয়াই সমুদায় জ্যোতিষ্মান্। তাঁহার জ্যোতিঃতেই সমুদায় প্রদীপ্ত। মুণ্ডঃ ২।২।৯-১০

পূজ্যপাদ সূত্রকারও ১।১।২৫ সূত্রে "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ"—জ্যোতিঃ যে পরব্রহ্ম, তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম যে সমুদায় জ্যোতিঃর মূল তাঁহাতে। তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার প্রকাশেই সমুদায় প্রকাশিত। একারণ প্রারম্ভে উদ্ধৃত "তমসো মা জ্যোতির্গময়" মন্ত্রাংশে "জ্যোতিঃ" শব্দ যে পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বুঝা গেল।

ব্রহ্মই—অমৃত :—

প্রারম্ভে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে, "মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়" বলিয়া বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত কঠ শ্রুতির ২।৬।১৪ মন্ত্রে "অমৃত" পদের উল্লেখ আছে। উক্ত পদের লক্ষ্য যে ব্রহ্ম, তাহা উক্ত মন্ত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। উক্ত শ্রুতি উপসংহারে তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—মন্ত্রাংশটী এই "তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি"—তাঁহাকে শুক্র (নির্ম্মল) অমৃত বলিয়া জানিবে। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম যে "অমৃত" পদ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত "মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"—মন্ত্রাংশে ব্যবহৃত "মৃত্যু" পদ জীবনের জন্মমৃত্যু-প্রবাহরূপা অবস্থা বিশেষ নহে। বৈদিক ঋষি সে মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন। তিনি "মৃত্যু" পদে "অমৃত" স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভেদজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—যাহা অমৃত স্বরূপ তোমা হইতে দূরে রাখিয়া আমাকে অবিদ্যারূপ মোহাবর্ত্তে নিপাতিত করে, আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর।

ব্রহ্ম—সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ :—

তৈত্তিরীয় শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিঃ ২।১) বলিয়াছেন; অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ও অনন্তস্বরূপ।

তারপর উক্ত শ্রুতির উক্ত প্রকরণে ২।৭ মন্ত্রে "রসো বৈ সঃ"—তিনি রসস্বরূপ বলিয়া ২।৯ মন্ত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিঃ ২।৯

এখানে মন্ত্রে "ব্রহ্মণঃ আনন্দং" আছে—ব্রহ্মের আনন্দ ইহার আক্ষরিক অর্থ। কিন্তু এই মন্ত্রে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি "রাহোঃ শিরঃ" এর ন্যায় ঔপচারিক মাত্র বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ রাহু যেমন শিরঃ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, উহার সমুদায় নিজত্ব বা রাহুত্ব উহার শিরে অর্থাৎ যে রাহু সেই শিরঃ, যে শিরঃ সেই রাহু—সেইরূপ ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ—যিনি ব্রহ্ম তিনিই আনন্দ, যিনি আনন্দ তিনিই ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রের অর্থ হইবে :—যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন ফিরিয়া আসে, সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে কিছু হইতে ভয় পাইতে হয় না।

অতএব আমরা তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ স্বরূপ" পাইলাম। প্রপঞ্চের দিক হইতে আমরা ব্রহ্মকে কি প্রকারে "সচ্চিদানন্দ" বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা মূল গ্রন্থে ৪।৪।১ সূত্রের আলোচনায় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। সেখানেও বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি, যে সৎ, চিৎ, আনন্দ ইহারা পরস্পর পৃথক গুণ বা ধর্ম্ম নহে। ইহারা একই বস্তুর বিভিন্ন লক্ষ্যস্থান হইতে বিভিন্নভাবে দর্শন মাত্র। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রোক্ত "সৎ" ই যে "সত্য" তাহা বলা বাহুল্য; এবং জ্ঞান ও চিৎ যে একই পদার্থ, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সত্য-জ্ঞান-আনন্দ যা, সচ্চিদানন্দও তাই। মানববুদ্ধি বিশ্লেষিকা বলিয়া বুঝিবার সুবিধার জন্য এক অদ্বিতীয় বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে দর্শন। পরমতত্ত্বের এই বিভিন্ন ভাব হইতে তাঁহার বিভিন্ন শক্তির পরিচয়—তাঁহার সদ্‌ভাব হইতে "সন্ধিনী", চিৎ ভাব হইতে "সংবিৎ" এবং আনন্দভাব হইতে "হ্লাদিনী" শক্তির অভিব্যক্তি। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে এই তিন স্বরূপ শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। সৃষ্টি প্রপঞ্চে আমরা এই তিন স্বরূপ শক্তির প্রতিবিম্ব যথাক্রমে "ইচ্ছাশক্তি", "জ্ঞানশক্তি" ও "ক্রিয়াশক্তি" রূপে দেখিতে পাই। কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদে এই তিন শক্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "জ্ঞানশক্তি", "বলশক্তি" ও "ক্রিয়াশক্তি"র উল্লেখ আছে—"বলশক্তি" উপরে উল্লিখিত "ইচ্ছাশক্তি"র নামান্তর বলিয়া মনে হয়। এই তিন শক্তি অঙ্গীকার করিয়া অদ্বিতীয় এক বহুত্ব প্রকটন করেন, অনামী অসংখ্য নাম গ্রহণ করেন এবং অরূপ বহুরূপ ধারণ করেন—এক কথায় সৃষ্টি বৈচিত্র অভিব্যক্ত করেন।

উপসংহার :—

অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় আমরা যে সমুদায় তত্ত্বে উপনীত হইলাম, ত্রিপাদ-বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের ভাষায় তাহা লিখিত হইল। "কালত্রয়াবাধিতং ব্রহ্ম", "সর্ব্বকালাবাধিতং ব্রহ্ম", "সগুণ-নির্গুণ স্বরূপং ব্রহ্ম", "আদি মধ্যান্ত শূন্যং ব্রহ্ম', "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "মায়াতীতং গুণাতীতং ব্রহ্ম", "অনন্তমপ্রমেয়াখণ্ডপরিপূর্ণং ব্রহ্ম", "অদ্বিতীয়-পরমানন্দ-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বরূপ-ব্যাপকাভিন্নাপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম", সচ্চিদানন্দ-স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম", "মনোবাচামগোচরং ব্রহ্ম", "অখিল প্রমাণাগোচরং ব্রহ্ম", "অমিত-বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম", "দেশতঃ-কালতো-বস্তুতঃ-পরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম", "সর্ব্বপরিপূর্ণং "তুরীয়ং নিরাকারমেকং ব্রহ্ম", "অদ্বৈতমনির্ব্বাচ্যং ব্রহ্ম", "সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং ব্রহ্ম", জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

তত্ত্বপদের অর্থ :—

ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় আমরা সর্ব্বপ্রারম্ভে উদ্ধৃত "অসতো মা সদ্গময়" ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রে কথিত "সৎ, জ্যোতিঃ ও অমৃত" যে ব্রহ্ম তাহা বুঝিয়াছি এবং আনুষঙ্গিক ভাবে "অসৎ, তমঃ ও মৃত্যু" কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। উহাদের সহিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। একারণ অধুনা আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব অতি সংক্ষেপেই আলোচনা করিব। যাহা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় বলা হয় নাই, তাহাই বলা হইবে মাত্র। উক্ত আলোচনার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি, যে তত্ত্ব পদটি, তৎ+ভাবে ত্ব প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন—ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—তৎ এর ভাব। 'তৎ' শব্দ যে ব্রহ্মবাচক, তাহা আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।৩ মন্ত্রে এবং তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৭ মন্ত্রে বুঝিয়াছি, এবং গীতার ১৭।২৩ শ্লোকে ইহার সুস্পষ্ট উক্তির উল্লেখ করিয়াছি, (পৃষ্ঠা ১৮)। অতএব তত্ত্ব পদের অর্থ ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্মভাব। ইহা হইতে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, যে কোন বস্তুর তত্ত্ব বা মূল, ব্রহ্মে। যতক্ষণ সেই বস্তুর ব্রহ্মভাব—অর্থাৎ ব্রহ্মই সেই বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন—এই ভাব উপলব্ধ না হয়, ততক্ষণ অনুসন্ধানের বিরাম নাই। ব্রহ্মভাব উপলব্ধ হইলেই অনুসন্ধানের

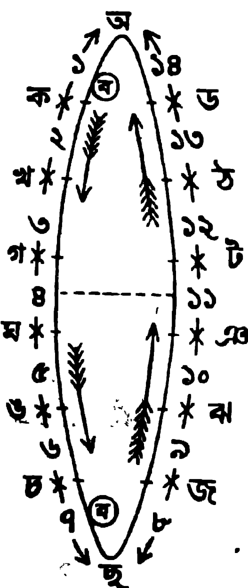
বিরাম—তখন বস্তুর তত্ত্ব বা স্বরূপ আমাদের উপলব্ধিগোচর হইল। তখন আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সৃষ্টিতত্ত্বের, অথবা সৃষ্টিতত্ত্বের কেন—সমুদায় তত্ত্বের, রহস্য উদ্‌ঘাটনের ইহাই মূল কুঞ্চিকা।

সৃষ্টি সংকল্পাত্মিকা—দোলকের দৃষ্টান্ত :—

উপরের ২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১-৩ মন্ত্র হইতে আমরা বুঝিয়াছি, যে সৃষ্টি সংকল্পাত্মিকা। সংকল্প চিত্তের স্পন্দন। চিত্ত যখন স্থির, নিশ্চল থাকে, তখন তাহাতে সংকল্পের অভিব্যক্তি নাই। সংকল্প বা কোনও প্রকার চিন্তা উদিত হইলে চিত্ত স্পন্দিত হয়—ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। স্পন্দনের ক্রিয়া আমরা সাধারণ দোলকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকি। দোলকের দোলন একবার পশ্চাদ্‌গমন—আবার সম্মুখে আগমন, একবার বহির্মুখে গমন—আবার অন্তর্মুখে আগমন, একবার বিকর্ষণের নিদর্শন—পরক্ষণে আকর্ষণের নিদর্শন, একবার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির ক্রীড়া—পরক্ষণে কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তির খেলা—সৃষ্টির অভিব্যক্তি ও তাই। একবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আগমন, আবার ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে গমন, একবার বিশ্বপটের প্রসারণ, আবার উহাঁর সঙ্কোচন। শূন্য-পূর্ণাত্মক, আত্মাশ্রয়, পরমাশ্রয়, আত্মাধার, পরমতত্ত্ব, কেন্দ্রস্থানীয় 'সৎ' স্বরূপ হইতে—পশ্চাৎ বা বহির্মুখ গমনে সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি, সম্মুখ বা অন্তর্মুখ আগমনে সৃষ্টির ক্রম পরিণতি এবং পরিণতির শেষে লয় বা কেন্দ্রস্থানীয় পরমতত্ত্বে বীজরূপে, অব্যক্তভাবে তাদাত্ম্য স্বরূপে অবস্থান। আমাদের গৃহীত দোলকের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব। একটি স্থির কেন্দ্রস্থ দৃঢ়বদ্ধ কীলক হইতে সূক্ষ্ম অথচ শক্ত একগাছি সূত্রে একটি ভারি গোলক বাঁধিয়া লম্বমান করিয়া দিলেই দোলক প্রস্তুত হইল। উহা যখন লম্বমান অবস্থায় স্থির থাকে তখন কেন্দ্রস্থ কীলকের ঠিক নিম্নে ঝুলিতে থাকে। তখন গতির অভিব্যক্তি নাই। ইহাই প্রলয়ের অবস্থা মনে করা যাইতে পারে। তারপর গোলকটি দোলাইয়া দিলে দক্ষিণে ও বামে দুলিতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে স্থির হইয়া যায়। এই স্থির হইবার কারণ (১) পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি (২) বায়ুর সহিত ঘর্ষণজনিত প্রতিরোধ শক্তি এবং (৩) সূত্রগাছির সম্প্রসারণ (Tension) শক্তি প্রভৃতি। যদি এই সমুদায় প্রতিবন্ধক না থাকিত, তাহা হইলে দোলক স্থির না হইয়া অনন্তকাল দোদুল্যমান থাকিত। ভগবানের সংকল্পাত্মক দোলকের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবার কিছু নাই। সুতরাং সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি, ক্রমপরিণতি এবং পরিশেষে লয় পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে প্রবাহরূপে চলিতে থাকে। বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিশ্রান্তি নাই, অনাদিকাল হইতে দোলক দুলিতেছে। একারণ ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বলা হইয়াছে, যে আমাদের শাস্ত্র মতে সৃষ্টি অনাদি। শক্তিমান্ যে শক্তি আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন, তাহাই তাঁহার সংকল্প, তাহাই মায়া নামে কথিত। মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃই হয়, চৈতন্যময়ের সংকল্প সেইরূপ স্বভাবতঃই হয় অথবা তাঁহার ইচ্ছামত হয়, যাহাই বলা হউক উভয়ে বিরোধ নাই।

সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম পরিণতি—চিত্রাকারে প্রদর্শিত :—

উপরে কথিত হইয়াছে, বিকর্ষণী বা কেন্দ্রাপসারিণীশক্তি ও আকর্ষণী বা কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তি পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে কার্য্যশীল হইলে সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম পরিণতি সংঘটিত হয়—ইহা সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী চিত্র প্রদত্ত হইল। উপরে উল্লিখিত দোলকটি পুস্তকের পত্রের উপর লম্বভাবে অবস্থিত একটি কল্পিত তলে যে কোনও কল্পিত বিন্দু হইতে সম্মুখে ও পশ্চাতে দোলাইয়া দিলে, উহা যে পথে গমনাগমন করিবে তাহা এক রেখাতে হইলেও বুঝিবার সুবিধার জন্য চিত্রে একটি দীর্ঘ বৃত্তাভাসাকারে উক্ত পথ দেখান হইয়াছে।



উক্ত চিত্রে 'অ' বিন্দু প্রলয়াবস্থা। এই বিন্দু শূন্যপূর্ণাত্মক ব্রহ্মের কল্পিত অবস্থান স্থান। প্রলয়ে বিশ্ব এবং তদন্তর্গত সমুদায় বীজভাবে ভাবাত্মক শূন্যরূপে—তাদাত্ম্যভাবে ব্রহ্মে লীন ছিল। অব্যক্ত হইতে সৃষ্টির অভিমুখে গমনের ইহা ধ্রুববিন্দু অর্থাৎ গতি আরম্ভের আদিস্থান। বিশ্ব চক্রের গতি উক্ত বিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়া, কখগ…ছজঝ…ঠডঅ পথে পুনরায় 'অ' বিন্দুতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সেখানে সাময়িক বিশ্রান্তি লাভ করে। আবার বিকর্ষণী শক্তির প্রভাবে উক্ত পথে পুনরায় গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন, এইরূপ চলিতে থাকে। ।দিকাল হইতে এইরূপ চলিতেছে। শর-চিহ্নিত রেখা দ্বারা গতিপথ ।চাহ্নত করিয়া দেখান হইয়াছে। চিত্রে উক্ত গতিপথ বৃত্তাভাস রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যে ঐ প্রকার বৃত্তাভাস আকারের, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই পথ অতিক্রম করিতে যে কাল অতীত হয়, তাহার পরিমাণ এক কল্প—ব্রহ্মার এক অহঃ—দেব পরিমাণের ১০০০ চতুর্যুগ—মানব পরিমাণের ৪৩২০০০০০০০ বৎসর। বিশ্বচক্রের উক্ত আবর্ত্তন পথে ১৪টি পর্ব্ব বা স্তর বা সোপান আছে। প্রতি পর্ব্বের নাম মন্বন্তর। এক এক পর্ব্ব এক এক মনুর অধিকার। 'অ' হইতে 'ক' প্রথম মন্বন্তর। 'ক' হইতে 'খ' দ্বিতীয় মন্বন্তর ইত্যাদি। চিত্রে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা মন্বন্তর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মন্বন্তরগণের নাম শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে যথাক্রমে—১ স্বায়ম্ভুব, ২ স্বারোচিষ, ৩ উত্তম, ৪ তামস, ৫ রৈবত, ৬ চাক্ষুষ, ৭ বৈবস্বত, ৮ সাবর্ণি, ৯ দক্ষসাবর্ণি, ১০ ব্রহ্মসাবর্ণি, ১১ ধর্ম্মসাবর্ণি, ১২ রুদ্রসাবর্ণি, ১৩ দেবসাবর্ণি, ১৪ ইন্দ্রসাবর্ণি। বিষ্ণুপুরাণে ১ম

হইতে ১২শ মনু পর্য্যন্ত নামের মিল আছে, কেবল ১৩ মনুর নাম রৌচ্য ও ১৪ মনু ভৌত্য বলিয়া বর্ণিত আছে। অন্যান্য পুরাণে শেষের ছয়টি নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, প্রথম ৮ জন মনুর নামে কোনও প্রকার মতদ্বৈধ নাই।

চিত্রে 'ব' চিহ্নিত ক্ষুদ্র বৃত্তটি বিশ্বচক্রের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত বৃত্তটি চক্রের ন্যায় স্বীয় অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়; একারণ বিশ্বচক্র নামের সার্থকতা। 'অ' বিন্দু হইতে সৃষ্টি চক্রের গতি আরম্ভ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব বা মন্বন্তর অতিক্রম করিয়া, পুনরায় 'অ' বিন্দুতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তবে গতির সাময়িক বিরাম, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিশ্বচক্রের পথ নির্দ্দেশক বৃত্তাভাসের মধ্যস্থলে বিন্দুচিহ্নিত রেখাটির উপরের দিকে অর্থাৎ 'অ' বিন্দুর দিকের অংশটি চৈতন্যপ্রধান, এবং উক্ত রেখাটির নীচের দিকে, অর্থাৎ 'ছ' বিন্দুর দিকের অংশটি জড়প্রধান বুঝিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, যে চিত্রটিতে উপর নীচ মাত্র কল্পিত—প্রকৃত পক্ষে উপর নীচ বর্ত্তমান নাই। 'অ' বিন্দু হইতে ক্রমশঃ বহির্ম্মুখগমনে বিশ্বচক্র যত 'ছ' বিন্দুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তত চৈতন্যের সহিত জড়ের ঘন, ঘনতর ও ঘনতম মিলন। 'ছ' বিন্দুতে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ মিলন। আবার 'ছ' বিন্দু হইতে অন্তর্ম্মুখীন গমনে যত 'অ' বিন্দুর অভিমুখে আসিতে থাকে, তত জড়ের অপ্রাধান্য ও চৈতন্যের প্রাধান্য স্ফুটতর হইতে থাকে—জড় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হইতে হইতে 'অ' বিন্দুতে অতি সূক্ষ্মতম বীজাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। চিত্রে 'অ' হইতে 'ক' পর্ব্ব পর্য্যন্ত অংশে অবস্থিত বিশ্বে—চৈতন্য ও জড়ের যেরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য, 'ড' পর্ব্ব হইতে 'অ' পর্য্যন্ত অংশে অবস্থিত বিশ্বেও চৈতন্য ও জড়ের সেইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য, বর্ত্তমান থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বহির্ম্মুখ গমনের পথে অবস্থিত 'অ-ক' অংশে চৈতন্য-প্রাধান্য থাকিলেও, চৈতন্যের আত্মসংবেদনের অভাব, অন্তর্ম্মুখ গমনের পথে অবস্থিত 'ড-অ' অংশে চৈতন্যের প্রাধান্য সমভাব হইলেও, সেখানে আত্ম সংবেদনের প্রসারতা প্রাপ্তি। পূর্ব্বে ২১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, প্রলয়ে দৃশ্য, জ্ঞেয় প্রভৃতি না থাকায়, পরমতত্ত্বের জ্ঞান অব্যভিচারী থাকিলেও, তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে না, এজন্য তিনি অভাবগ্রস্তের মত অনুভব করেন। যতই 'অ' হইতে 'ছ' এর দিকে অগ্রগমন, ততই সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইতে থাকে, জড়ের সহিত চৈতন্যের আদান প্রদান স্ফুটতর হইতে থাকে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভেদ ও অভিব্যক্তি, তাহাদের শক্তির আত্মকেন্দ্রীয় বিকাশ, তাহাদিগের দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির উপভোগ, তজ্জাত প্রপঞ্চ বিশ্বের জ্ঞানলাভ, ব্যক্তিত্বের স্ফুটতম অভিব্যক্তি, বিশ্বের ও বিশ্বস্থ পদার্থনিচয়ের উপলব্ধি ক্রমশঃ গভীর, নিবিড়তর ও ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। 'ছ' বিন্দুতে অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা। জড় চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সমাবেশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। চৈতন্যের জড়-উপভোগ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জড় সাহায্যে 'আত্ম-সংবেদন' লাভ পূর্ণ হয়।

উক্ত 'আত্ম-সংবেদন' জড় ব্যতিরেকে, যাহাতে চৈতন্যে বিদ্যমান থাকিতে পারে, সেজন্য 'ছ' হইতে অন্তর্মুখীন গমনে 'ছ জ ঝ ট ঠ ড অ' পথে ক্রমশঃ চৈতন্যের প্রাধান্য ও জড়ের অপ্রাধান্য ব্যবস্থা। চৈতন্য হইতে জড়ের বিচ্ছেদ ক্রমশঃ ক্রমশঃ সংঘটিত। এই ব্যবস্থায়, চৈতন্য স্বাভাবিক ভাবে সহজে 'আত্ম-সংবেদন' নিজস্ব করিতে পারে, ইহাই উদ্দেশ্য। ভাগ্যবান জীব, যদি এই বিশ্বশক্তির সহিত নিজের শক্তি মিলাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখীন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, অন্তর্ম্মুখে যে মহাশক্তির স্পন্দনে বাহ্য রূপ-রস প্রভৃতি অভিব্যক্ত হইয়া বিষয়রূপে প্রতিভাত—সেই মূল শক্তিতে নিয়োগ করিয়া, সার্থকতা লাভ করিতে পারে। জীবত্বের সহিত পরমতত্ত্বের সংমিলন সংঘটিত করিয়া, পরমা শান্তিলাভ করিতে পারে, তাহাকে আর নূতন সৃষ্টি প্রবাহে উত্থিত পতিত হইতে হয় না, ইহার শাস্ত্রীয় নাম 'মুক্তি'। যাহা হউক, ইহা সাধন বা উপাসনা তত্ত্বের কথা। প্রসঙ্গক্রমে এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করা হইল। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি যুগ চলিতেছে। সুতরাং বিশ্বচক্রের অবস্থান স্থান, চিত্রে 'ছ' বিন্দুর অতি নিকট—উহা 'ব' চিহ্নিত বৃত্ত দ্বারা চিত্রে দেখান হইয়াছে। মূলগ্রন্থে ৩।৩।৪২ সূত্রে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, বর্ত্তমান কাল, বিশ্বের এবং বিশ্বস্থ প্রত্যেক জীবের জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে প্রত্যেক মনুষ্য নামধারী জীবের কর্ত্তব্য এই যে, প্রত্যেকে আপন আপন শক্তি বিশ্বের বিপুল শক্তির সহিত মিলাইয়া যাহাতে সৃষ্টি প্রবাহের উত্থান পতন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা এবং তজ্জন্য মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করা। এই সার্থকতা লাভের সহায়তা প্রদানের জন্য, ভগবানের সমগ্র শক্তি প্রকটন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা ৩।৩।৪২ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রলয় চারি প্রকার:—(১) দৈনন্দিন প্রলয়, (২) প্রাকৃতিক প্রলয়, (৩) নিত্য-প্রলয়, (৪) আত্যন্তিক প্রলয়:—

আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়ায়, চিত্রে প্রদর্শিত বিশ্বচক্রের 'ছ' হইতে 'অ' এ আগমনের পর, যে বিশ্রান্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, উক্ত বিশ্রান্তির নাম প্রলয়। এই প্রলয় ব্রহ্মার প্রতিদিনের অন্তে সংঘটিত হয় বলিয়া শাস্ত্রে ইহার নাম "দৈনন্দিন" প্রলয়। দিনের পর রাত্রি যেমন অবশ্যম্ভাবী; দিনের বোধের নিমিত্ত রাত্রির প্রয়োজন এবং রাত্রির ধারণার নিমিত্ত দিনের প্রয়োজন; কাল নিমিত্ত বলিয়া, এই প্রলয়ের অপর নাম "নৈমিত্তিক" প্রলয়। এই প্রলয়ে ব্রহ্মা, তাঁহার সৃষ্ট বিশ্ব আত্মসাৎ করিয়া, নারায়ণের সহিত অনন্ত শয়নে শয়ন করিয়া থাকেন, আবার ব্রহ্মরাত্রির অবসানে জাগরিত হইয়া পুনরায় বিশ্বসৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই "দৈনন্দিন" প্রলয়ের পরিমাণ

কালও ব্রহ্মার অহঃ পরিমাণ কাল অর্থাৎ এক কল্প। তবে তখন কাল পরিমাপক বা তাহার নির্দ্দেশক কিছু বর্ত্তমান থাকে না, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সৃষ্টির সহিত 'কাল' ঘনিষ্ঠভাবে সংজড়িত। উহা সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত ব্যাপার-পরম্পরার পৌর্ব্বাপর্য্য জ্ঞাপক মাত্র। সুতরাং সৃষ্টির অনভিব্যক্তিতে কাল ও অনভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। তবে যিনি কালের অতীত, তাঁহার জ্ঞানে উক্ত "দৈনন্দিন" প্রলয়ের পরিমাণ কত, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। জাগতিক দিন রাত্রির নিদর্শনে, উহা সাধারণতঃ ব্রহ্মার অহঃ পরিমাণের সমান ধরা হয় মাত্র। যাহা হউক, ব্রহ্মার উক্ত অহোরাত্র পরিমাণের ৩০ অহোরাত্রে ব্রহ্মার একমাস, উহার ১২ মাসে ব্রহ্মার এক বৎসর এবং উক্ত বৎসরের ১০০ বৎসর এবং কোনও কোনও পুরাণমতে ১০৮ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার পরমায়ু পরিমাণ কালের নাম এক মহাকল্প। এই পরিমাণ কাল, দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয়, ব্রহ্মার দিনের পর দিন সংঘটিত হয় এবং জীব যদি সাধন প্রভাবে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তবে তাহার জীবন প্রবাহে উত্থান-পতন, সংসারে জন্ম মৃত্যু চলিতে থাকে। ব্রহ্মার পরমায়ু অন্তে মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়, তাহাতে মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্ররূপ এই সপ্ত প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হয়, এবং সপ্ত প্রকৃতির সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়। এ কারণ ইহার নাম "প্রাকৃতিক" প্রলয়। "দৈনন্দিন" প্রলয়ে, প্রকৃতি বিলয় হয় না এবং ব্রহ্মারও নাশ হয় না, সুতরাং উক্ত প্রলয়ের অন্তে, ব্রহ্মাই প্রকৃতিগত উপাদান হইতে বিশ্বসৃষ্টি করেন, কিন্তু "প্রাকৃতিক" প্রলয়ে ব্রহ্মার মৃত্যু হয়, প্রকৃতি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ভগবানকে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এই সপ্ত প্রকৃতি পুনরায় সৃজন করিতে হয়। উক্ত দুই প্রকার প্রলয় ব্যতীত, আরও দুই প্রকার প্রলয় আছে—নিত্য প্রলয় ও আত্যন্তিক প্রলয়। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেকে, প্রতিক্ষণে কাল প্রভাবে যে পরিণাম সংঘটিত হইতেছে এবং তজ্জন্য অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিতেছে, তাহার নাম "নিত্যপ্রলয়"। আমার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি এ মুহূর্ত্তে যে অবস্থায় আছে, ইহার অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তে, তাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ অনুভূত—ইহাই নিত্য-প্রলয়। আর যে কালে গ্রাহক বুদ্ধি, করণ ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্য বিষয়ের পৃথক ব্যবহার না থাকে, কেবল তত্তদাশ্রয় জ্ঞান মাত্র থাকে—নির্ব্বিশেষ অদ্বয় জ্ঞান মাত্র প্রকাশ পায়, তাহাই আত্যন্তিক প্রলয় বা মুক্তি। ইহা প্রতি জীবের নিজস্ব। ইহা দৈনন্দিন সৃষ্টি-অভিব্যক্তির অন্তরালে ভাগ্যবান জীবের অধিগম্য।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূলে একই—মহাশক্তি :—

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় একই শক্তির ক্রিয়া। যে শক্তি বিশ্বের ও তদন্তর্গত বস্তু ও জীবজাতের অভিব্যক্তির মূলে, সেই একই শক্তি তাহাদের স্থিতির ও মূলে, এবং তাহাই ক্রম-পরিণাম সংঘটন করিয়া, উহাদের শেষ পরিণাম বা লয়ে, নূতন বিশ্বের, নূতন বস্তু ও জীবজাতের উৎপত্তির কারণ।

এই শক্তি শ্রীভগবানের সংকল্প। সমষ্টিভাব পরিত্যাগ করিয়া, যদি আমরা ব্যষ্টিভাবে অবলোকন করি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, সংসারে যে জন্ম, স্থিতি বা জীবন ও মৃত্যু দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা শ্রীভগবানের সংকল্প বশতঃই হইয়া থাকে। ইহা একেরই অবস্থাভেদ মাত্র। একই শক্তির বিভিন্ন পরিদৃশ্যমান ক্রিয়া। একই নিয়মে তিনই পরিচালিত। জন্মের পর ক্রম পরিণামে যেমন বাল্য, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়—মৃত্যুও সেইরূপ ক্রমাভিব্যক্তির ফল। ইহা মনে রাখিলে, প্রিয়-জনের জন্ম হইবার পর, বাল্য-কৈশোরের ভিতর দিয়া যৌবন প্রাপ্তি হইলে, যেরূপ দুঃখ করিবার কিছু থাকে না, সেইরূপ মৃত্যুতেও দুঃখ বা শোক করিবার কোনও কারণ নাই। ক্রমপরিণামে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কোনও বৃক্ষে অঙ্কুর হইতে একটি ফল উপজাত হইলে, তাহা যদি ঝটিকাদি কোনও আগন্তুক কারণে বৃক্ষ হইতে অকালে বিচ্যুত না হয়, তাহা হইলে ক্রমপরিণামের ফলে তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুপক্ক হইয়া বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হইবেই হইবে। এই আগন্তুক কারণ নিবারণের উপায় আবিষ্কার করণেই মানবের কৃতিত্ব। মানবজীবনেও এই একই নিয়ম। রোগাদি আগন্তুক কারণে অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এই অকালমৃত্যু নিবারণের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উপযোগিতা। যদি উহা নিবারণ করা যায়, তবে মানব, পরিণত বয়স লাভ করিয়া, জীবন পথের শেষ সীমা অতিক্রম করতঃ, মৃত্যুবরণ করিতে পারে, এ মৃত্যুতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কারণ ইহা অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য নিয়মের ফল।

দৈনন্দিন কার্য্যে প্রাণশক্তির অল্লাধিক ব্যয়—আংশিক মৃত্যু।

যদি আমরা আমাদিগের প্রতিদিনের জীবন যাত্রা প্রণালী পর্য্যালোচনা করি, আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদিগের সামান্য একটি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, আমাদিগের প্রাণশক্তির অল্লাধিক ব্যয়ের প্রয়োজন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দ—ইহাদের মধ্যে যখন যাহাকে ইন্দ্রিয় সাহায্যে উপভোগ করি, তখন উক্ত উপভোগে প্রাণশক্তি নিয়োগ না করিলে, উহাদের উপভোগ প্রাণে দাগ অঙ্কিত করে না; সুতরাং উক্ত উপভোগে প্রাণশক্তির কিছু না কিছু ব্যয় হইয়া থাকে। প্রাণশক্তি ব্যয়—অন্য কথায় মৃত্যু। অল্প প্রাণশক্তি ব্যয়ে—আংশিক মরণ, সম্পূর্ণ ব্যয়ে—মৃত্যু। প্রতিদিন বিপলে বিপলে, আমাদের প্রাণশক্তির অল্লাধিক ব্যয়ের জন্য আমরা অংশতঃ মরিতেছি—ইহা ধ্রুব সত্য। কোনও কার্য্য সম্পাদন করিবার পর—দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, কোনও পুস্তক পাঠ, কোনও বিষয় চিন্তা, কোনও বিষয় গবেষণা, কোনও বিষয়ে বিচার প্রভৃতি করিবার পর, আমরা যে অল্পবিস্তর ক্লান্তি অনুভব করি এবং ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিশ্রাম ও আহারাদি গ্রহণ করি—ইহারাই উক্ত আংশিক মরণের সাক্ষ্য প্রদান করে। মরণ—আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। জীবনের সহিত উহা ওতপ্রোতভাবে মিলিত এবং পরস্পর অপরিহার্য্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। উপরে যে

নিত্য প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই কারণেই সংঘটিত হয়। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় এই নিয়মে পরিচালিত। প্রাচীন ঋষিগণ ইহা বিশেষরূপে জানিতেন, একারণ তাঁহারা মরণকে ভয় করিতেন না। "মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়" মন্ত্রাংশে মৃত্যু, এই সাধারণ মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা অমৃতত্বের বিপরীত। ইহা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পরমতত্ত্ব হইতে পৃথক্ জ্ঞান, ঋষি উক্ত পৃথক্ জ্ঞান হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিয়াছেন। যাহা হউক প্রসঙ্গক্রমে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক।

সৃষ্টির অভিব্যক্তি নূতন কিছু নহে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি :—

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা গেল যে সৃষ্টি—সংকল্পাত্মিকা। সূত্রকার ভগবান বাদরায়ণ "তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ" ২।৩।১৪ সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন তিনি "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২), "সত্যকামঃ, সত্যসংকল্পঃ" (ছান্দোগ্য ৮।৭।১)—সুতরাং তাঁহার যাহা সংকল্প, তাহা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে—তাঁহার সংকল্প সিদ্ধির অন্তরায় কিছুই নাই। দোলকের দৃষ্টান্তে আমরা বুঝিয়াছি, যে দোলক একপথেই গমনাগমন করিতে থাকে। একবার সাম্যাবস্থা হইতে বহির্ম্মুখে গমন, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, আবার বহির্ম্মুখে গমন, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন—এই প্রকার চলিতে থাকে। উক্ত গমনাগমনের প্রতিবন্ধকতাচরণ কারবার কিছুই না থাকায়, ঐ গমনাগমন অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। এজন্য সৃষ্টির অভিব্যক্তিতে নূতন কিছুই হয় না। যেমন পূর্ব্বে ছিল, সেইরূপই পরে অভিব্যক্ত হয়। একারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (ঋগ্বেদ ৮।৮।৪৮)—এই মন্ত্রাংশ ১।১।২ সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত তিনটি শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্ব সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—

> গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
> পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াঽসৃজৎ॥ ভাগ : ৩।১০।১১
> বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
> ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥ ভাগ : ৩।১০।১২
> যথেদানীং তথাচাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্। ভাগ : ৩।১০।১৩

—গুণ সকলের মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণাম যাহা দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং উক্ত পরিণাম যাহাকে ব্যক্ত করে, তাহাই কাল, এই কাল স্বতঃ নির্ব্বিশেষ এবং অপর্য্যবসিত। পরম পুরুষ এই কালকে নিমিত্ত করিয়া আপনাকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে সৃজন করেন। এই বিশ্ব, ভগবান বিষ্ণুর মায়াতে সংহৃত হইয়া, ব্রহ্মতন্মাত্র হইয়াছিল, পরে পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া, তাহাই পুনর্ব্বার-

পৃথক্ পৃথক্‌রূপে সৃজন করিয়াছেন। এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার, পূর্ব্বেও সেই প্রকারই ছিল এবং পরে ইহার সদৃশই হইবে।

উপরের আলোচনায় আমরা যাহা পাইয়াছি, ভাগবত উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ে তাহাই প্রকাশ করিলেন।

সৃষ্টি মিথ্যা বা ভ্রান্তি নহে :—

মৎকৃত "গায়ত্রী রহস্য" নামক পুস্তিকায় ব্যাহৃতি তত্ত্বের আলোচনায় আমরা বিস্তারিত ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি—কি প্রকারে স্পন্দনাত্মক সংকল্প হইতে ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোক ও তত্তৎ লোকস্থ বস্তু জাতের সৃষ্টি হইয়াছে, এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। অনুসন্ধিৎসুগণ উহা যথাস্থানে দেখিয়া লইতে পারিবেন। পুনরুল্লেখ হইলেও, এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি, যে সৃষ্টি—মিথ্যা বা ভ্রান্তি নহে। দোলকের দৃষ্টান্তে আমরা বুঝিয়াছি, যে দোলক প্রবাহরূপে গমনাগমন করিয়া থাকে, কোথাও স্থির নয়। এ কারণ সংস্কৃত ভাষায় বিশ্বের নাম জগৎ (গম ধাতু ক্বিপ্)—চিরগতিশীল—চিরপরিবর্ত্তনশীল; ইহার অপর নাম সংসার (সম্+সৃ+অ—সম্যক্ সরতি গচ্ছতি) অনবরত গমনশীল—ইহাই বিশ্বের বিশেষত্ব। নিত্য, স্থির, সৎ বস্তুর তুলনায়, ইহা চিরচঞ্চল, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, অতি অল্পক্ষণ একভাবে স্থায়ী নহে—একারণ নশ্বর। চিরস্থির, নিত্য, সত্য হইতে এই চির পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর কিন্তু প্রবাহরূপে "অব্যয়" (গীতা ১৫।১) জগতের অভিব্যক্তি, সেই নিত্য সত্যবস্তুর সংকল্পাত্মিকা শক্তি প্রভাবে। নশ্বরত্ব হেতু জগৎকে এবং জাগতিক বস্তুজাতকে 'অসৎ' বলা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ আমরা বুঝিলাম—মিথ্যা নহে, পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর। প্রারম্ভে উদ্ধৃত "অসতো মা সদ্গময়" এই মন্ত্রাংশের 'অসৎ' শব্দের অর্থ পাইলাম। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন যে হে ইষ্ট! আমাকে এ চিরপরিবর্ত্তনশীল স্রোতের উপর ফেলিয়া রাখিওনা—এক নিত্য, স্থির বস্তুর উপর স্থাপন করিয়া আমার চাঞ্চল্য, জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে সঞ্চরণ, উত্থান-পতন সাঙ্গ করিয়া দাও।

'সৃষ্টি পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ :—

"সৃষ্টি" পদ সৃজ ধাতু+তি হইতে নিষ্পন্না। "সৃজ" ধাতুর অর্থ নিঃক্ষেপ—ইংরাজিতে Projection—যাহা অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, তাহার বহিঃ প্রকাশ। বিশ্বসৃষ্টির নিদর্শন স্বরূপ উর্ণনাভির জাল রচনা উদাহৃত হইয়া থাকে। মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন :—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ ... ...
... ...তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্। মুণ্ডক ১।১।৭

শ্রীমদ্ভাগবত ইহার অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :—

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ॥ ভাগ : ১১৷৯৷২১

—যেমন মাকড়সা তাহার হৃদয়স্থ লালা, মুখ হইতে বাহির করিয়া, তদ্বারা জাল রচনা করিয়া, তাহাতে বিহার করত, ক্রীড়া সাঙ্গ হইলে পুনরায় উহা গ্রাস করিয়া অন্তরে নীত করে, শ্রীভগবানও সেইরূপ নিজ হৃদয়স্থ সংকল্প, বাহিরে পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে প্রকটিত করিয়া, তাহাতে লীলা করিয়া থাকেন, আবার লীলা সাঙ্গ হইলে পুনরায় গ্রাস করিয়া নিজের হৃদয়স্থ করেন।
ভাগ : ১১৷৯৷২১

২৷১৷২৩ সূত্রে বালিকার পুতুল খেলার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে আর তাহার বিস্তারের প্রয়োজন নাই। একজন কবির কাব্য প্রণয়নও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কাব্য প্রণয়নের পূর্ব্বে উহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব ছিল না। কবির অন্তরে তাদাত্ম্যভাবে লীন ছিল। কবি তাঁহার অন্তর হইতে উহা বাহিরে কাব্যাকারে অভিব্যক্ত করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করেন, এবং পাঠকগণের আনন্দদানের কারণ হন! ভগবানের বিশ্ব সৃষ্টিও তদ্রূপ। প্রলয়ে বিশ্ব ও বিশ্বস্থ যা কিছু সমুদায় তাঁহাতে তাদাত্ম্যভাবে লীন ছিল। উহার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। ভগবান সংকল্প দ্বারা উহা বাহিরে অভিব্যক্ত করিলেন—যাহা অন্তরে ছিল, তাহার বহিঃপ্রকাশ করিলেন। এই সমুদায় দৃষ্টান্ত বিচার করিবার সময় সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাকড়সা ও তাহার লালা পরস্পর বিভিন্ন, বালিকা তাহার পুতুল হইতে পৃথক্, কাব্য কবির অন্তরের ভাব সকলের বহিশ্চিত্র হইলেও, উহা কবি হইতে পৃথক্। কিন্তু ব্রহ্মে বা ভগবানে সজাতীয়—বিজাতীয়—স্বগত ভেদ নাই, তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, তিনি যদিও অসঙ্গ বলিয়া সমুদায় হইতে পৃথক্, কিন্তু সমুদায় তাঁহা হইতে অপৃথক্। তিনি চৈতন্যময়, তাঁহা হইতে জড়সৃষ্টি কি প্রকারে হয়? চৈতন্য ও জড় কি পরস্পর অপৃথক্ বলিতে হইবে? এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা মায়াতত্ত্ব আলোচনায় পাইবার চেষ্টা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মায়াতত্ত্ব

মায়ার প্রয়োজনীয়তা ঃ—

চৈতন্য হইতে দৃশ্যমান জড়োৎপত্তি, এই অপৃথকে পৃথক্ ভাব, এই আপাতঃ বিরোধী বিভেদ, কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহার সঙ্গতির জন্য মায়ার প্রয়োজনীয়তা। মায়ার অর্থ মিথ্যা কিছু নহে। কপটতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রভৃতির স্থান ইহাতে নাই। মায়া ভগবানের বা ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টির সংকল্পাত্মিকা, অচিন্ত্যা শক্তি। এই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বা এই শক্তির অভিব্যক্তি করিয়া ব্রহ্ম বা ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। গায়কের গান গাহিবার শক্তি-উদ্বোধনের ন্যায় অথবা কবির কাব্য প্রণয়ন শক্তি-অভিব্যক্তির ন্যায়, ইচ্ছানুসারেই ইহা সংঘটিত হয়। মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তিকায় ওঁকার তত্ত্বের আলোচনায় মায়া সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষভাবে করা হইয়াছে। উহার পুনরুল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। এই প্রবন্ধটি স্বসম্পূর্ণ (self contained) করিবার জন্য সংক্ষেপ আলোচনা কর্ত্তব্য মনে করি।

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি মায়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৪.৫)

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য 'অজা' পদের অর্থ ছাগী করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের অর্থ গৌরব রক্ষিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। 'অজা' পদের অর্থ 'জন্মরহিতা'। রূপকে ইহা ছাগী অর্থ লক্ষ্য করিলেও, ইহার বুৎপত্তিলভ্য মুখ্য অর্থ পরিত্যজ্য নহে। 'অজা' পদের ব্যবহারে শ্রুতি প্রকাশ করিলেন, যে মায়ার উৎপত্তি নাই। অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। ব্রহ্ম বা ভগবান ও অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন এবং তিনি সমুদায়ের জন্ম-স্থিতি-লয়ের কারণ—ইহা আমরা বুঝিয়াছি। মায়াকে 'অজা' বলিয়া উল্লেখ করায় প্রশ্ন উঠে, যে তাঁহার যখন জন্ম নাই, তখন কি তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ তত্ত্ব? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতে উল্লিখিত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া পড়ে। মুণ্ডক

শ্রুতির উপক্রমে (মুণ্ডক ১।১।৩) ও ছান্দোগ্য শ্রুতির শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে (ছান্দোগ্য ৬।১।৩) ইহা স্পষ্টভাবে কথিত আছে। সুতরাং ইহাদের সমন্বয় সাধনের জন্য সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, যে 'অজা' ব্রহ্মশক্তি। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার শারীরক ভাষ্যে ১।৪।৯ সূত্রের আলোচনায় বলিতেছেন :—

"প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবশক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থা।"

"প্রকরণ অনুসারেও স্থির হয—জানা যায়—যাহা অব্যাকৃতনামরূপা বীজশক্তি, যাহা ব্যক্ত জগতের পূর্ব্বাবস্থা, যাহা আত্মদেবতার (পরমেশ্বরের) সৃষ্টিশক্তি—তাহাই অজা মন্ত্রের অজা।" সুতরাং 'অজা' যে ব্রহ্মশক্তি তাহা শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করেন। একারণ "ছাগী" অর্থ শঙ্করাচার্য্য সম্মত নহে, ইহা সুস্পষ্ট। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ভাষ্য শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রসিদ্ধ হইলেও উহা তাঁহার কৃত নহে বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস।

মায়া যা, প্রকৃতিও তাই :—

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৪।১০ মন্ত্রে 'মায়া'কে 'প্রকৃতি' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ"। গীতা ৯।৮। "আমি আমার স্বকীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া বারংবার সৃষ্টি করিয়া থাকি।"

স্বকীয় প্রকৃতি-অর্থে নিজশক্তিরূপা প্রকৃতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সুস্পষ্ট উক্তি আমরা নিরালম্বোপনিষৎ হইতে পাই—শ্রুতি স্পষ্ট বলিতেছেন :— "প্রকৃতিরিতি চ ব্রহ্মণঃ সকাশান্নানা-বিচিত্র-জগন্নির্ম্মাণ-সমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মণঃ শক্তিরেব প্রকৃতিঃ।" প্রকৃতি ব্রহ্মের নিকট হইতে নানা বিচিত্র জগন্নির্ম্মাণ সমর্থ বুদ্ধিরূপ ব্রহ্মেরই শক্তি। উক্ত শ্রুতি পরে স্পষ্ট বলিতেছেন—যে ব্রহ্মই স্বশক্তি প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, সমুদায় লোক সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবেশ করতঃ অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মা প্রভৃতির বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া 'ঈশ্বর' নামে কথিত হন। ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট পাইলাম, যে মায়া মিথ্যা কিছু নহে। ইহা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের বুদ্ধিরূপা শক্তি। সুতরাং অজ্ঞান প্রসূত মিথ্যা প্রহেলিকা নহে। ইহার প্রতি ব্যাপারে গভীর উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। দৃশ্যতঃ অচেতন জড়দ্রব্যের অভ্যন্তরে চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট আছেন। যদিও অনভিব্যক্ত তথাপি দৃশ্যতঃ অচেতন প্রাণহীন জড়ের অণু-পরমাণুতে প্রাণ-প্রবাহ প্রবহমান।

মায়া—সতী নহে, অসতী নহে, সদসতীও নহে :—

জগৎ-সৃষ্টি-সমর্থা এই শক্তি, প্রলয়ে ব্রহ্মে বা ভগবানে তাদাত্ম্যভাবে লীন ছিল—অভিব্যক্তি ছিল না—জগৎ সৃষ্টির জন্য ইহা তিনি অভিব্যক্ত করিলেন। যখন ইহা

লীন ছিল, তখন ইহা ছিল বলা যায় না, আবার ছিল না বলা যায় না—কেননা যদি না থাকিবে, তবে ইহার অভিব্যক্তি কি প্রকারে হইবে, এবং উক্ত অভিব্যক্তিতে সৃষ্টিই বা কি প্রকারে হইবে? একারণ সর্ব্বসারোপনিষৎ ইহাকে 'ন সতী নাসতী ন সদসতী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহোপনিষদ্ ২।৬৭ মন্ত্রে ব্রহ্মকে "ন সৎ নাসৎ ন সদসৎ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মায়া তাঁহার শক্তি, অতএব তাঁহাকে "ন সতী নাসতী ন সদসতী" বলিয়া উল্লেখ সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ভাষায় ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যম-লক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্" (মাণ্ডুক্য ৭) বলিয়াছেন, তাঁহার শক্তিরূপা মায়া "প্রমাণা-প্রমাণ সাধারণা ন সতী নাসতী ন সদসতী স্বয়মবিকারাদ্বিকারহেতৌ নিরূপ্যমাণে অসতী অনিরূপ্যমাণে সতী লক্ষণশূন্যা" (সর্ব্বসারোপনিষৎ) বলিয়া যে শ্রুতি তাঁহাকে নির্দ্দেশযোগ্যা নহেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গতই হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে মায়ার সংজ্ঞা :—

শ্রীমদ্ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বিশ্ব প্রপঞ্চের দিক হইতে মায়ার নির্দ্দেশ অতি সুন্দররূপে করিয়াছেন :—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥ ভাগ : ২।৯।৩৩

এই শ্লোক এবং ইহার অর্থ মূলগ্রন্থে ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য সংক্ষেপ আলোচনা বাধ্য হইয়া করিতে হইল। শ্লোকে "মায়া" নাম ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে "যৎ" ও "তৎ" পদদ্বয় দ্বারা উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ শ্রীধরস্বামী "যৎ" পদের অর্থ করিয়াছেন—"যতঃ কিমপ্যনিরুক্তম্" যে হেতু এমন কিছু, যাহা ভাষায় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। সর্ব্বসারোপনিষদ্ একারণে মায়াকে "লক্ষণশূন্যা" বলিয়াছেন। "যৎ" ও "তৎ" পদদ্বয় ব্যবহার করিয়া ভাগবতকার বুঝাইলেন, যে মায়ার স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ অসম্ভব। এ কারণ তিনি অন্য প্রকারে ইহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্লোকে "আত্মনি" ও "আত্মনঃ" এই দুইটি পদ আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে শ্লোকটি ভগবানের উক্তি। সুতরাং "আত্মনি" ও "আত্মনঃ" পদদ্বয় দ্বারা ভগবান্ আপনাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্ শ্রীধরস্বামী "আত্মনি" পদের অর্থ "আত্মন্যধিষ্ঠানে" করিয়াছেন—অর্থাৎ ভগবানের অধিষ্ঠানে বা আশ্রয়ে যাহা সত্তাবান ও ক্রিয়াশীল—তাঁহার আশ্রয় না পাইলে, যাহার সত্তাও নাই ক্রিয়াও নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম, যে ভগবানের সহিত মায়ার নিত্য সম্বন্ধ, মায়ার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং মায়া মিথ্যা নহে; অন্য কথায় বিশ্ব ও বিশ্বস্থ যাহা কিছু যেমন ভগবানের সত্তায় সত্তাবান ও ক্রিয়াশীল, মায়াও সেই প্রকার। সুতরাং

বিশ্ব ও বিশ্বস্থ যা কিছু স্বরূপত: যাহা, মায়াও স্বরূপতঃ তাহাই—অর্থাৎ বিশ্ব ও মায়া অভিন্ন। ভগবানের সহিত মায়ার নিত্য সম্বন্ধ হইলেও, ভগবান্ মায়াতীত। তিনি মায়াধীশ হইয়া অর্থাৎ মায়াকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহাকে নিজের অধীনে রাখিয়া বিশ্ব প্রকটিত করেন। মায়া আশ্রয় করিয়া উহার পালন করেন এবং মায়া আশ্রয় করিয়া উহার লয় সাধন করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মায়া তাঁহার সংকল্পাত্মিকা শক্তি—ইহা আগন্তুক কিছু নহে—ইহা তাঁহার নিজশক্তি—ইহা বুঝাইবার জন্য শ্লোকে "আত্মনঃ" পদের প্রয়োগ আছে। এই "আত্মনঃ" পদ দ্বারা ভগবান্ বুঝাইতেছেন, ইহা তাঁহার স্বকীয়া শক্তি। গীতাতেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" গীতা ৭।১৪

এই শ্লোকে "মম" ও "দৈবী" পদ দ্বারা—মায়া তাঁহার স্বকীয়া দৈবী—দ্যোতনশীলা—প্রকাশশীলা বা অভিব্যক্তি কারিণী শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপরে উদ্ধৃত ৪।১০ মন্ত্রে মহেশ্বরকে "মায়ী" বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ মায়া—শক্তি এবং মহেশ্বর সেই শক্তিতে শক্তিমান্। সুতরাং বুঝা গেল যে মায়া—ভগবানের শক্তি—ভগবানের আশ্রয়ে ইহা কার্য্যশীলা, ইহাকে ভাষা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, এ কারণ ইহা লক্ষণশূন্যা—এই শক্তি ভগবানে অপ্রকট অবস্থায় থাকে, বিশ্বসৃষ্টির জন্য ভগবান্ এই শক্তিকে প্রকটন করেন। এখন শ্লোকটির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

জ্যোতিঃর সহিত আভাসের নিত্য সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাহার আভাস বা দীপ্তি উষাকাশের বর্ণসম্ভার প্রকটিত করে, আবার সূর্য্য অস্ত যাইবার পরও আভাস, প্রদোষ গগনে মায়াপুরী নির্ম্মাণ করে—ইহা প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। জ্যোতির্বিম্ব সূর্য্যের সত্তায় ইহার সত্তা, জ্যোতিঃ না থাকিলে ইহার প্রতীতিও থাকে না। সূর্য্য সম্বন্ধে তাহার আভাসের যে সম্বন্ধ, অন্য যে কোনও জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের, যে কোনও দীপের, যে কোনও আলোকের সহিত তাহাদের স্ব স্ব আভাসেরও সেই সম্বন্ধ, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিলাম। আবার "তমঃ"র দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। জ্যোতিঃর সহিত ইহারও নিত্য সম্বন্ধ। কিন্তু এ সম্বন্ধ আভাসের সহিত সম্বন্ধের অনুরূপ নহে। তমঃ জ্যোতিঃর অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয়, যেখানে জ্যোতিঃ বর্ত্তমান, সেখানে তমঃ বর্ত্তমান থাকে না, তাহার বিপরীত দিকেই বর্ত্তমান থাকে। অথচ জ্যোতিঃর প্রতীতির উপর ইহার প্রতীতি নির্ভর করে—জ্যোতিঃর প্রতীতি আমাদের আছে বলিয়াই, আমরা তমঃ কি তাহা বুঝিতে পারি। যদি জ্যোতিঃ বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তমঃর প্রতীতি থাকিত না। গভীর সমুদ্রের তলদেশে যে সমস্ত জীব বর্ত্তমান আছে, তাহাদের চক্ষুঃ বর্ত্তমান নাই, তাহাদের নিকট তমঃর প্রতীতি নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। তাহারা স্পর্শশক্তি সাহায্যে তাহাদের পারিপার্শ্বিক ব্যাপার সমুদায় অনুভব করে।

জ্যোতিরাত্মা চক্ষুঃ আমাদের বর্ত্তমান আছে বলিয়া এবং আমাদের জ্যোতিঃর প্রতীতি বর্ত্তমান আছে বলিয়া, আমাদের তমঃর প্রতীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেইরূপ অর্থ বা পরমার্থ স্বরূপ যে ভগবত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব—তাহার বাহিরে যাহার প্রতীতি হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব স্ফুরণ হইলে আর যাহার প্রতীতি হয় না, যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই, ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতীতির উপর যাহার প্রতীতি নির্ভর করে, ব্রহ্মতত্ত্বের আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার অস্তিত্বই নাই, যাহা ব্রহ্মতত্ত্বের আশ্রয়ে অস্তিত্ব লাভ করিয়া, আভাসের ন্যায় এই প্রপঞ্চ জগৎ বিস্তার করিয়া, সত্যবৎ প্রকাশমান করিতেছে এবং তমঃর ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকেই মায়া বলিয়া জানিও।

শ্লোকে "আভাস" ও "তমঃ" এই দুইটি পদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের লক্ষ্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরে, আকাশে বর্ণ রঞ্জনা, স্বপ্নজগতের অপার্থিব সৌন্দর্য্যভূষিত পর্ব্বত, নদী, নগর, গৃহ, জীবাদির চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহাদের বাস্তব বর্ত্তমানতা নাই। সূর্যের আভাস ইহা সৃষ্টি করে। ইহা মায়ার "বিক্ষেপিকা" শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। "তমঃ"—অন্ধকার। সন্ধ্যার কিছু পরে সূর্য্যের আভাস তিরোহিত হইলে, "তমঃ" আসিয়া জগৎ অধিকার করে এবং বিদ্যমান বস্তুজাত, যাহা এতক্ষণ প্রতীত হইতেছিল, তাহা অন্ধকারে আবৃত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে স্থাপন করে; এবং সম্ভাব্যমান চোর, বৃশ্চিক, সর্প, ব্যাঘ্রাদির বর্ত্তমানতার আশঙ্কা উৎপাদন করে। ইহা মায়ার "আবরিকা" শক্তির পরিচায়ক। সুতরাং শ্লোকে ব্যবহৃত "আভাস" ও "তমঃ"র দ্বারা মায়ার "আবরিকা" ও "বিক্ষেপিকা" শক্তির অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা ভাগবতকারের উদ্দেশ্য। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে মায়ার এই উভয় শক্তি অবিদ্যা সম্পর্কে দেখান হইয়াছে। এই আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তির দ্বারা জগৎ বৈচিত্র্য সংঘটিত। এই উভয় শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মায়াকে "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" বলা হয়। এই উভয় শক্তির ক্রিয়া আমরা অন্য প্রকারে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

১৯ পৃষ্ঠায় যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে ব্রহ্ম বা ভগবান আপনাকে জগদ্রূপে পরিণত করিয়াছেন। জগতে যাহা কিছু, তাহা ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্। শ্রীমদ্ ভাগবত একটি শ্লোকে ইহা সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।

যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরং তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ভাগ : ৮।৩।৩

—যাঁহাতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে ইহা উৎপন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট, এবং যিনি স্বয়ংই বিশ্ব, যিনি কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্, সেই স্বতঃসিদ্ধ বিভুর শরণ গ্রহণ করি।

শ্লোকটি এবং ইহার অর্থ ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলেও বোধ সৌকর্য্যার্থে এখানে পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয় নহে। এই শ্লোকটি ১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৭ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি। সুতরাং জগতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক যা কিছু, আমাদের ভাব-চিন্তা-সংকল্প-বিকল্প-কামনা-ক্রোধ-মোহাদি-স্নেহ-ভালবাসা-ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রভৃতি যত কিছু মানসিক ব্যাপার, আমাদের শরীর ও শরীরের প্রতি অণু-পরমাণু—এবং আমাদের নিদর্শনে, প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক ব্যাপার, প্রত্যেক শরীর ও তাহার প্রতি অণু-পরমাণু, ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্—ইহা শ্রুতি-স্মৃতির সিদ্ধান্ত—ইহা বিদ্বদনুভূতি—ইহা সমুদায় সাধনার পরম সিদ্ধি। কিন্তু আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? ইহার কারণ মায়ার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তি—শ্লোকোক্ত "তমঃ" ও "আভাস"। যেমন মেঘ স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে আবরণ করিয়া, দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপন্ন করত, শুষ্ক বৃক্ষখণ্ডকে পুরুষের ন্যায়, সুদূরপ্রসারী গিরিমালাকে ধূম ও কুজ্ঝটিকার ন্যায় প্রতীয়মান করে, সেইরূপ মায়ার আবরিকা শক্তি স্বয়ম্প্রকাশ অনুভূতি স্বরূপকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপিকা শক্তির বলে, জগদ্ভান্ প্রকটিত করে। ইহাই জগদ্ বৈচিত্র্যের কারণ। মায়ার এই আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তি কেন হইল, ইহার উত্তর ভগবানের সংকল্প—একের বহু হইবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা তাঁহার লীলাবশতঃই বা স্বভাববশতঃই হইয়া থাকে। লীলা সম্বন্ধে আলোচনা ২৩ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ গৌড়পাদাচার্য্য সৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিতেছেন :—

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥ মাণ্ডুক্য কারিকা ৯।

—কেহ কেহ বলেন (আপনার) ভোগের জন্য সৃষ্টি, অপরে বলেন, যে সৃষ্টি লীলার জন্য। পূর্ণকাম ঈশ্বরের স্পৃহা কোথায়? ঈশ্বরের ইহাই স্বভাব।

লীলাই বলা যাউক, বা স্বভাব বলা যাউক, ফলে এক। সৃষ্টির কারণ, উভয় পক্ষেই অনির্দ্দেশ্য।

মায়া—ক্রিয়াভেদে বিদ্যা, অবিদ্যা ও প্রধান এই তিনরূপে প্রতীত হয় :—

"আভাস" ও "তমঃ" এই দুইটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবার আরও একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আভাস কেবল মাত্র বিক্ষেপিকা নহে, প্রকাশিকাও বটে। উপরে আমরা ইহার বিক্ষেপভাব আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রকাশভাব আলোচনায় আমরা কি পাই, দেখা যাউক। মনে কর, নানারূপ সজ্জায় সজ্জিত একটি অন্ধকারময় গৃহ। অন্ধকারে গৃহাভ্যন্তরস্থ সজ্জা সকল পরিদৃশ্যমান নহে, অন্যপক্ষে আগন্তুক উপদ্রব-স্বরূপ—সর্প-বৃশ্চিকাদির সম্ভাবনা মনে আশঙ্কা উৎপাদন করে। কিন্তু গৃহের উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে একটি উজ্জ্বল দীপ আনয়ন করিলে, উক্ত দীপালোকের আভাস দ্বারপথে গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে স্থিত এবং গৃহের সহিত প্রাক্-সম্বন্ধযুক্ত সজ্জাদি

প্রকট করে এবং অবিদ্যমান সর্প-বৃশ্চিকাদির আশঙ্কা অপনোদন করে—সেইরূপ মায়ার অন্তরা শক্তি বিদ্যা উদয় হইলে জীবের স্বরূপের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ—সত্য-জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ভাব প্রকটিত হয় এবং আপনাতে অসম্বদ্ধ—মাত্র আগন্তুক কারণে উদ্‌ভূত, দেহ-দৈহিক-শোক-মোহাদি তিরোহিত হয়। আভাসের প্রকাশিকা শক্তি বিদ্যার প্রতীকরূপে এবং ইহার বিক্ষেপিকা শক্তি এবং তমঃ—অবিদ্যার দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গৃহটি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায়, গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিত এবং গৃহের সহিত প্রাক্-সম্বন্ধবিশিষ্ট সজ্জাদি দৃষ্টিগোচর হয় না, অন্যপক্ষে সর্প, বৃশ্চিকাদি বিদ্যমান না থাকিলেও, উহাদের বর্ত্তমানের সম্ভাবনা মনে আশঙ্কা উৎপাদন করে—সেইরূপ অবিদ্যা, জীবের স্বরূপের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ আবৃত করিয়া রাখায় উহা প্রতীতি গোচর হয় না, অন্যপক্ষে জীবের স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ রহিত, দেহ-দৈহিক-শোক-মোহাদির প্রতীতি উৎপাদন করে। মায়ার এই বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপা উভয় শক্তি ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবিদ্যা—জীবের স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ রহিত বস্তুর প্রতীতি উৎপাদন করে বলিয়া, উহা মিথ্যা কিছুই নহে। উহার ঐ প্রকার ক্রিয়া ভগবানের ইচ্ছাতেই সংসাধিত হয়। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই ভাগবতী শক্তি—ইহা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনা হইতে বোধগম্য হইবে।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে—বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি ভিন্ন আর একটি তৃতীয়া শক্তি প্রধান—প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা জগতের এবং জগতস্থ সমুদায়ের উপাদান কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান্ তাঁহার সংকল্পাত্মিকা মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগদ্‌রচনা করেন। এই সংকল্পই, মায়া হইতে জগতের উপাদান—প্রধান উৎপাদন করে—ইহা উপাদানের সমষ্টিভূত নাম। প্রধান—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের বিক্ষেপে উৎপন্ন বলিয়া এবং প্রধানের কার্য্যভূত মহদাদি, সমুদায় গুণজাত বলিয়া আচার্য্যগণ প্রধানের নাম "গুণমায়া" দিয়াছেন। এই নাম করণের অন্য একটি কারণও আছে। নিম্নে কথিত অবিদ্যা হইতে ইহার পৃথকত্ব বুঝাইবার জন্য ইহার নাম "গুণমায়া" ও অবিদ্যার নাম "জীবমায়া"। কারণ অবিদ্যা জীবের সহিত বিশেষভাবে সংজড়িত—অজীবের সহিত ইহার সংশ্লেষ নাই। গুণ—জীব ও অজীব উভয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। জীবকে সাধনা দ্বারা এই অবিদ্যা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়। উল্লিখিত চিত্রে এই উভয় নামই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বুঝিয়াছি যে, মায়া—ভগবদ্‌শক্তি, শক্তি—শক্তিমান হইতে অভেদ বলিয়া ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং মায়ার শক্তিরূপা—কি প্রধান—কি বিদ্যা, কি অবিদ্যা—কেহই মিথ্যা নহে।

মিথ্যা কি :—

তবে মিথ্যা কি, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা জগতে শশক নামে এক প্রকার জীব দেখিতে পাই, এবং গো-মহিষ প্রভৃতি জন্তুর শৃঙ্গ আছে

প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং শশক ও শৃঙ্গ কেহই মিথ্যা নহে—ইহাদের বাস্তব অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমরা যদি শশকের সহিত শৃঙ্গের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া "শশশৃঙ্গ" বলি,—তাহা কি সত্য হইবে? সে সম্বন্ধ মিথ্যা। পৃথিবীতে বন্ধ্যা নারীর অসদ্ভাব নাই, পুত্রও প্রতি গৃহস্থের গৃহে প্রত্যক্ষ হয়—ইহারা কেহই মিথ্যা নহে—ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আরোপই মিথ্যা। আকাশ ও কুসুম—উভয়েরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে, কিন্তু উহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যদি আমরা "আকাশকুসুম" দর্শনের অভিলাষ করি, সে অভিলাষ কি কিছুতেই পূরণ হইতে পারে? সেইরূপ দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি কিছুই মিথ্যা নহে, আবার আমাদের অন্তরস্থ "অহং, মম" ভাবও মিথ্যা নহে। তবে উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনই মিথ্যা। আমার নিজের অবয়বের উপর আমার কি কর্ত্তৃত্ব আছে? যদি থাকিত, তবে বাত যন্ত্রণায় অঙ্গচালনা করিতে পারি না কেন? পক্ষাঘাতে স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে বাধ্য হই কেন? অতি প্রিয়তমা স্ত্রী যদি আমার হইত, তবে তাহার অকালমৃত্যু প্রতিরোধ করিতে পারি না কেন? সুতরাং জাগতিক জীবে বা পদার্থে "অহং" "মম" সম্বন্ধ স্থাপনই মিথ্যা। এই মিথ্যা জ্ঞান মায়ার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহা উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। এই মিথ্যা জ্ঞানের উৎপাদক কারণের নাম এক কথায় অবিদ্যা—বা জীবমায়া।

সৃষ্টি মিথ্যা নহে—নশ্বর :—

দোলকের দৃষ্টান্তে আমরা বুঝিয়াছি, যে স্পন্দন অবিরাম গতিশীল। সৃষ্টি ও ও সংকল্পরূপা স্পন্দনাত্মিকা। সুতরাং সৃষ্টি ও তদন্তর্গত সমুদায় এই সংকল্পরূপ মূল স্পন্দনের দোলনে দোদুল্যমান। একারণ সৃষ্টি ও তদন্তর্গত বস্তুজাত সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল. নশ্বর। কেহই নিত্য, স্থির, সর্ব্বকালস্থায়ী নহে, ইহা আমরা বিশদভাবে বুঝিতে পারিলাম।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে:—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা······ইত্যাদি"। ইহাতে প্রশ্ন উঠে, যে যদি জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা নহে, তবে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় লোকাতীত ধীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিকপ্রবর জগৎ মিথ্যা বলিলেন কেন? ইহার উত্তর পাইতে হইলে তাঁহার পরিগৃহীত সত্যের পরিভাষা অনুসন্ধান করিতে হয়। ত্রিপাদবিভূতিনারায়ণ উপনিষদে—"কালত্রয়াবাধিতং ব্রহ্ম, সর্ব্বকালাবাধিতং ব্রহ্ম" কথিত আছে, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং তাহাদিগেরও অতীত সর্ব্বকালে অবাধিত অর্থাৎ নিত্য, একরূপ, কোনও প্রকার বিকার বা পরিবর্ত্তন রহিত—কোনও প্রকার বিকার বা পরিবর্ত্তন তাঁহাতে আরোপ করা যায় না। উহাই শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের মতে সত্য। সুতরাং যাহার বিকার বা পরিবর্ত্তন আছে, তাহা

তাঁহার মতে সত্য নহে বা মিথ্যা। তিনি আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার করেন না। অন্যান্য আচার্য্যগণ সত্যের যে পরিভাষা উপরে কথিত হইল, তাহা গ্রহণ করিয়া বলেন, যে ব্রহ্ম বা ভগবানের সংকল্পবশতঃ যাহার বিকার বা পরিবর্ত্তন আছে এবং সে কারণ নশ্বর, তাহাকে মিথ্যা বলিবার কারণ কি? উহার ব্যবহারিক সত্যতা ত বর্ত্তমান আছে। আচার্য্য শঙ্করও ব্যবহারিক সত্যতার অপলাপ করেন নাই। অতএব সত্যের শ্রেণী বিভাগের আপত্তি কি? ব্রহ্ম বা ভগবান্ পরম সত্য (সত্যং পরং ধীমহি, ভাগবত ১।১।১); তাঁহার সংকল্পবশতঃ সৃষ্ট জগৎ এবং তদন্তর্গত বস্তুজাত—আপেক্ষিক ব্যবহারিক সত্য বলিতে হানি কি? একান্ত মিথ্যা বলিলে সদ্‌স্বরূপের সংকল্পাত্মক ঈক্ষণ প্রভৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে আচার্য্যগণের যাহা কিছু মত বিভেদ, তাহা পরিভাষাগত মাত্র। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা মূলগ্রন্থে ৪।১।৬ সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে।

এই পরিভাষাগত পার্থক্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের বেদান্তদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন বাদ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের পরিগৃহীত সত্য ও মিথ্যার যে পরিভাষার কথা উপরে বলা হইল, তাহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত স্বতঃই আসিয়া পড়ে, যে জগৎ যখন মিথ্যা, তখন আমরা জগৎকে যে ভাবে দর্শন করি, তাহা প্রকৃত দর্শন নহে, উহা ভ্রম দর্শন মাত্র। অজ্ঞানাবস্থায় যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, অথবা শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হয়, জগদ্‌ভ্রমও তদ্রূপ। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্বান্তর নাই—তখন জগৎকে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর প্রকার দর্শন, ভ্রম দর্শন ভিন্ন কিছুই নহে। এই প্রকার যুক্তি ও বিচারের উপর তাঁহার বিবর্ত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত। এ প্রকার যুক্তি ও বিচারে মায়াকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না। অন্যান্য আচার্য্যগণ মায়া—ব্রহ্মশক্তি—স্বীকার করিয়া পরিণাম বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবর্ত্ত ও পরিণাম বাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা মূল গ্রন্থে ২।১।১৫ সূত্রে করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

ভ্রমদর্শন—তাহার প্রকার ভেদ :—

এই ভ্রমদর্শন বাদ যে কেবল শঙ্করদর্শনের, বিশেষত্ব, তাহা নহে। যোগাচার ও মাধ্যমিক বৌদ্ধগণও এই ভ্রম ও তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্ব মীমাংসক, নৈয়ায়িকও তাহা হইতে বিরত হন নাই। উঁহাদের পরস্পরের মধ্যে—এবং উঁহাদের সহিত শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের মতভেদ আছে। এই মতভেদ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে অতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে :—

আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথানির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥

দার্শনিকগণের মতে খ্যাতি বা প্রতীতি পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে, যথা আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি ও অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি। ইহাদের মধ্যে আত্মখ্যাতি—যোগাচার বৌদ্ধের মত। এই মতে বুদ্ধি-বিজ্ঞানই রূপ-রসাদি বিষয়-আকারে প্রতীত হয়। অসৎখ্যাতি—মাধ্যমিক বৌদ্ধের মত, এই মতে অসৎ বা শূন্যই একমাত্র সত্য পদার্থ—সেই অসৎই সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অখ্যাতি—পূর্ব্ব মীমাংসকের মত। এই মতে যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, তদুভয়ের পার্থক্য প্রতীতি গোচর না হওয়ার জন্য একটিকে অপরটি বলিয়া প্রতীত হয়। অন্যথা-খ্যাতি—নৈয়ায়িকের মত। ইহারা স্পষ্ট বলেন, একবস্তুর প্রতীতি অন্যবস্তুর ন্যায় হয়। ইহারা—যে ভ্রম হয়, তাহাই সংক্ষেপে এককথায় দর্শনের ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি—শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের মত—এই মতে যাহাতে যে বস্তুর ভ্রম হয়, তাহাতে সেই সময়ের জন্য একটি অনির্ব্বচনীয় পৃথক্ বস্তু উৎপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে, যুক্তি ও বিচার অবলম্বনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণ, একই ভ্রমকে ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দেশ করিলেও উঁহারা সকলেই নৈয়ায়িকগণের পরিগৃহীত "অন্যথাখ্যাতির" অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এখানে সে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উক্ত পঞ্চখ্যাতি বাদের নিদর্শনে "অচিন্ত্যখ্যাতি" গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবলে বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে, এবং জগৎ এবং তদন্তর্গত বস্তুজাত স্বরূপতঃ ব্রহ্মাত্মক হইলেও, তাঁহার উক্ত ঐ অচিন্ত্যশক্তিবলেই, ঐ সকলে ব্রহ্মদর্শন না হইয়া জগদ্দর্শন হইয়া থাকে। এই অচিন্ত্যশক্তির নামই মায়া। পৃথিবীস্থ সমুদায় মনুষ্যের যে এক প্রকার দর্শনলাভ হয়, তাহার কারণ সৃষ্টিকর্ত্তার সংকল্প। তাঁহার সংকল্পমত সমষ্টি জীব বা হিরণ্যগর্ভ, জগৎকে যে ভাবে দর্শন করেন, ব্যষ্টি জীবও সেই ভাবে দর্শন করিতে বাধ্য, অন্য কথায় সমষ্টি মনে বা মহত্তত্ত্বে জগৎ যে ভাবে প্রতিভাসিত হয়, ব্যষ্টিমনে বা প্রতি জীবের মনে উহা সেই ভাবে প্রতীয়মান হয়। ইহাতে ভ্রম কল্পনার কোনও অবকাশ নাই। যাঁহার সংকল্পে জগৎ সৃষ্টি, তাঁহার সংকল্পানুসারেই জগদ্দর্শন। যদি সৃষ্টি সংকল্পাত্মিকা হয়, তবে জগদ্দর্শন সংকল্পাত্মক কেন না হইবে? সৃষ্টি সংকল্পাত্মিকা, ইহা আমরা শ্রুতি প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম, যে জগদ্দর্শন ভগবানের সংকল্পানুসারেই সংঘটিত হয়। এবং তাঁহার সংকল্পানুসারেই উপযুক্ত সাধনা অনুষ্ঠানে জগদ্দর্শন তিরোহিত হইয়া, সম্যগদর্শন বা সত্যদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন আত্মপ্রকাশ করে। ভগবান সূত্রকার ৩।২।৫ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে ভগবানের সংকল্পানুসারেই জীবের বন্ধ মোক্ষ। তাঁহার ইচ্ছাই জগদ্বৈচিত্র্যের নিয়মশৃঙ্খলা। এই নিয়মশৃঙ্খলার অন্য নাম মায়া। উপরে ২৩ পৃষ্ঠায় যে শাসক নিয়ম বা কর্ম্মবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কর্ম্মবাদকে নিমিত্ত করিয়া মায়া ক্রিয়া করেন। ক্রীড়কের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা এবং তজ্জনিত

কর্ত্তৃত্বারোপ কর্ম্মবাদের প্রাণ। ইহাই অদৃষ্ট সৃষ্টি করে এবং মায়ার ক্রিয়ার সহায়ক হয়। এই প্রকারে বিশ্বচক্রচলিতে থাকে। মায়ার ক্রিয়া অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে।

মায়ার দৃষ্টান্ত ঃ—

প্রাতে সূর্য্যোদয়, ক্রমশঃ সূর্য্যের প্রখরতা বৃদ্ধি, মধ্যাহ্নে চরম বৃদ্ধি, ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত, রাত্রে অন্ধকারে ভূতল গগনের আবরণ, নক্ষত্রগণের জ্যোতিঃ বিকাশ, কখনও কখনও হ্রাসমান বা বর্দ্ধমান চন্দ্রের আবির্ভাব এবং স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণের অমৃতপ্লাবন—এ সমুদায় মায়ার ক্রিয়া। ঋতুপর্য্যায় এবং তদনুষঙ্গিক বিবিধ বৃক্ষ-লতা-ওষধি প্রভৃতির কুসুম-ফল-উদ্ভেদ, গ্রীষ্মে ভূপৃষ্ঠ হইতে জলের বাষ্পাকারে আকাশে উন্নয়ন, বায়ুপ্রবাহে তাহার ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিরোদেশে সঞ্চরণ, তত্তদ্দেশে বৃষ্টিপাত, তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের আর্দ্রীকরণ, এবং সে কারণ বীজাদি হইতে অঙ্কুরোদ্গম, ক্রমশঃ বৃক্ষ-লতা-ওষধি প্রভৃতির জন্ম-বৃদ্ধি-পুষ্প-ফল প্রভৃতির উৎপাদন, তদ্দ্বারা জীবগণের আহার সংস্থান—সমুদায় মায়ার দ্বারা সংঘটিত। মানব শিশুর জন্ম, ক্রমশঃ বাল্য-কৈশোরের মধ্য দিয়া যৌবনে শক্তির পূর্ণ বিকাশ, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ, শেষে মৃত্যু—এই সমুদায়ই মায়ার খেলা। আমাদের প্রত্যেকের দেহের, প্রতি অবয়বের, প্রত্যেকের গতির, প্রকৃতির, ভঙ্গীর, মানসিক বৃত্তির, চিন্তা প্রভৃতির বিভিন্নতা এবং তজ্জন্য জগদ্বৈচিত্র্য মায়ারই কার্য্য। এক কথায়, জগতে আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সাহায্যে, যাহা কিছু দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ আস্বাদন করি, আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সাহায্যে, কথন, গতি, আদান, আনন্দ-উপভোগ, বিসর্গ, আমাদের অন্তরেন্দ্রিয়গণের সাহায্যে চিন্তা, সংকল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, ভাব, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি সমুদায়ের মূল মায়া। জগৎ, তদন্তর্গত বস্তুজাত, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, ব্যবহার, ক্রিয়া, সমুদায় মায়া ভিন্ন কিছু নহে। সমুদায় বৈচিত্র্য বিভেদ মায়া দ্বারা গঠিত। এক কথায় দ্বৈত দর্শন মায়া হইতে জাত। শ্রীমদ্ ভাগবত একাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ৩ হইতে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ১৫টি শ্লোকে মায়ার ক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। এই শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে সৃষ্টির অভিব্যক্তি, স্থিতিকাল, দৈহিক-মানসিক-ব্যাপার পরম্পরা, নাশ, প্রলয়, সমুদায় মায়া। উহারা সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর হইলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

মায়া—অনাদি, নিত্য ঃ—

এই একই ভাব চণ্ডীতে বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে ভগবানের মায়াকে "মহামায়া"—"বিষ্ণুমায়া"—"তামসীদেবী" প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তিনিই সমুদায় ভূতের অন্তরে নিদ্রা, ক্ষুধা, শক্তি, তৃষ্ণা,

কান্তি, ছায়া প্রভৃতি শারীরিক এবং বুদ্ধি, ক্ষান্তি লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, ভ্রান্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিরূপে সর্ব্বকাল বিরাজ করিতেছেন। কি শারীরিক কি মানসিক, সমুদায় ব্যাপার তাঁহার সত্তায় সত্তাবান, তাঁহার পরিচালনে ক্রিয়াবান। জগতে যাহা কিছু ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে এই মায়া বা মহামায়া বা বিষ্ণুমায়া। শ্রীভগবানের শক্তি বলিয়া, ইনি ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বশক্তিমতী। শক্তি শক্তিমানে অভেদ বলিয়া, ভগবানও যাহা, ইনিও তাহাই। সৃষ্টির অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তখন উহাদের পরস্পর পার্থক্য ছিল না. সৃষ্টির অভিব্যক্তির জন্য, পরম পুরুষের সংকল্পবশতঃ অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে প্রকটন। যিনি এক অদ্বিতীয়—নিজ স্বরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া, তাহাতে অব্যাহত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াই, আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করত, পুরুষ-প্রকৃতিরূপে, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্ররূপে, পিতৃ-মাতৃ-শক্তিরূপে, যোগাত্মক-ঋণাত্মক-শক্তিরূপে, অগ্নি-সোমরূপে জগতের এবং জগতস্থ সমুদায়ের অণু পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাব প্রকটন করেন। উভয়েই অনাদি। গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন :—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। গীতা ১৩।১৯

—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া জানিবে।

পূর্ব্ব ৪০ পৃষ্ঠায় "অজা" মন্ত্রের আলোচনায়, মায়া যে অনাদি, তাহা আমরা বুঝিয়াছি এবং মায়া যে প্রকৃতি, তাহাও বুঝিয়াছি। প্রলয়ে অনভিব্যক্ত ভাবে, সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত ভাবে এবং স্বরূপে—শক্তিমানের শক্তিস্বরূপ অবিনাভাবে—চির বর্ত্তমান। কখনই অস্তিত্বের অসদ্‌ভাব নাই। তবে কার্য্যাকারে অভিব্যক্তির সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাবকে আমরা ভাষায় ইহার অভিব্যক্তি, অনভিব্যক্তি বলিয়া থাকি মাত্র। পরম পুরুষের সংকল্প কার্য্যাকারে পরিণত করা মায়ার কার্য্য। চৈতন্য হইতে—দৃশ্যতঃ তদ্বিরোধী জড়ের উৎপত্তি—জড় চৈতন্যের একত্র সমাবেশ—মায়ার দ্বারা সংঘটিত। উপরে যে সম্যগ্‌দর্শন বা সত্যদর্শনের অপলোপ এবং জগদ্দর্শনের প্রসার বলা হইয়াছে, তাহা এই মায়ার ক্রিয়া। ইহা বুঝাইবার জন্য, তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ের "ভ্রান্তি" রূপে বিরাজিতা বলিয়া, চণ্ডীতে কথিত হইয়াছেন। উপাসনা তত্ত্ব আলোচনায়, আমরা পুনরায় এই ভ্রান্তি এবং তজ্জনিত অসম্যগ্‌-দর্শনের সাক্ষাৎ পাইব এবং তাহার কারণ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিব।

উপসংহার :—

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে মায়া ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি। কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা ইহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। ভগবান্ যেমন অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বাচ্য, অব্যপদেশ্য, ইনিও তেমনি। এই শক্তি বিকাশে, চৈতন্যময় ভগবান্ হইতে দৃশ্যতঃ

জড়ের উৎপত্তি, চৈতন্যের সহিত জড়ের সংমিলন, ভোক্তার সহিত ভোগ্যের সংযোগ এবং সে কারণ জীবভাবের বিকাশ। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহার ধারণা মানবচিন্তার অতীত বলিয়া আচার্য্যগণ ইহাকে অচিন্ত্যশক্তি বলিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা ভগবানে লীন ছিল, সৃষ্টির জন্য ইহার ব্যক্তিভাবে অভিব্যক্তি। গায়কের গান গাহিবার শক্তির ন্যায়, ইহা ইচ্ছানুসারে প্রকটিত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই মায়া পরব্রহ্মের ঈক্ষণে—ক্রিয়াশীলা। ইহার ক্রিয়া প্রধানতঃ তিন প্রকারে আমাদের উপলব্ধি গোচর হয়—প্রধানরূপে, অবিদ্যারূপে ও বিদ্যারূপে। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বৈতদর্শন ও বহুদর্শন এই মায়ার দ্বারা ঘটিয়া থাকে। মায়া অপগত হইলে, দ্বৈতদর্শন ও বহুদর্শনও অপগত হয়, তখন ঐক্যদর্শন পরিস্ফুট হয়, অদ্বৈতদর্শন উদ্ভাসিত হয়, সংসার জ্ঞান তিরোহিত হয়,—ইহাই মোক্ষ, বিদ্যা দ্বারা ইহা সংঘটিত হয়। অবিদ্যা দ্বারা যেমন সংসারের প্রসার ও তাহাতে বন্ধ, বিদ্যা দ্বারা সংসারের তিরোধান ও মুক্তি। উভয়েরই উদ্দেশ্য লীলা বৈচিত্র্য—খেলার আনন্দভোগ ও আনন্দপ্রদান। প্রদান বা কাহাকে হইবে? তত্ত্বান্তর ত নাই। সুতরাং আনন্দের উপভোগই উদ্দেশ্য—অথবা আপ্তকামের আনন্দ উপভোগের স্পৃহা কোথা হইতে হইবে, সুতরাং উহা আনন্দময়ের স্বভাব, বলিতেও দোষ নাই। লীলা বলা হউক, বা স্বভাব বলা হউক, ফলে উদ্দেশ্য-নির্দ্দেশ অসম্ভব, ইহা উভয়তঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে। উভয়েই প্রশ্নের উত্তর বা উত্তরানুসন্ধান পরিহার করা হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। মায়াতত্ত্ব আলোচনায় আমরা আরও বুঝিলাম, যে ব্রহ্ম বা ভগবানই মায়াশক্তি বিকাশে জগদ্রূপে প্রতিভাত হন। শ্রীমদ্ ভাগবত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণং।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মিণা॥ ভাগ ঃ ৩।৩২।২৩

—একমাত্র জ্ঞানই নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনি বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ শব্দাদি বিষয়রূপে প্রতিভাত হন। ভাগ ঃ ৩।৩২।২৩

সুতরাং জগতের যাহা কিছু, তাহা ভগবান্ হইতে অপৃথক্। মায়ার প্রভাবে উহারা তত্তদ্রূপে প্রতিভাত হইলেও, উহারা তত্ত্বতঃ ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তাঁহারই সংকল্পজনিত স্পন্দন, তদীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে রূপ রসাদি আকারে প্রতিভাসমান হয়, ইহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে, কেননা উপাসনা বা সাধনাতত্ত্বের আলোচনায় আমরা আবার ইহার সাক্ষাৎ পাইব।

মায়া যেমন অনির্দ্দেশ্যা, অনির্ব্বচনীয়া—মায়া জন্য জগৎ ও তদন্তর্গত পদার্থ সকলও অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয়। জড়-বৈজ্ঞানিকগণ ইহা পদে পদে অনুভব করিয়া থাকেন। কোনও পদার্থের বা কোনও ব্যাপারের কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া,

তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা কতকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহার পশ্চাতে অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধক দেখিয়া স্তম্ভিত হন ও প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন, ইহার উল্লেখ সংক্ষেপতঃ ৪।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় করা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত জগৎ ও তদন্তর্গত বস্তুজাতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ভাগ : ১০।১৪।১২

—এই অস্তি—নাস্তি ব্যপদেশ ভূষিত জগৎ—(অর্থাৎ যাহাকে অস্তি বা নাস্তি উভয়বিধ প্রয়োগের দ্বারা সংযুক্ত করা যাইতে পারে, যাহাকে অস্তিও বলা যায়, আবার নাস্তিও বলা যায়, অথবা অস্তিও বলা যায় না, এবং নাস্তিও বলা যায় না, এরূপ যে জগৎ) তাহা কি তোমার কুক্ষির অভ্যন্তরে অল্পমাত্র অংশে অবস্থিত নহে ! ভাগ : ১০।১৪।১২

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে ভাগবতকারের নিকট ইহা সুস্পষ্ট, যে, জগৎ মায়ার কার্য বলিয়া, উহা মায়ার ন্যায়ই অনির্দ্দেশ্য, অনির্ব্বচনীয়, ভাষায় উহার তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেশ-কাল-তত্ত্ব

দেশ ও কাল দোলকের দোলনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংজড়িত :—

মূল গ্রন্থের ৪।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় দেশ ও কাল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় যে দোলকের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, উহার সাহায্যে আমরা কি পাই দেখা যাউক। একটি সাধারণ দোলকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, যে দোলক নির্দ্দিষ্ট কালে একবার দোলন সমাধা করে, অর্থাৎ ধ্রুব বিন্দু হইতে বহির্ম্মুখে গমন করিয়া ইহার দোলন পথের প্রান্তবিন্দু পর্য্যন্ত গমনের পর পুনরায় ধ্রুববিন্দুতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ৩২ পৃষ্ঠার চিত্রে 'অ' ধ্রুববিন্দু; উক্ত 'অ' হইতে 'ছ' বিন্দু পর্য্যন্ত গমন বহির্গমন; 'ছ' বিন্দু হইতে 'অ' বিন্দুতে আগমন—অন্তর্ম্মুখে প্রত্যাবর্ত্তন। দোলক, এই গমনাগমনে যে পথ অতিক্রম করে, উহাকে এক কথায় দোলকের "ব্যাপ্তি" বলা যাইতে পারে। এই ব্যাপ্তিকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিলে, এক অর্দ্ধে বহির্ম্মুখে গমন, অপরার্দ্ধে অন্তর্ম্মুখে প্রত্যাগমন। এই গমনাগমনের সঙ্গে দেশ ও কাল অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। গতি বুঝিতে হইলে দেশের যেমন প্রয়োজন, কালেরও সেইরূপ প্রয়োজন—ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া গতির ধারণা করা যায় না। দেশ—অবস্থান স্থান এবং কাল—পারম্পর্য্য নির্দ্দেশ করে। নদীর উপর একখানি নৌকা রহিয়াছে, উহা যখন নোঙ্গর দ্বারা একস্থানে বাঁধা থাকে, তখন উহা স্থির; এবং সে কারণ তখন দেশ ও কালের নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু নোঙ্গর খুলিয়া দিয়া, উহাতে পাল উঠাইয়া, স্রোতের অনুকূলে নৌকা ছাড়িয়া দিলে, উহাতে গতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় এবং তখন দেশের পরিবর্ত্তন এবং কালের পারম্পর্য্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, নতুবা গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয় না। দোলক সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। যখন দোলক স্থির থাকে, তখন দেশ কালের নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। দোলক দোলাইয়া দিলে, উহার গতি পরিলক্ষিত হয়, এবং তখন, কোনও বিশেষ স্থানে দোলকের আগমন লক্ষ্য করা প্রয়োজন হইলে, দেশ ও কাল উভয়ই আবশ্যক হইয়া পড়ে। একটি দোলক কত সময়ে উহার ব্যাপ্তিস্থানে দোলন সমাধা করে, ইহা জানা থাকিলে, উহার উক্ত দোলন পথে কোনও নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে বহির্গমন বা অন্তর্ম্মুখে প্রত্যাগমন পরিদৃষ্ট হইবে, ইহা সহজেই হিসাব করিয়া বাহির করা যায়। সুতরাং দেশ ও কাল দোলকের দোলনের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংজড়িত বুঝা গেল।

সমষ্টি বিশ্বের ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতি যাহা—ব্যষ্টিপক্ষে তাহাই ষড়্‌বিকার :—

সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতির প্রতীকরূপে আমরা দোলক ব্যবহার করিয়াছি। দোলক দুলিতে আরম্ভ করিলে, উহা অনবরত দুলিতে থাকে, একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না। শনৈঃ শনৈঃ, নীরবে অন্যের অলক্ষ্যে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে, বিনা উদ্দীপনায়, বিরাম-বিশ্রান্তির অপেক্ষা না করিয়া, নিজের ছন্দানুসারে অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হয় বা পরিণতির পথে প্রত্যাগমন করে। দেশ ও কাল এই অভিব্যক্তির বা পরিণতির সাক্ষ্য প্রদান করে। সমষ্টির পক্ষে যে নিয়ম, ব্যষ্টির পক্ষেও তাই। প্রকৃতপক্ষে সমষ্টি সমবায়ী ব্যষ্টি ভিন্ন কিছুই নহে। পৃথক্ পৃথক্ তরু গুল্ম প্রভৃতি মিলিত হইয়া বন গঠিত করে—উক্ত তরু সমবায়ের মধ্যে কোন বিশেষ বৃক্ষ ছেদিত হইলেও বনের বনত্ব বর্ত্তমান থাকে। অসংখ্য জীবকোষ সম্মিলিত হইয়া মানব দেহ সৃষ্টি করে—ব্যষ্টি জীবকোষ সমুদায়ে জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানোৎপাদন, মৃত্যু প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রতি সাত বৎসরে উহারা সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া মানব দেহ হইতে অপসারিত হইলেও, দেহ—উক্ত জীবকোষ সমূহের সমজাতীয় কোষ সকলের সমবায়ে প্রবাহরূপে বর্ত্তমান থাকে। সমষ্টি বিশ্বও ব্যষ্টি স্থাবর জঙ্গম সমূহের সমবায়ে উৎপন্ন। ব্যষ্টি স্থাবর জঙ্গমগণের মধ্যে কোনও বিশিষ্ট স্থাবরের বা জঙ্গমের ধ্বংস হইলেও, তৎজাতীয় স্থাবর জঙ্গমগণের সমবায়ে বিশ্ব, প্রবাহ-রূপে বর্ত্তমান থাকে। অভিব্যক্তির এবং পরিণতির নিয়ম উভয় ক্ষেত্রে এক প্রকার। একটি স্তিমিত, নীরব জলাশয় পৃষ্ঠে একখণ্ড লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিলে তরঙ্গ উৎপাদিত হয়, একটি লোষ্ট্রে একটি তরঙ্গ উৎপাদিত হইয়া শেষ হয় না, জলের বিক্ষোভে বহু তরঙ্গ উৎপাদিত হয় এবং উহাদের ঘাত প্রতিঘাতে এবং তীরের প্রত্যভিঘাতে পরস্পর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিন্তু কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ, সমুদায় তরঙ্গ, একই নিয়ম অনুবর্ত্তন করে এবং সমুদায়ের সমবায়ে উৎপন্ন তরঙ্গলীলা, একই নিয়ম পালন করে।

সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতির নিদর্শনে—ব্যষ্টিরও উক্ত দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ। শাস্ত্র, ব্যষ্টির অভিব্যক্তি ও পরিণতি, প্রত্যেককে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহাদের ষড়বিকার নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তন্মধ্যে জন্ম, স্থিতি ও বৃদ্ধি—অভিব্যক্তির, এবং অপক্ষয়, পরিণাম ও নাশ—পরিণতির অন্তর্ভুক্ত। দোলক কখনই স্থির নয় বলিয়া এই ষড়বিকার প্রতিক্ষণে, অল্পে অল্পে, অলক্ষ্যে, সম্পাদিত হইতেছে। প্রকৃতির অপ্রতিহত শক্তিতে ইহা সংসাধিত হইয়া থাকে। এ শক্তির ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। যত দিন মায়া বা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, ততদিন এই ষড়বিকার মানিয়া চলিতেই হইবে। এইজন্য বলা হয়, যে জগতে সকলেই পরিবর্ত্তন স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশ ও কাল উহাদের সাক্ষী-

স্বরূপ অবস্থান করিয়া, কোনও বিশেষ পদার্থ উক্ত পরিবর্তন স্রোতের কোন স্থানে অবস্থান করিতেছে, কোনও বিশেষ জীব জীবনপথের কোন বিশেষ স্থানে রহিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রদান করে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। বিশ্ব—অভিব্যক্তির বা পরিণতির কোন স্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা উহার বয়স জানিলে এবং ৩২ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত চিত্রের কোন স্থানে উহার অবস্থান জানিতে পারিলে, বুঝা যায়। এজন্য শাস্ত্রকারগণ মন্বন্তরাদি কাল বিভাগ দ্বারা উহার বয়স এবং অবস্থান স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত চিত্রে "কখগঘ····· "প্রভৃতি অক্ষর দ্বারা ঐ স্থান সকল চিহ্নিত করা হইয়াছে।

সৃষ্টির পরিণামিত্ব বশতঃ দেশ কালের ঐকান্তিক আবশ্যকতা :—

জড় চৈতন্যের সংযোগে সংসার—ইহা পূর্ব্বে একাধিকবার বলা হইয়াছে। সৃষ্টির অর্থ, সৎস্বরূপের সংকল্পানুসারে চৈতন্য হইতে জড়ের অভিব্যক্তি, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জড়ের ধর্ম্ম সকলও উক্ত সংকল্প হইতে উৎপাদিত। স্থানাবরোধকতা—জড়ের একটি বিশেষ ধর্ম্ম, প্রত্যেক জড় দ্রব্য কিছু না কিছু স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিবেই করিবে। কিন্তু সকলেই প্রবহমান পরিবর্ত্তন স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে, একটির পর অন্য একটির পারম্পর্য্যভাবে আবির্ভাব এবং তিরোভাব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। দেশ অবস্থান স্থানের ও কাল—পারম্পর্য্যের জ্ঞাপক এবং উভয়ে মিলিতভাবে পারিপার্শ্বিকের সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে। সুতরাং সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দেশ ও কাল ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতিগত স্বভাব বশতঃ এবং সৃষ্টির পরিণামিত্ব বশতঃ দেশ ও কালের ঐকান্তিক আবশ্যকতা বুঝা গেল।

দেশ—অসীম, এবং কাল—অনন্ত কিনা ?

দেশ ও কালের সহিত অসীমত্ব এবং অনন্তত্ব জড়িত। দেশ বা কাল শেষ হইয়া যাইবে, এ প্রকার ধারণা আমরা করিতে পারি না। তাহার কারণ, আমাদের ধারণা করিবার যন্ত্র মন বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় জড় পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত—উহারা অতি সূক্ষ্ম হইলেও, জড়ের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে কি প্রকারে? উহাদের অস্তিত্বের সহিত দেশ-কাল জড়িত—একারণ দেশ কালকে বাদ দিয়া উহারা কোনও ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু তা বলিয়া কি দেশ কাল বাস্তবিক অসীম ও অনন্ত? তাহা নহে। মৎকৃত "গায়ত্রীরহস্য" পুস্তকে ব্রাহ্মণগণের ত্রিসন্ধ্যায় করণীয় "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ······" মন্ত্রের অর্থালোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে দেশ কাল সৃষ্ট পদার্থ—ইহারা মায়ার বিক্ষেপিকা শক্তির পরিচায়ক—বিশ্ব সৃষ্টির সহিত ইহারা একান্তভাবে জড়িত। সৃষ্টি বাদ দিয়া ইহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং বিশ্ব যদি সসীম ও সান্ত হয়, তাহা হইলে দেশ-কালও সসীম ও সান্ত। বিশ্ব সসীম ও সান্ত—ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট আছে। উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন

নাই। ৪।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি, যে উচ্চ গণিতজ্ঞগণের মতে বিশ্ব সসীম ও সান্ত—সুতরাং দেশ ও কাল আমাদের ধারণায় অসীম ও অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহারা সসীম ও সান্ত।

দেশ ও কাল পৃথক বস্তু কি না ?

আমরা যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে সৃষ্টপদার্থের সহিত দেশ ও কাল ঘনিষ্ঠভাবে সংজড়িত এবং উহাদের নিত্য সহাবস্থান বর্ত্তমান। ইহাতে প্রশ্ন উঠে—উহারা পরস্পর পৃথক্ বস্তু, অথবা একই বস্তুর, পৃথক পৃথক্‌ভাবে দর্শন মাত্র। উপরের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে পরিবর্ত্তন, সৃষ্ট-পদার্থের প্রকৃতিগত। একটি বস্তু এইক্ষণে যে আকারে বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ উহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ—দেশের যেটুকু স্থান লইয়া অবস্থান করিতেছে, ইহার পরমুহূর্ত্তে, তাহা আর ঠিক সে আকারে বর্ত্তমান নাই, উহার উক্ত দৈর্ঘ্য বিস্তারাদির কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছেই; এই পরিবর্ত্তনের উপর লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রকারগণ "নিত্যপ্রলয়ের" অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বস্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বস্তুর আকার, পরিমাণ, বা বস্তুমান নির্ণয়ের জন্য দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধাত্মক দেশ যেমন প্রয়োজনীয়, কালও তেমনি প্রয়োজনীয়। কোনও বস্তুর সম্বন্ধে দেশকে যেমন দৈর্ঘ্য-বিস্তারাদি হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না, কালকেও সেইরূপ উহাদের সমবায়েই গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং দেশ ও কাল একই বস্তুর পৃথক্‌ভাবে দর্শন মাত্র। যখন আমরা উহার দৈর্ঘ্যাদির বিষয়মাত্র আলোচনা করি, তখন আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "দেশ" সম্বন্ধে আলোচনা করি। যখন আমাদের লক্ষ্য প্রধানতঃ উহার ক্ষণিক পরিবর্ত্তনের উপর নিবদ্ধ করি, তখন আমরা "কাল" এর উপর আমাদের মনোযোগ প্রদান করি। অতএব বুঝা গেল, যে দেশ ও কাল আমাদের দর্শনের বা আলোচনার প্রভেদের উপর নির্ভর করে।

বস্তুমান, দেশ ও কাল—পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ :—

আমরা বুঝিলাম, যে বস্তুমান, দেশ ও কাল, পরস্পর পরস্পরের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ—পরস্পরের নিত্য সহাবস্থান—একটিকে ছাড়িয়া অপর দুইটী থাকিতে পারে না। শ্রুতিতে এই সমবায়ীভাব বা নিত্য সহাবস্থান "আকাশ" শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি ৮।১৪।১ মন্ত্রে "আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক" বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ৪।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় কথিত হইয়াছে, এখানে উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, যে নাম-রূপের অভিব্যক্তিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর পৃথক্‌ভাবে প্রকটনে, বস্তুমান যেরূপ প্রয়োজনীয়, বস্তুর আধার স্থান-স্বরূপ দেশ, এবং বস্তুমানের পরিবর্ত্তনীয়তার হেতুভূত কালও সমভাবে প্রয়োজনীয়। দেশ—আধার, কাল—ক্ষোভক, বস্তু—স্বভাববশতঃ পরিণামশীল,—ভাগবত ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ। ভাগবত ২।৫।২২

—কাল হইতে গুণসমূহের ক্ষোভ এবং স্বভাব হইতে পরিণাম সংঘটিত হয়। ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ—ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম।

আমাদের দেশ কালের ধারণা আপেক্ষিক :—

দেশ কালের নিরপেক্ষ ধারণা কাহারও নাই। সমুদায় জীবের দেশ কালের ধারণা আপেক্ষিক। আমি মানব দেহধারী জীব। আমার দেশ কালের ধারণার সহিত আমার শরীরস্থ একটি রক্ত কণিকার উক্ত ধারণা তুলনা কর ; ইহাও জীবপদ বাচ্য, তাহার ধারণা আমার ধারণার সহিত সমান নহে। আমার দেশের ধারণার পরিমাণে আমার শরীর স্বল্পায়তন বটে, কিন্তু আমার একটি রক্তকণিকার পক্ষে তাহা, তাহার বিশাল জগৎ ; উহার বাহিরে তাহার অন্য কোনও জগতের ধারণা নাই। আমার আয়ুষ্কাল শাস্ত্রমতে ১০০ একশত বৎসর ধরিয়া আমি আত্মসন্তোষ লাভ করি এবং তাহার মধ্যে আবার বাল্য, যৌবন, সন্তানোৎপাদন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ভোগ করিয়া পূর্ণ আয়ুষ্কাল ভোগ করিলাম বলিয়া আনন্দিত হই। কিন্তু এরূপ প্রাণী আমাদিগের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, তাহার আয়ুষ্কাল মাত্র ৫ মিনিট, কিন্তু উক্ত প্রাণী ঐ পরিমাণ আয়ুষ্কালকে কি আমাদের ধারণানুসারে ৫ মিনিটের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে? আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা বলেন, যে তাহা নহে ; উক্ত প্রাণী ঐ পরিমাণ, আমাদের ধারণার অল্প সময়ের মধ্যে, তাহার পূর্ণ আয়ুষ্কাল ভোগ করে—উহার মধ্যেই উক্ত প্রাণীর জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, সন্তানোৎপাদন, অপক্ষয়, নাশ, সমুদায়ই ভোগ হয়। ইহা বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের শ্বশুর রেবতের উপাখ্যান পুরাণে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। রেবত সত্যযুগের রাজা, তিনি তাঁহার কন্যা রেবতীর বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিতে অসমর্থ হইয়া কন্যা সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে যান। সে সময়ে তখন ব্রহ্মলোকে সঙ্গীত উৎসব হইতেছিল, ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন। রেবত কন্যার সহিত একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে সঙ্গীত সাঙ্গ হইলে, তিনি ব্রহ্মাকে কন্যার পাত্রের সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা তাহাতে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, যে ব্রহ্মলোকের মুহূর্ত্তকালে পৃথিবীতে মানব পরিমাণের বহুযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন আর পৃথিবীতে তাঁহার পরিচিত কেহই বিদ্যমান নাই, একারণ বলদেবের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কালের পরিমাপক মানদণ্ড সকলের সমান নহে। মানব পরিমাণের একমাস—পিতৃলোকের ১ দিন, মানব মানের ১ বৎসর—দেবমানের ১ দিন। দেবমানের ১২,০০০ বৎসর ১ চতুর্যুগ। ১,০০০ চতুর্যুগ—ব্রহ্মার একদিন ইত্যাদি। দেবমানব-প্রভৃতির পক্ষে যেরূপ, মানব ও ক্ষুদ্র জীবের পক্ষেও তাই।

দেশ সম্বন্ধেও একই কথা—আমরা মানব, আমাদের পক্ষে আমাদের পৃথিবী বিশাল বলিয়া আমরা মনে করি, কিন্তু দেবতারা ত্রিলোকের মধ্যে বিচরণ করেন। ব্রহ্মার পক্ষে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার শরীর মাত্র। মানব এবং ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবের পক্ষে ও ঐরূপ ইতর বিশেষ। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, যে দেশকালের ধারণা আপেক্ষিক মাত্র। এরূপ হইবার কারণ ভগবানেরই সংকল্প। দেশ ও কাল ভগবান্ হইতে পৃথক্ তত্ত্বান্তর নহে। তাঁহার ইচ্ছাতেই উহারা বিভিন্ন প্রাণীর পক্ষে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র।

ভগবান্ অখিলাশ্রয় এবং আপনি আপনার আধার :—

সৃষ্টি বৈচিত্র্যে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং "অনবস্থা" দোষ পরিহারের জন্য মূল এবং আদি কারণ ব্রহ্ম, ইহা আমরা বুঝিয়াছি। কার্য্য কারণ শৃঙ্খলের ন্যায় আধার-আধেয় শৃঙ্খলও বিশ্বে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। এই শৃঙ্খল অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে, এক মূল আধারে পৌঁছিতে হয় নতুবা "অনবস্থা" দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। দেশ সমুদায় বস্তুর আধার, ইহা সুস্পষ্ট। দেশের আধার কি—ইহার উত্তরে—বলিতে পারা যায়, যে মায়া দেশের আধার, কেননা, মায়া হইতে দেশ অভিব্যক্ত। মায়ার আধার অনুসন্ধান করিতে যাইলে, ব্রহ্মই মায়ার আধার হইয়া পড়েন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার-নারদের উপাখ্যানে, যখন নারদ, আধার আধেয় শৃঙ্খল বুঝিতে চাহিলেন, তখন ভগবান সনৎকুমার, একটির পর একটির আধার-আধেয় সম্বন্ধ বুঝাইয়া "ভূমাই" সমুদায়ের আধার বলিলেন ; তখন নারদ পুনরায় ভূমার আধার কি জানিতে চাহিলেন, উত্তর হইল, সর্ব্বাধারের আবার আধার কি ? তবে যদি উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে হয় বলিতে হইবে, যে আধার নাই অথবা তিনি নিজেই নিজের আধার, অর্থাৎ তিনি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ ॥ ভাগ : ১১।৯।১৬

—তিনি নিখিল বিশ্বের আশ্রয়—আত্মাধার, এক, অদ্বিতীয়।

কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ ··· ···। ভাগবত ৬।৯।৩০

—তিনি কেবল অর্থাৎ একমাত্র বা পূর্ণ, জগতের আধার এবং সমুদায় লোকের একমাত্র প্রভু।

সাধারণ প্রণামমন্ত্রে আমরা বলিয়া থাকি—

সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।

—ব্রহ্মই সমুদায় জগতের আধার মূর্ত্তি।

কালও ভগবানের মূর্ত্তি :—

কাল শব্দের আভিধানিক অর্থ :—জন্তানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।

—কাল সমুদায় জাত বস্তুর জনক এবং নিখিল জগতের আশ্রয়।

অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

—আদ্যন্তহীন কাল, রুদ্র, সঙ্কর্ষণ নামে পরিচিত। সমুদায় ভূতের কলন-হেতু ইহার নাম কাল।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান হইতে উপরের শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে আমরা পাইলাম, যে কাল, সমুদায় জন্যবস্তুর জনক, আদ্যন্তহীন, রুদ্র, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি নামে পরিচিত, এবং সমুদায় ভূতের কলন করেন বলিয়া কাল নামে খ্যাত। সুতরাং দর্শকের বা সাধকের বিশেষ লক্ষ্যস্থান হইতে দর্শনে, উপাস্য ভগবান্ বা ব্রহ্মই উক্ত বিশেষভাবে অনুভূত হন।

উপসংহার :—

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে দেশ ও কালতত্ত্ব ভগবান্ হইতে পৃথক্ তত্ত্বান্তর নহে। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্রহ্ম বা ভগবান্ হইতে তত্ত্বান্তর নহে। দেশ-কাল তত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং দেশ-কালতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের বিভিন্নভাবে দর্শন মাত্র। ব্রহ্ম বা ভগবান্ দেশ-কাল তত্ত্বের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। পুরুষসূক্তের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ঋগ্বেদ ১০।৯০

—পরমতত্ত্বের একপাদে, বিশ্ব এবং ভূতগণ এবং অপর তিন পাদ প্রপঞ্চের বাহিরে অমৃতলোকে বর্ত্তমান।

অবশ্যই ব্রহ্মে পাদ, অংশ প্রভৃতি কল্পনা ঔপচারিক মাত্র বুঝিতে হইবে।

দেশ যেমন ভগবানের আধার মূর্ত্তি, কাল তাঁহার চেষ্টা মূর্ত্তি, প্রকৃতির গুণক্ষোভ ও পরিণাম সংঘটনের নিমিত্তকারণ কাল। দেশ—জগতত্ত্ব সমুদায়ের আধার, দেশের আশ্রয়ে সমুদায় অবস্থান করে। দেশ ও কালের নিত্য সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে কালকে অখিলাশ্রয় বলিলেন :—

যোঽন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ॥
ভাগঃ ৩।২৯।৩৩

—অখিলের আশ্রয় এই কাল সমুদায়ের অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূত দ্বারাই ভূতসকলকে সংহার করেন। এই কাল ভগবান্ বিষ্ণুর সংজ্ঞা বিশেষ, তিনিই যজ্ঞের ফলদাতা এবং যে সকল পদার্থ অন্যকে বশীভূত করে, তাহাদিগেরও প্রভু।

ইহা ভগবানের উক্তি। ভগবান্ কালকে অখিলের আশ্রয় বলিলেন, দেশ—অখিলের আশ্রয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কালও অখিলের আশ্রয় বলায়, দেশ ও কাল—একই বস্তুর ভিন্ন ভাবে দর্শনে ভিন্ন নাম মাত্র ইহা বুঝা গেল। উদ্ধৃত শ্লোকে কালকে "অধিযজ্ঞ" বলা হইয়াছে—"অধিযজ্ঞ" পদের অর্থ গীতার ৮।৪ শ্লোকে ব্যবহৃত উক্ত পদের অর্থ হইতে অভিন্ন—অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক এবং তাহাদিগের ফলদাতা—এই সমবায়ী অর্থ বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য—যে "যজ্ঞ" শব্দ সমুদায় কর্ম্মের উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ কি কৃষ্যাদি বাহ্যিক কর্ম্ম, কি আদান, গমন প্রভৃতি শারীরিক চেষ্টা, কি সুচিন্তা, কুচিন্তাদি মানসিক কর্ম্ম—কাল সমুদায়ের প্রবর্ত্তক, সমুদায়ের ফলদাতা, এবং সমুদায়ের উপর অধিষ্ঠাতারূপে বর্ত্তমান, ইহা বুঝা গেল। ঋতু পরিবর্ত্তন, বৃক্ষলতাদির পত্র-পুষ্প-ফল উদ্গম, উহাদের বৃদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় কালদ্বারা সংঘটিত, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীবতত্ত্ব।

জগতস্থ পঞ্চভূতাত্মক যে কোনও বস্তুতে সদ্রূপী-চৈতন্য জীবাত্মারূপে বর্ত্তমান :—

মায়াতত্ত্ব আলোচনায় (৫১ পৃষ্ঠায়) কথিত হইয়াছে. যে ব্রহ্ম পিতৃ-মাতৃ শক্তিরূপে, পুরুষ-প্রকৃতিরূপে, ভোক্তা-ভোগ্যরূপে অগ্নি-সোমরূপে, এবং জড়-বিজ্ঞানের ভাষায় যোগাত্মক-ঋণাত্মক-তড়িৎশক্তিরূপে, জগৎ ও তদন্তর্গত বস্তু জাতের অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ।।' ছান্দোগ্য ৬৷৩৷২

—সৎস্বরূপ সেই দেবতা আলোচনা বা সংকল্প করিলেন, যে আমি ক্ষিতি-অপ্-তেজাত্মক তিন দেবতায় জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিব।

স্মরণ রাখিতে হইবে, যে ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ পঞ্চভূতের উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিমন্ত্র হইতে আমরা বুঝিলাম, যে জগতস্থ পঞ্চভূতাত্মক যে কোনও বস্তুতে সদ্রূপী চৈতন্য জীবাত্মারূপে বর্ত্তমান। কোথাও অনভিব্যক্ত, কোথাও অল্প অভিব্যক্ত, কোথাও তদপেক্ষা অধিক অভিব্যক্ত এবং কোথাও সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। উপাধির স্বচ্ছতার ইতর বিশেষের উপর চৈতন্যের অভিব্যক্তির ইতর বিশেষ নির্ভর করে। প্রত্যক্ষতঃ আমরা দেখিতে পাই, একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ, কোন প্রস্তর বা মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরে বন্ধ করিয়া রাখিলে, বাহিরে উহার আলোকের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু উক্ত দীপ, কোন কাচ পাত্রে বন্ধ করিলে, বাহিরে তাহার আলোক উপলব্ধ হয়; যদি কাচ পাত্রটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়, তবে বাহিরে আলোকের অভিব্যক্তি উজ্জ্বল হইয়া থাকে, যদি উক্ত পাত্রটি লাল, নীল, সবুজ বা অন্য কোন রং'এর হয়, তবে আলোকের অভিব্যক্তিতে উক্ত বর্ণের রঞ্জনা দেখিতে পাওয়া যায়। কাচপাত্রটি মলাচ্ছন্ন হইয়া অস্বচ্ছ হইলে, আলোকের অভিব্যক্তি মলিন, অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল হয়। সেইরূপ উপাধির স্বচ্ছতার ও মলিনতার উপর, জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার অভিব্যক্তির আধিক্য বা অল্পতা নির্ভর করে।

উপাধি—দেহ, তাহাতে উপহিত চৈতন্য—দেহী :—

এই উপাধিই জীবের দেহ; এবং যাহা, এই দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া, অথবা অন্যকথায়, এই উপাধিতে উপহিত হইয়া, ইহাকে ধারণ, পোষণ, বর্দ্ধন করে, ইহাকে অনুপ্রাণিত করে, ব্যবহারিক ব্যাপারে পরিচালিত করে—তাহাই দেহী বা আত্মা।

জঙ্গম দেহে তাহাই জীব নামে বাচ্য। স্থাবর দেহে—চৈতন্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না থাকায়, এবং প্রাণের ব্যাপার পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া—সৎস্বরূপ উহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিলেও, তাহা জীবপদবাচ্য নহে। একখণ্ড প্রস্তর দৃশ্যতঃ অচেতন, জড়; কিন্তু শ্রুতির উল্লিখিত উক্তি অনুসারে, উহার অভ্যন্তরে সৎস্বরূপ চৈতন্য বর্ত্তমান থাকিয়া উহাকে উক্ত আকারে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু উহাতে সম্পূর্ণ অনভিব্যক্ত,—বাহ্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। উক্ত সৎস্বরূপ চৈতন্য একটি শম্বুকে—উহা অপেক্ষা অধিকতর অভিব্যক্ত, একজন মনুষ্যে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক অভিব্যক্ত। মনুষ্যগণের মধ্যে অভিব্যক্তির অসংখ্য স্তর বিদ্যমান। একজন আন্দামান দ্বীপের—বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীর সহিত ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের তুলনা করিলে—অভিব্যক্তির কত ন্যূনাধিক্য। একজন পূর্ণাভিব্যক্তির শিখরদেশে অবস্থান করিয়া জগতের চক্ষে মানব হইতে দেবত্বে পরিণতির দৃষ্টান্ত স্বরূপে দণ্ডায়মান; আর অন্যজন ক্রমবিকাশের নিম্নতম ধাপে অবস্থান করিয়া পশু হইতে মানবাভিব্যক্তির নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান। যাহা হউক, আমরা বুঝিলাম, যে চৈতন্য জাগতিক সমুদায় পদার্থে বিদ্যমান—অথবা বিদ্যমান বলি কেন,—উপরে ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্ব আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে, যে যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা চৈতন্য হইতে তত্ত্বান্তর নহে। ভগবানের সংকল্পেই—চৈতন্য ঐরূপে প্রতিভাসমান মাত্র। সর্ব্বত্রই চৈতন্যের খেলা, চৈতন্যের বিকাশ—মাত্রার আধিক্য ও অল্পতা হেতু, ভিন্নভাবে প্রতীতি মাত্র। ইহার আলোচনা ১।৩।৪১ সূত্র প্রসঙ্গে সংক্ষেপে করা হইয়াছে।

উপাধির বিপুল কার্য্যকারিকা শক্তির দৃষ্টান্ত:—

উপাধি দৃশ্যতঃ অচেতন ও জড় এবং উহা চৈতন্যের সাহায্যে কার্য্যশীল হইলেও, আমরা জাগতিক দৃষ্টান্ত হইতে উপাধির বিপুল কার্য্যকারিকা শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। আমরা জানি, যে জলাশয় পৃষ্ঠ হইতে জলীয় বাষ্প আমাদের অজ্ঞাতসারে দিবারাত্র উত্থিত হইতেছে। বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্পে পরিব্যাপ্ত, অথচ তাহা—মেঘ, তুষার, কুজ্ঝটিকা প্রভৃতির আকারে আকারিত না হইলে, আমরা উহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। উক্ত বাষ্প আমরা নানা প্রকার যন্ত্ররূপ উপাধির মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া নানা প্রকার কার্য্য সংসাধিত করি। উক্ত বাষ্প ইক্‌মিক্ কুকার (Icmic Cooker) নামক ক্ষুদ্র উপাধিতে উপহিত হইয়া রন্ধন কার্য্য সমাধা করে। তদপেক্ষা বৃহত্তর জলোত্তলন পাম্পরূপ উপাধিতে উপহিত হইয়া—বৃহৎ জলাশয় হইতে জল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া নগরে গৃহে গৃহে জলাভাব পূরণের কারণ হয়। রেলগাড়ি বা জাহাজের এঞ্জিনরূপ উপাধিতে উপহিত হইয়া,—সহস্র সহস্র আরোহী ও লক্ষ লক্ষ মণ মাল লইয়া সুদূরে গমনাগমনের সুবিধা প্রদান করে। বস্ত্র বয়নের কলরূপ উপাধিতে উপহিত হইয়া সহস্র সহস্র নারী পুরুষের লজ্জা নিবারণ করে। জাহাজ নির্ম্মাণাঙ্গনে বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্র গমন

সহজসাধ্য করে। উহাদের সকলের পরিচালক শক্তি জলীয় বাষ্প ভিন্ন কিছুই নহে। সেইরূপ চৈতন্য সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। আমরা চৈতন্য সাগরে নিমজ্জিত। আমাদের উপরে, নীচে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে সর্ব্বত্র আত্মচৈতন্য বিদ্যমান। ছান্দোগ্য শ্রুতি ৭।২৫।১ মন্ত্রে ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। আত্মচৈতন্য সর্ব্বব্যাপী হইলেও সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের উপলব্ধি গোচর হয় না—ইহা বিশেষ বিশেষ উপাধিতে উপহিত হইলে তবে আমাদের উপলব্ধি গোচর হয়। আমাদের দেহরূপ উপাধিতে উপহিত আত্মচৈতন্যই আমাদের আমিত্ব—আমরা এই আমিত্বে প্রকটিত হইয়া সংসার ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকি। বিশ্বযন্ত্রী এই একই আত্মচৈতন্য বিভিন্ন উপাধিরূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া জগদ্ব্যাপার সংসাধন করিয়া থাকেন। অতি মহত্তম উপাধিতে উপহিত এই আত্মচৈতন্য—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপে প্রকটিত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার বিধান করেন। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথচ মহত্তর উপাধিতে উপহিত একই আত্মচৈতন্য—সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি লোকপালরূপে বিশ্ব ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত। সেই একই আত্মচৈতন্য—যোগী-মুনি-ঋষি প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর দেবোপম মনুষ্য হইতে অতি অসভ্যাবস্থায় নগ্ন, বন্য পশু অপেক্ষাং ঈষৎ উন্নত শ্রেণীর মনুষ্যরূপে, ইতর জীব, উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, দৃশ্যত: অচেতন প্রস্তরাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া, একের বহু হইবার সংকল্প সিদ্ধ করে এবং ব্রহ্মতত্ত্বে উল্লিখিত ভগবানের ক্রীড়ার সাধক ও শাসক নিয়মাবলীর সার্থকতা ও অপরিহার্য্যতা ঘোষণা করে। আত্মচৈতন্য বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত সমুদায় পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে তত্তদাকারে প্রকটিত করত কার্য্যশীল করিলেও, এবং বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতিতে ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রভৃতি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে কার্য্যকারী বিশ্বজনীন সত্য হইলেও, শাস্ত্র সকল মানবদেহধারী জীবগণের জন্য অভিপ্রেত। শাস্ ধাতু হইতে শাস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন। শাস্ ধাতুর অর্থ শাসন করা অর্থাৎ বিধিনিষেধ প্রভৃতি সংস্থাপন করিযা মানব উপাধি বা দেহধারী জীবগণের দৈনন্দিন কার্য্য প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করা। এই নিয়মপ্রণালীর অনুগত হইয়া চলিলে মানব ক্রমোন্নতি পথে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইতে থাকে, উহা মানিয়া না চলিলে, নানাপ্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথ বিঘ্নসঙ্কুল ও দুর্গম করে। আমরা ব্রহ্মসূত্র আলোচনায় নিযুক্ত। ব্রহ্মসূত্র মানবের জন্যই প্রণীত। মানবদেহধারী জীবের স্বরূপ কি? স্বরূপাবরণ কাহার দ্বারা সংঘটিত, এবং কি প্রকার সাধনায় উক্ত আবরণ অপসারিত হইয়া স্বরূপাভিব্যক্তি প্রকটিত কে—ইত্যাদি বিচার ও সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রে সংস্থাপিত। একারণ আমাদের আলোচনা অতঃপর মানবদেহধারী জীবগণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে।

জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব :—

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে আমার জীবত্ব এবং বর্ত্তমান ব্যক্তিত্ব বা আমার বর্ত্তমান মানবদেহে অভিব্যক্তি—একই বস্তু নহে। আমার বর্ত্তমান দেহে

মানবরূপে অভিব্যক্তি বর্ত্তমান জন্মে হইয়াছে। কিন্তু আমার জীবত্বের আরম্ভ—বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ হইতে। তখন হইতে আমার জীবত্ব, প্রস্তরাদি স্থাবররূপ হইতে আরম্ভ করিয়া উপাধির ক্রম পরিণামে কখনও উদ্ভিদ, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ, কখনও নিকৃষ্ট পশু প্রভৃতির ভিতর দিয়া বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণকুলে মানবদেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ জন্মের মৃত্যুতে আমার মানবদেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, ইহাকে মানবের ভাষায় মৃত্যু বলা হইয়া থাকে। ইহা কোন বিশেষ উপাধির ধ্বংস মাত্র। এই প্রকার আমার জীবত্বের উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কত লক্ষ লক্ষ উপাধির নাশ হইয়াছে। কিন্তু আমার জীবত্ব বরাবর বর্ত্তমান আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উপহিত হইয়া ক্রমশঃ উপাধির স্বচ্ছতা বশতঃ আত্মপ্রকাশ, মলিনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে করিতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। অন্য কথায় আত্ম-সংবেদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান স্তরে পৌছিয়াছে। এখনও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সম্পূর্ণতা পাইলেই জীবত্ব হইতে মুক্তি বা স্বরূপ অভিব্যক্তি অথবা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ জ্ঞান। মানব জীবনে সাধনা দ্বারা এই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়। অন্য উপাধিতে উপহিত জীব সাধনার অধিকারী নহে—সুতরাং মুক্তিলাভে সক্ষম নহে। জীবত্ব পরিহার করিতে হইলে মানব জন্মলাভ এবং সাধনার প্রয়োজন। একারণ শাস্ত্র মানবদেহধারী জীবের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। জীবত্ব যে উপাধি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বলাই বাহুল্য। উপাধি জীবত্বের স্বরূপাভিব্যক্তির আবরক। এখন জীবের স্বরূপ কি ইহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য।

জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব উভয়েই অহং প্রত্যয়ের পরিচয়ে পরিচিত :—

জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব যে এক বস্তু নহে, তাহা বুঝিলাম। এক অপরিণামী জীবত্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিণামী ব্যক্তিত্বের প্রকটন, তাহাও বুঝিলাম। স্থির, নীরব, নিথর, প্রশান্ত সমুদ্রের উপর তরঙ্গ লীলার, বীচি-বিক্ষোভের নিদর্শন। কখনও উত্তাল তরঙ্গের তাণ্ডবনৃত্য, কখন বা ধীর মন্থর হিল্লোলের মধুর লীলার অভিনয়। অপরিণামী জীবত্বের উপর কখনও বা তীব্র রজোগুণাত্মক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি, কখনও বা ধীর প্রশান্ত সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিত্বের প্রাণারাম মধুর আত্মপ্রকাশ। জীবত্ব ও ব্যক্তিত্ব এক বস্তু না হইলেও উভয়েই অহং প্রত্যয়ের পরিচয়ে পরিচিত। মানবদেহধারী আমি যখন আমার দেহ, আমার গৃহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পিতা, আমার মাতা প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিই, তখন আমি আমার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিই এবং সেই ব্যক্তিত্বের সহিত দেহ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির বর্ত্তমান যে সম্বন্ধ, তাহার পরিচয়ই প্রদান করি। আমার এই জন্মের পূর্ব্ব জন্মের ব্যক্তিত্বে উহারা যে আমার সহিত একই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল, তাহা নহে। সুতরাং আমার ব্যক্তিত্ব এবং তাহার সহিত উক্ত সম্বন্ধ সকল যে পরিণামী, পরিবর্ত্তনশীল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিত্বের সহিত জড়িত এবং তদ্দ্বারা পরিচিত যে আমি তাহা আমার পরিণামী "আমি"—পরমহংসদেব ইহাকে "কাঁচা আমি" বলিয়া অভিহিত

করিয়াছেন। ইহা অবিদ্যার আমি। অন্য কথায় বিশ্ব-ক্রীড়নকের ক্রীড়া সৃষ্টি পরিচালনের জন্য প্রবর্ত্তিত সাধক নিয়মের অপব্যবহার করায়, যে ক্রীড়ক শাসক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার সেই প্রায়শ্চিত্তকারী, সংসারের উত্থান পতনে জড়িত এবং তদন্তর্গত সুখদুঃখে নিমগ্ন, অনুতপ্ত "আমি"। আর আমার জীবস্বরূপ যে অপরিণামী, শাশ্বত আমি, যাহা ভগবানের বিশ্বক্রীড়ার সহায়, তাহা পরমহংসদেবের ভাষায় "পাকা আমি"। শাসক নিয়ম সকলের পরিচালনে উদ্ভূত উপাধি সকল আবরণ সৃষ্টি করিয়া এই "পাকা আমি" কে আবৃত করিয়া "কাঁচা আমি" তে পরিণত করে। এই "পাকা আমি"র স্বরূপই আমাদের আলোচ্য, এবং ভগবানের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, শাস্ত্রকারগণ তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

"অহং" জ্ঞানের সহিত "ত্বং" জ্ঞান জড়িত :—

উপরে যে আমিত্বের বা অহং প্রত্যয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত গভীর তত্ত্ব অপরিহার্য্যভাবে জড়িত। "অহং" জ্ঞানের সহিত "ত্বং" জ্ঞান—সংজড়িত। একের অস্তিত্ব ও প্রতীতি অপরের অস্তিত্ব ও প্রতীতির উপর নির্ভর করে। যদি "অহং" না থাকে, তাহা হইলে "ত্বং" ও থাকে না, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অহং জ্ঞানের লোপ হইলে ত্বং জ্ঞানেরও প্রতীতি থাকে না। অহং ও ত্বং মিশিয়া কি থাকে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাঁহাদের অপরোক্ষানুভূতি হইয়াছে, তাঁহারাও ইহা প্রকাশ করিতে পারেন না। যা থাকে, তাই থাকে। যদি বল ব্রহ্ম থাকেন, বেশ, তাহাতে আপত্তি নাই। সে কারণ ব্রহ্ম "অবাঙ্‌মনসোগোচর" বলা হইয়া থাকে। সেই একই কারণে ব্রহ্মকে ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনাম 'তৎ' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিবার প্রয়াস করা হইয়া থাকে। এখন 'অহং' এর সহিত 'তৎ' এর সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

চারিটি মহাবাক্য। উহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যভাব জ্ঞাপক :—

উপনিষদ্ আলোচনায় আমরা চারিটি মহাবাক্যের সন্ধান পাই। সমুদায় উপদেশের সার, সমুদায় সাধনার সিদ্ধিরূপ ফল, ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে "মহাবাক্য" বলে। সেগুলি এই :—(১) "ওঁম্ তত্ত্বমসি" (ছান্দোগ্য ৬।৮।৭), (২) "ওঁম্ অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০) (৩) "ওঁম্ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ ৩।৩), (৪) "ওঁম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডূক্য ১।২); শুকরহস্যোপনিষদে ইহাদের বিবৃতি আছে, ইহারা সকলেই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যভাব জ্ঞাপক। ইহাদের বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত ঐ সকল উপনিষদ্ ভাষ্যে নানা প্রকার বিচার অবতারণা করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাহাদের অতি সংক্ষেপ আলোচনাও প্রবন্ধের কলেবর অত্যধিক বৃদ্ধি করিবে। একারণ উহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীমদ্ ভাগবতও উক্ত জীব-ব্রহ্মৈক্য তত্ত্বের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন :—

অহং ভবান্ নচান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি॥ ভাগ : ৪।২৮।৫৫

—পরমাত্মা জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—ওহে! আমিও যে, তুমিও সে, তুমিও যে, আমিও সে, আমাদের পরস্পরের পার্থক্য নাই, ইহা বিশেষরূপে অনুধাবন কর। পণ্ডিতগণ তোমার ও আমার মধ্যে কখনও কিছুমাত্র অন্তর বা পৃথকত্ব দর্শন করেন না। ভাগ : ৪।২৮।৫৫

সুতরাং উপনিষদ্ ও ভাগবত উভয় হইতে আমরা পাইলাম, যে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান; উভয়ের মধ্যে স্বরূপতঃ কোনও প্রকার পার্থক্য নাই।

অন্যপক্ষে জীব-ব্রহ্মের পার্থক্যবোধক প্রমাণ ও সুপ্রচুর :—

আবার অন্যপক্ষে কি উপনিষদে, কি ভাগবতে, কি গীতায়, সমুদায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে, আমরা জীব-ব্রহ্মের পার্থক্য স্পষ্ট কথিত আছে, দেখিতে পাই। মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ শ্বেতাশ্বতর ৫।৯

ইহার অর্থ পূর্ব্বে প্রথম পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। (পৃঃ ৫)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ মুণ্ডক ৩।১।১

ইহার অর্থ মূল গ্রন্থে ১।৩।৭ সূত্রের শিরোদেশে (পৃঃ ৫৭৪) দেওয়া হইয়াছে।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা বুচ্চরন্ত্যেবম্ এবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবা সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। বৃহদারণ্যক ২।১।২০

—উর্ণনাভি যেমন স্বশরীরোৎপন্ন সূত্র দ্বারা উর্দ্ধে যায়, অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমুদায় ইন্দ্রিয়বর্গ, সমস্ত লোক বা ভোগ স্থান স্বর্গাদি, সমস্ত দেবতা—ইন্দ্রিয় ও ভোগস্থানের অধিপতিগণ, এবং সমস্ত ভূত (প্রাণিগণ) নানাকারে, দেবতির্য্যগ্-মনুষ্যাদিরূপে উত্থিত হয়।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥
কঠ, ১।৩।১

—যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্, যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যানিষ্ঠ, যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন বা আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে সংসারে স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং বুদ্ধিরূপ গুহায় উত্তম ব্রহ্মপাসের যোগ্য হৃদয়াকাশে অবস্থিত বা অভিব্যক্ত (জীব ও পরমাত্মা) ছায়া ও আতপের ন্যায়—অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব সম্পন্ন।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। (ছান্দোগ্য ৮।১২।২)

—সম্প্রসাদ সংজ্ঞক জীব এই প্রকারে এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিকরূপে অভিব্যক্ত হয়।

শ্রীমদ্ ভাগবত বলিতেছেন :—

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥
ভাগবত ১১।১১।৬

ইহার অর্থ মূল গ্রন্থে ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৩৩) দেওয়া হইয়াছে।

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে। ভাগবত ১১।১১।৪
••••••···ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ॥ ভাগবত ১২।৪।৩১

ইহাদের অর্থ মূল গ্রন্থে ১।১।১৭ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৩০) দেওয়া হইয়াছে।
গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গীতা ১৫।৭

—জীবলোকে সংসার ভোগের জন্য আমরাই অংশভূত সনাতন জীব।

জীব-ব্রহ্মের একতা ও পার্থক্যের সমাধান :—

উপরের প্রকরণদ্বয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে জীবকে প্রথমে পরমাত্মার সহিত অপৃথক্, ও পরে তাঁহার অংশ বলিয়া তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই উভয়ের সমাধান কি প্রকারে সম্ভব? পূজ্যপাদ সূত্রকার "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" ২।৩।১৮ সূত্রে, জীবাত্মার উৎপত্তি নাই, নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই নিত্যবস্তু যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হয়, তবে ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ-কারণ হইলেন না, এবং বিভিন্ন শ্রুতিতে স্পষ্ট ভাবে কথিত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হয়। ইহা পূর্ব্বে "অজা" মন্ত্রের আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত "অজা" মন্ত্রে জীব "অজ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—"অজ" অর্থ জন্মরহিত অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত—নিত্য। সুতরাং যে যুক্তিতে "অজা" ব্রহ্মশক্তি

বলিয়া সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই একই যুক্তির বলে "অজ" বা জীব ও ব্রহ্মশক্তি—এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৩।২ মন্ত্র ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় ২২ পৃষ্ঠা হইতে আমরা বুঝিয়াছি, যে ব্রহ্ম শক্তি বিকাশে ভোক্তৃরূপে প্রকটিত হইয়া, আপনারই শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত ভোগ্য সমূহ উপভোগ করেন। ইহাতেই পরস্পর পরস্পরের সার্থকতা সম্পাদন করে—ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য—ইহা দ্বারা আত্মসংবেদন সংঘটিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, যে জীবাত্মাই ভোক্তৃরূপে প্রকটিত ব্রহ্ম এবং বিশ্ব ও তদন্তর্গত বিষয় সমূহ ভোগ্যরূপে প্রকটিত ব্রহ্ম—আর উভয়ের পৃথক্‌ভাবে প্রতীতি—ব্রহ্মেরই সংকল্প প্রভাবে সংঘটিত।

জীবাভিব্যক্তিকারিণী শক্তির স্বরূপ :—

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে ব্রহ্মের শক্তি বিকাশে বিশ্ব অভিব্যক্ত এবং শক্তি সঙ্কোচে উহা অনভিব্যক্ত—বিকাশ ও সঙ্কোচের অন্তরালবর্ত্তী অবকাশ সময়ে, উহা ব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান, অন্যকথায় ১।১।২ সূত্রের ভাষায় বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয় আছে। জীবের অভিব্যক্তিও ব্রহ্মের শক্তি বিকাশে এবং অনভিব্যক্তিও শক্তি সঙ্কোচে বটে, কিন্তু জীব, অজ, উৎপত্তি রহিত, নিত্য—সুতরাং নাশ রহিত। গীতায় ২।২০ শ্লোকে ভগবান্, জীব, অজ, নিত্য, শাশ্বত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত হয়, যে ব্রহ্মের যে শক্তি বিকাশে বিশ্ব এবং তদন্তর্ভুক্ত বস্তুজাত অভিব্যক্ত, জীবের অভিব্যক্তি ঠিক সে শক্তি বিকাশে নহে। তবে সে জীবাভিব্যক্তিকারিণী শক্তির স্বরূপ কি? জীবের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়া ভগবান সূত্রকার বলিলেন—জীব জ্ঞাতা বটে "জ্ঞোঽত এব" ২।৩।১৯, জীব—অণু-পরিমাণ—অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম,—"উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্" ২।৩।২০, জীব কর্ত্তাও বটে "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ২।৩।৩৩। সুতরাং উক্ত সূত্র সমুদায়ে জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, চিন্ময়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ সমুদায় চৈতন্যের বিশেষ ধর্ম্ম; ব্যবহারিক-ভাবে জীবনামধারী বস্তুজাতে ইহারা বর্ত্তমান। ব্যবহারিক জড়বস্তুজাতে ইহারা বর্ত্তমান নাই। সুতরাং জীবশক্তি অর্থাৎ যে শক্তি বিকাশে ভোক্তা, জ্ঞাতা, কর্ত্তা, জীব অভিব্যক্ত হয়, সে শক্তি—বিশ্বশক্তি অর্থাৎ বিশ্বের ভোগ্য, জ্ঞেয় বিষয় প্রভৃতির কারণীভূত শক্তি হইতে অধিক নিকটতর, ঘনিষ্ঠ। একারণ আচার্য্যগণ বিশ্বের অভিব্যক্তিকারিণী শক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীবাভিব্যক্তিকারিণী শক্তিকে তটস্থা শক্তি নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উভয়েই ভগবানের শক্তি, এবং শক্তি শক্তিমান্ হইতে অপৃথক্, বলিয়া উভয়ে ভগবান্ হইতে অপৃথক্, তথাপি ব্যবহারিক সুবিধার জন্য এবং আমাদের স্বভাবতঃ বিশ্লেষণ কারিণী বুদ্ধির ধারণা সৌকর্য্যার্থে একই ভাগবতী শক্তিকে বহিরঙ্গা ও তটস্থা নামে বিভক্ত করা হইয়াছে মাত্র। গীতায় ৭।৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ও এই উভয় শক্তিকে অপরা ও পরা শক্তি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, যে ব্রহ্ম সমকালে শূন্য-পূর্ণাত্মক,

নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, তাঁহার অন্তর বাহির, নিকট দূর, অপর পর নাই। যিনি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাতে নিকট দূর, ভিতর বাহির, পর অপর প্রযোজ্য কি প্রকারে হইবে? উপরোক্ত বিভেদ স্বধু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের সুবিধার জন্য।

জীবাভিব্যক্তিকারিণী শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলে কেন?:—

জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে কেন, তাহা আমরা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারি। ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় যে লীলা বা খেলার কথা বলা হইয়াছে, তাহা একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে খেলায় সহযোগী বা প্রতিযোগীগণ যদি আপনা অপেক্ষা নিতান্তই হীন হয়, তবে খেলায় বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব থাকে না। ঠিক নিজের মত না হউক, অন্ততঃ নিজের কাছাকাছি হইলেও খেলায় বৈচিত্র্য, মনোহারিত্ব বর্ত্তমান থাকে। এজন্য ভগবান্ নিজের স্বরূপ শক্তির সন্নিকটস্থ শক্তিকে বিকাশ করিয়া জীবরূপে প্রকটিত করিলেন। এই সন্নিকটস্থ শক্তি শাস্ত্রে তটস্থা শক্তি বলিয়া কথিত। ইহা নারদপঞ্চরাত্রে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ আছে। যথা:—

> যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্।
> রঞ্জিতং গুণরাগেন স জীব ইতি কথ্যতে॥
>
> —শ্রীমদ্ ভাগবতের ১০।৮৭।১৬ শ্লোকে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকায় উদ্ধৃত। ভগবানের নিজের স্বরূপভূত সংবিৎ হইতে বিনির্গত চিন্ময় তটস্থা শক্তি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণরাগে রঞ্জিত হইয়া জীবনামে উক্ত হয়।

এই গুণরাগে রঞ্জন—জীবের উপাধিতে অধ্যাস—বা অহং ও মম জ্ঞান। ইহাই জীবের স্বরূপ আবরণ করিয়া রাখে। ২।১।২৩ সূত্রে ইহার সংক্ষেপ আলোচনা করা হইয়াছে। এই আবরণ অপসারণ করার নামই মুক্তি। উপাসনা দ্বারা আবরণ অপসারিত হইয়া থাকে। ইহার আলোচনা পরে করা যাইবে।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ:—

উপরের আলোচনা হইতে আমরা পাইলাম, যে জীব, ব্রহ্ম বা ভগবানের তটস্থা শক্তি। শক্তি-শক্তিমান্ হইতে অভেদ, একারণ জীব—ব্রহ্ম হইতে অভেদ। আবার অন্যপক্ষে কোনও বিশেষ শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন হইলেও, শক্তিমান্, শক্তি নহেন, সুতরাং জীব, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম, জীব হইতে ভিন্ন এবং তাহা হইতে অধিক। ইহা ভগবান সূত্রকার "অধিকন্তু ভেদব্যপদেশাৎ" ২।১।২৩ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে উপরে উদ্ধৃত ভেদ ও অভেদ জ্ঞাপক শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ সমুদায়ের সামঞ্জস্য পরিরক্ষিত হইতেছে। শক্তি—শক্তিমানে কখনও অভিব্যক্ত-ভাবে এবং কখনও অনভিব্যক্তভাবে চির বর্ত্তমান বলিয়া, গীতায় ১৩.১৯ শ্লোকে কথিত "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি," সিদ্ধ হইতেছে। মুক্তাবস্থায় জীবের স্বরূপ,

ভগবদ্‌স্বরূপে তাদাত্ম্যভাবে বর্ত্তমান থাকাও সিদ্ধ হইতেছে। এই যে অভেদে—ভেদ প্রতীতি এবং ভেদে—অভেদ প্রতীতি, ইহাকে আচার্য্যগণ "ভেদাভেদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এবং এই প্রকার প্রতীতি কেন হয় এবং তাহার স্বরূপ কি—ইহা মানবচিন্তার অতীত বলিয়া ইহাকে "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ" বলা হয়। ইহার সংক্ষেপ আলোচনা মূলগ্রন্থে ৪।১।৩ ও ৪।৪।৪ সূত্র প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। এখানে আর বিস্তার করিলাম না।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধে ভগবান সূত্রকারের অভিপ্রায় :—

ভগবান সূত্রকার "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" ১।১।১৭, "ভেদব্যপদেশাচ্চ" ১।১।১৮, "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" ১।১।২২, "ভেদব্যপদেশাৎ" ১।৩।৫, "অনুকৃতেস্তস্য চ" ১।৩।২২, "অধিকন্তু ভেদব্যপদেশাৎ" ২।১।২৩, "অংশো নানাব্যপদেশাৎ..........." ২।৩।৪৩, "প্রকাশাদিবত্তৈনবং পরঃ" ২।৩।৪৬ প্রভৃতি সূত্রে জীব ব্রহ্মে ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। মুক্তিলাভে জীবের উপাধির আবরণ অপসারিত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্তি হইলেও, ভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাঁহার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য "জগদ্‌ব্যাপার-বর্জ্জম...ইত্যাদি" ৪।৪।১৭ সূত্র প্রণয়ণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিযাছেন যে মুক্তিতে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভেদ অনুভব করিলেও ("অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" ৪।৪।৪ সূত্র) সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক জগদ্‌ব্যাপারে মুক্তাত্মার কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। এই সমুদায় সূত্রালোচনায় সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, যে মুক্তাবস্থায় জীবের ঐকান্তিক লয় হয় না, অভেদে—ভেদ বা ভেদে—অভেদ বর্ত্তমান থাকে, ইহাই প্রকাশ করা ভগবান সূত্রকারের অভিপ্রায়।

শঙ্কর মত উল্লেখ :—

ভগবান শঙ্করাচার্য্য উক্ত ৪।৪।১৭ সূত্র সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য এবং ৪।৪।৪ সূত্র নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের লব্ধব্য একত্ব প্রাপ্তি, এবং উক্ত একত্ব প্রাপ্তিতে পরব্রহ্ম স্বরূপে জীব-স্বরূপের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি, ইহা ভগবান সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন? কিন্তু ব্রহ্মসূত্র, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া গেলে, কোথাও নির্গুণ-সগুণের ভেদ প্রতিপাদক কোনও প্রকার সঙ্কেত বা ইঙ্গিত পাওয়া যায না। অন্যপক্ষে ১।১।১ সূত্রে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ সূত্রকার উহার অব্যবহিত পরেই ১।১।২ সূত্রে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সগুণ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপসংহারে ৪।৪।১৭ সূত্র প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে জগদ্‌ব্যাপার ব্রহ্মেরই স্বকীয়। মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে "উভয়লিঙ্গাধিকরণে" ও "অহিকুণ্ডলাধিকরণে' ৩।২।১১ হইতে ৩।২।৩০ সূত্র প্রণয়ন করিয়া প্রতিপাদন করিলেন যে, নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ ভাব, নির্গুণ-সগুণ ভাব ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভেদ। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের উপক্রম বা আদি, উপসংহার বা অন্ত এবং মধ্য কোথাও ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ ভাবের ভেদ উল্লেখ নাই। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক-

গণের মন্তব্য এক প্রকার এবং সগুণোপাসকগণের—অন্য প্রকার ইহা প্রতিপাদন করা ভগবান সূত্রকারের অভিপ্রায়ের বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। যদি উভয়ের ভেদ প্রতিপাদন করা ভগবান সূত্রকারের উদ্দেশ্য হইত, তবে সেই উদ্দেশ্য সম্পূরণের জন্য একটি সূত্র প্রণয়ন করিলেই ত হইত। যাহা হউক, আশা করা যায়, যে মূল গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে বিষয়টি বিশদভাবে বুঝা যাইবে। প্রাপ্তি, সাধনার পার্থক্য অনুসারে পৃথক্ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা উপাসনাতত্ত্বে সংক্ষেপে করা যাইবে।

ব্রহ্মের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ ঃ—

উপরে বলা হইয়াছে, যে জীব ভগবানের খেলার সঙ্গী। খেলার সঙ্গী বালকগণের অথবা বালকগণের কেন, যাহারা খেলা করে কি বালক, কি বৃদ্ধ তাহাদের সকলের অতি প্রিয়—সুতরাং জীবও ভগবানের অতি প্রিয়, এত প্রিয়, যে ভাগবত বলেন, যে ভগবান কৌস্তভচ্ছলে জীবচৈতন্যকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন :—"কৌস্তভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ" ১২।১১।৮। স্বাত্মজ্যোতিঃ—শুদ্ধং জীবচৈতন্যং —শ্রীধর।

স্বাত্মজ্যোতিঃ পদে সমষ্টি জীবচৈতন্য বুঝিতে হইবে। এই স্বাত্মজ্যোতিঃ পদের লক্ষ্য কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সূর্য্যমণ্ডল আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ। সূর্য্যোদয় হইলে আমরা যে কেবল সূর্য্যমণ্ডল পরিদর্শন করি, তাহা নহে। উহার জ্যোতিঃ সূর্য্যমণ্ডলের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সূর্য্য হইতে তাহার জ্যোতিঃর পৃথকত্ব আমরা ধারণা করিতে পারি না—অথচ জ্যোতিঃ মাত্র সূর্য্যমণ্ডল নহে—উহা সূর্য্য হইতে পৃথক্। সেইরূপ শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মের নিত্যসম্বন্ধ। ব্রহ্ম হইতে উহার পৃথকত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি না—আবার ব্রহ্ম—শুদ্ধজীবচৈতন্য মাত্র নহেন। ব্রহ্মের সহিত শুদ্ধজীবচৈতন্যের নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া, ব্রহ্ম যেমন অজ, নিত্য ও শাশ্বত—জীবও তদ্রূপ "অজ নিত্য ও শাশ্বত" তথাপি জীব ব্রহ্ম নহে। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ গ্রহণ করিলে সর্ব্বথা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সহাবস্থান ঃ—

জ্যোতিঃ থাকিলে যাহার জ্যোতিঃ তাহারও বিদ্যমানতা প্রয়োজন। অন্য কথায় জ্যোতিঃ ও জ্যোতিষ্মানের সহাবস্থান আবশ্যক। একারণ "দ্বাসুপর্ণাবেতৌ ..." মন্ত্রে দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষীরূপী জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহাবস্থানরূপ রূপকের উপযোগিতা। উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ, একের বিদ্যমানতা অপরের বিদ্যমানতার অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করে। দেহরথে জীবাত্মারূপ রথী ও পরমাত্মারূপী সারথির উল্লেখ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য বর্ণনার মূল ঐ এক স্থানে। গায়ত্রীমন্ত্রে "ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" মন্ত্রাংশেও আমরা ইহারই বিবৃতি দেখিতে পাই।

"তটস্থা" পদের লক্ষ্য :—

এখন তটস্থা পদের লক্ষ্য কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমাদের ভাষায় ইহার অর্থ নিকটস্থ। আমরা দেশ-কালাবচ্ছিন্ন প্রপঞ্চের অন্তর্গত জীব—দেশকালের ধারণা আমরা পরিহার করিতে পারি না, একারণ আমাদের কাছে দূর নিকট বর্ত্তমান। কিন্তু দূর নিকট ধারণা আপেক্ষিক মাত্র ইহা আমরা দেশ-কালতত্ত্ব আলোচনায় বুঝিয়াছি। আমার ধারণায় যাহা অতি নিকট, আমার অন্তরস্থ একটী রক্ত কণিকার কাছে, তাহা অতি দূরে। অথচ, আমি ও আমার অন্তরস্থ রক্তকণিকা উভয়ই জীবপদবাচ্য। আপেক্ষিকতা অন্য জীব পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু ভগবান ও শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সম্বন্ধ দেশ-কাল পরিচ্ছিন্ন নহে। উহা দেশকালে এবং দেশকালাতীত 'অবস্থায় সমভাবে বর্ত্তমান। শেষোক্ত অবস্থায় দেশকাল পরিচ্ছেদ বর্ত্তমান নাই। সুতরাং কি দেশকাল পরিচ্ছিন্ন অবস্থায়, কি দেশকালাতীত অবস্থায়, সর্ব্বাবস্থায়, "তটস্থা" পদের অর্থ সহাবস্থান—যত নিকট হওয়া সম্ভব, তত। "দ্বাসুপর্ণাবেষ্ঠৌ······" মন্ত্রে ইহাই প্রকাশ করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে ৩।৭।২২ "যো আত্মনি তিষ্ঠন্······" মন্ত্র এই সহাবস্থানের পরিচয় প্রদান করে। ছান্দোগ্য শ্রুতি ৬।৮।৪ "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সদ্প্রতিষ্ঠাঃ" মন্ত্রে এই নিত্য সহাবস্থান বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

উক্ত নিত্য সহাবস্থান গীতা সাহায্যে বুঝিবার প্রয়াস :—

ভগবান গীতায় এই নিত্য সহাবস্থান অতি সুন্দরভাবে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন।

> উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
> পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ গীঃ ১৩।২২

—জীবদেহে অবস্থিত পরমাত্মারূপী পুরুষ—উপদ্রষ্টা—নিকটে থাকিয়া সাক্ষী-রূপে সমুদায় ব্যাপার দর্শন করেন মাত্র, স্বয়ং কোনও ব্যাপারে ব্যাপৃত হন না; তিনি অনুমন্তা—তাঁহার অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকৃতির কোনও কার্য্য সম্পাদিত হয় না—সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার তাঁহারই অনুমোদনে সম্পাদিত হয়, কিন্তু তিনি অসক্ত, উদাসীন বলিয়া উহাতে লিপ্ত হন না; তিনি ভর্ত্তা—তিনি চৈতন্যময়—তাঁহারই চৈতন্যাভাসে জড় দেহ-ইন্দ্রিয়-মন প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া স্ব স্ব স্বরূপের অবধারণ করিতে সমর্থ হয়—উহাদিগকে তিনিই ভরণ করেন, এজন্য ভর্ত্তা;

> তিনি ভোক্তা এখানে ভোক্তা অর্থ কর্ম্মফল ভোক্তা নহে, "দ্বাসুপর্ণাবেতৌ" মন্ত্রে তিনি অভোক্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন—ভোক্তা অর্থে বুঝিতে হইবে যে চৈতন্যই আত্মার স্বভাব, সে কারণ বুদ্ধির সুখ দুঃখ মোহাত্মক সর্ব্ব বিষয়-প্রতীতি সকল, আত্মার নিজ চৈতন্যে—চৈতন্যগ্রস্ত করাইয়া প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে লক্ষ্য করিতে হইবে, যে "পর" পদ "পুরুষ" পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কেন? ইহা হইতে স্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা মনে উদিত হয়, যে কথিত দেহে অবস্থিত "পরপুরুষে"র সহিত একটি "অপর পুরুষ" ও অবস্থান করে। সেই অপর পুরুষই কর্ম্মফল ভোক্তা পক্ষী। এবং পর পুরুষই সাক্ষী স্বরূপ অভোক্তা পক্ষী। সুতরাং নিত্য সহাবস্থান কিরূপ সুন্দরভাবে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে, বুঝা গেল। এবং ইহা হইতে আরও বুঝা গেল, যে দেহে অবস্থিত পরপুরুষই—সহাবস্থিত অপর পুরুষের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, নিয়ন্তা, প্রকাশক। অন্য কথায় উক্ত গীতার শ্লোকে শক্তিমানের সহিত শক্তির নিত্য সম্বন্ধের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। এবং শক্তিমানই শক্তির পরিচালক, নিয়ন্তা, প্রকাশক—ইহা বুঝা গেল।

এই নিত্য সহাবস্থানের উপর ভিন্ন ভিন্ন বাদ প্রতিষ্ঠিত :—

এই নিত্য সহাবস্থানের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই অদ্বৈতবাদিগণ জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। জীব, যে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর নহে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তবে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ভেদাভেদবাদী আচার্য্যগণ শক্তিমানের সহিত শক্তির সহাবস্থানের ন্যায় এই সহাবস্থান বলেন, এবং সে কারণে জীব, ব্রহ্ম হইতে অভেদ হইলেও, ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক বলিয়া থাকেন। ভগবান সূত্রকারও ২।১।২৩ সূত্রে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা—একই ভাগবতী শক্তির বিভিন্ন নাম :—

সূর্য্যের জ্যোতিঃ সূর্য্যের কিরণকণার সমষ্টি ভিন্ন কিছুই নহে। উক্ত জ্যোতিঃ সূর্য্যের প্রকাশিকা শক্তির পরিচায়ক। পূর্ব্বালোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে প্রকাশ্য না থাকিলে প্রকাশিকা শক্তি প্রতীতি গোচর হয় না—অর্থাৎ কিরণকণা বা জ্যোতিঃ উহার স্বরূপ হইতে বিভিন্ন কোনও প্রকাশ্য বস্তুর উপর পড়িয়া তাহা হইতে প্রতিফলিত না হইলে আমরা জ্যোতিঃর বিদ্যমানতা অনুভব করিতে পারি না। এই দার্ষ্টান্তিক অনুভূতি, আমরা সমষ্টি জীবচৈতন্যরূপ, ভগবানের স্বরূপভূত আত্মার জ্যোতিঃতে প্রয়োগ করিলে, আমরা কি পাই দেখা যাউক। আমরা জানি ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই। তাঁহার স্বরূপ যাহা, আত্মাও তাহা, তাঁহার দেহও তাহা। সেই স্বরূপভূত আত্মার জ্যোতিঃ তাঁহা হইতে অপৃথক্ হইলেও তাঁহার স্বরূপ জ্যোতিঃ

হইতে পৃথক্। উক্ত জ্যোতিঃ বিম্বভূত তাঁহার স্বরূপাত্মক আত্মা হইতে বিচ্ছুরিত কিরণ সমষ্টি—এই কিরণ সমষ্টি হইতে কিরণকণা, উপরে নীচে, উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে দশদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইহারা কোনরূপ উপাধিতে পড়িয়া প্রতিফলিত হইলে, তবে জীবরূপে ব্যবহারিক ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আমাদের প্রতীতি গোচর হয়। উপাধি সকল যে এই কিরণকণা হইতে তত্ত্বতঃ বিভিন্ন, তাহা বলি না—ভগবানের ইচ্ছানুসারে উহারা ভোগ্যরূপে, জ্ঞেয়রূপে, বিষয়রূপে, ভোক্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্ব, বিষয়ীত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মে ধর্ম্মী চৈতন্য হইতে বিভিন্নতা প্রাপ্ত—জড়রূপে প্রতিভাত মাত্র। বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব সংসাধনের জন্য এই বিভিন্নতার প্রয়োজন। পূর্ব্বে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।১।২০ মন্ত্র ধীরভাবে আলোচনা করিলে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। উপরে কথিত বিভিন্নতা জ্ঞাপন করিবার জন্য আচার্য্যগণ প্রপঞ্চের নিদর্শনে, একই ভাগবতী শক্তির বহিরঙ্গা ও তটস্থা এই দুই বিভিন্ন নামে নামকরণ করিয়াছেন মাত্র, আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই বিভিন্ন নামকরণের প্রয়োজনীয়তা— ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভগবানের কাছে অন্তর-বাহির, নিকট-দূর নাই, ইহাও বলা-হইয়াছে। একই ভাগবতী শক্তি—ক্রিয়ার বিভিন্নতার কারণ, অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে মাত্র। প্রপঞ্চের নিদর্শনে স্বরূপাভিব্যক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া, চৈতন্যাভিব্যক্তি, স্বরূপের সন্নিকট বলিয়া তটস্থা শক্তির ক্রিয়া এবং স্বরূপ হইতে দৃশ্যতঃ দূরস্থ এবং সেজন্য চৈতন্যাভিব্যক্তির দৃশ্যতঃ অসদ্ভাব, বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র।

জীবের উপাধি ?

এখন প্রশ্ন উঠে, জীবের উপাধি কি? সাধারণতঃ আমরা দেহকে উপাধি বলিয়া জানি। তবে কি উহা রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা প্রভৃতি সপ্তধাতুগঠিত স্থূল দেহ? যদি তাহা হয়, তবে মৃত্যুতে ত স্থূল দেহের ধ্বংস সম্পাদিত হয় এবং সেকারণ মৃত্যুর পর জীবের উপাধির অপগমে মোক্ষ প্রাপ্তি আপনাপনিই সংঘটিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে সাধনা, উপাসনা, শাস্ত্রের বিধি নিষেধাদি নিরর্থক হইয়া পড়ে, পুনর্জন্মের অর্থাৎ সংসারে পুনরাবর্ত্তনের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না, ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যখন অনাদিকাল হইতে শাস্ত্র এবং তৎকথিত বিধি নিষেধাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে, শতশত মানব সাধনায়, উপাসনায় দীর্ঘজীবন নিয়োগ করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, একই পিতা মাতার দুইটি পুত্রের মধ্যে, বুদ্ধি, মেধা, ধারণাশক্তি, বিদ্যা প্রভৃতির অত্যধিক বিভিন্নতা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম এবং তত্তজ্জন্মকৃত কর্ম্মফলের—অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তখন, আমাদের স্থূল দেহমাত্র আমাদের সমগ্র উপাধি নহে, এই সিদ্ধান্ত সহজেই উপস্থিত

হয়। তৈত্তিরীয় শ্রুতি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, যে জীবের উপাধি পঞ্চকোষে বিভক্ত ; ইহাদের নাম যথাক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। ইহাদের মধ্যে অন্নময় কোষই আমাদের রক্তমাংস জড়িত স্থূল শরীর, আমরা স্থূল পঞ্চভূতাত্মক যে অন্ন আহার করি, তাহাই ইহার পোষণ, বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ, তাহার অভ্যন্তরে মনোময়, তদভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় এবং সর্ব্বশেষে আনন্দময় কোষ অবস্থিত। "কোষ" এবং "অভ্যন্তর" পদ ব্যবহারে কেহ যেন মনে না করেন, যে কদলীবৃক্ষের খোলের ন্যায় একটি কোষ আর একটির ভিতরে অবস্থিত, প্রত্যেকেই জীবদেহ পরিমাণ, প্রাণময় কোষ—অন্নময় কোষকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, মনোময় কোষ প্রাণময় ও অন্নময় কোষকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করে—অপর দুইটি কোষ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। কেবল পরেরটি আগেরটি অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া, একটির অভ্যন্তরে অপরটি বর্ত্তমান বলা হয় মাত্র। প্রপঞ্চ বিশ্বে এ প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বায়ু জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বায়ু জলের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, অথচ আমরা বলিয়া থাকি যে সমুদ্রের বা জলাশয়ের জলে বায়ু বর্ত্তমান আছে মৎস্যাদির শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রের বিদ্যমানতা উহার সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে জীবের উপাধি, স্থূল অন্নময় কোষ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, অতিসূক্ষ্মতম পঞ্চকোষে বিভক্ত।

মৃত্যুর স্বরূপ :—

জীবের মৃত্যুতে তাহার অন্নময় কোষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। উহা নাশের পর উহার উপাদানীভূত স্থূল পঞ্চভূতাত্মক "ভূঃ' লোকের উপাদানরাশিতে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রাখে। এবং আমাদের ভাষায় কথিত মৃত জীব, তাহার অপর চারি প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে অবস্থান করিয়া আমাদের স্থূল চক্ষের অন্তরালে গমন করে। উহার তৎকালিন অবস্থান স্থান "ভূবর্লোক" নামে প্রসিদ্ধ। তখনকার জীবোপাধির স্থূলতম কোষ—প্রাণময় কোষ। এই ভূবর্লোকে অবস্থান কালে জীবের অর্থাৎ মানবদেহধারী জীবের ইহজীবনে লব্ধ জ্ঞান, অনুভূতি প্রভৃতির পরিপাক আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ কালের বিপরিণামে প্রাণময় কোষ নাশ প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত জীবের ভূবর্লোকস্থ জীবনের অবসান বলা হয় এবং উক্ত প্রাণময় কোষের উপাদান ভূবর্লোকস্থ তৎসজাতীয় উপাদান রাশিতে সঞ্চিত থাকে। তারপর জীব—মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই তিন কোষে অবস্থান করে। এখন তাহার অবস্থান স্থানকে সাধারণতঃ "স্বর্লোক" বলা হয়। স্বর্লোকে অবস্থানকালে, উক্ত পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান কালে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এবং উহাদের সার সংস্কাররূপে

পরিণত হইয়া জীবের অনুগমন করে। ক্রমশঃ কালের বিপরিণামে মনোময় কোষের নাশ সম্পাদিত হয় এবং তাহার উপাদান উক্ত স্বর্লোকস্থ তৎসজাতীয় উপাদান রাশিতে সঞ্চিত থাকে। জীবের স্বর্লোকস্থ জীবনের অবসানের পর জীব বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই উভয় কোষ লইয়া অবস্থান করে। এই উভয় কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ স্থূলতর বলিয়া, তখন জীব—বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করে বলা হয়। ইহার তখনকার অবস্থান স্থান স্বর্লোকের উচ্চতর স্তর বলিয়া কথিত হয়। দৈনিক জীবনে আমরা যেমন অন্নাদি আহার করিয়া উদর পূরণ করি, এবং আহার কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পাদিত হয়, তারপর বিশ্রামের সময় উহা পরিপাক করিয়া থাকি এবং পরিপাক দ্বারা উক্ত অন্নাদির সার রক্ত, মাংস, মজ্জাদিরূপে পরিণত হইয়া আমাদের শরীর পোষণ ও বর্দ্ধন করে। সেইরূপ ভূর্লোকে মানব জীবনে লব্ধ জ্ঞান, অনুভূতি প্রভৃতি, পরিপাকের পর, উক্ত জ্ঞান বা অনুভূতি সমুদায়ের সার, সংস্কার, শক্তিরূপে পরিণত হইয়া জীবের তৎকালিক উপাধি বিজ্ঞানময় কোষে সঞ্চিত থাকে। এবং উহাদিগকে লইয়া বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত জীব সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মনোময় স্তরের উপাদানরাশি হইতে, উহার সজাতীয় উপাদান—উক্ত বিজ্ঞানময় কোষের আবরণ প্রস্তুত করে, সেই আবরণের সহিত তন্নিম্নস্তরের প্রাণময় কোষে তৎসজাতীয় উপাদান—মনোময় কোষের উপর আবরণ সৃষ্টি করে—অন্নময় কোষেও সমপ্রকার ব্যাপার সংসাধিত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানময় কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই গতাগতি চলিতে থাকে।

স্থূল শরীর, লিঙ্গ শরীর ও কারণ শরীর :—

উপরে বলা হইয়াছে যে অন্নময় কোষই আমাদের স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ—সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ শরীর নামে অভিহিত। এবং আনন্দময় কোষ—কারণ শরীর নামে আখ্যায়িত। মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর লইয়া প্রস্থান করে। ভগবান সূত্রকার ইহা "তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ……ইত্যাদি"—৩।১।১ সূত্রে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মূলগ্রন্থে উহার আলোচনা দ্রষ্টব্য। বিজ্ঞানময় কোষে পরিচ্ছিন্ন আত্মা লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৩।৭ মন্ত্র ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত মন্ত্র এবং তাহার অর্থ উক্ত ৩।১।১ সূত্রের আলোচনায় মূলগ্রন্থে (পৃঃ ১১৫৪) দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞানময় কোষ জীবের অবস্থান স্থান বলিয়া, এবং যতদিন না জীব উক্ত কোষ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, ততদিন তার "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন লোকের মধ্যে পরিভ্রমণের বিরাম নাই বলিয়া, এবং বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ বলিয়া (তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ"—২।৩।২৯ সূত্র) জীবকে বিজ্ঞান নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে।

সত্যলোক পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তন চক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত :—

জীবের বিজ্ঞানময় কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, জীব আনন্দময় কোষে অবস্থান করে। তখন জীব স্বর্লোকের বাহিরে মহর্লোকে গমন করে। আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ—ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৯ মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে। কিন্তু যেমন বিশুদ্ধ স্বর্ণে অলঙ্কার প্রস্তুত হইতে পারে না, অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার সহিত রৌপ্য বা অন্য কোনও ধাতুর খাদ মিশাইতে হয়; সেইরূপ ব্রহ্ম বা ভগবানের স্বরূপভূত, বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক আনন্দ—আনন্দময় কোষ প্রস্তুত করিতে পারে না, একারণ আনন্দময় কোষে প্রাকৃতিক সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ আছে মনে করিতে হইবে। বিশেষতঃ ভগবান গীতায় ৮।১৬ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "যে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোক পুনরাবর্ত্তী চক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত"। সুতরাং ঐ সকল লোকে এবং তত্রস্থ জীববৃন্দের উপাধিতে অল্পবিস্তর প্রাকৃতিক গুণের সংমিশ্রণ আছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আনন্দময় কোষে অবস্থিত জীব, উক্ত কোষে বর্ত্তমান প্রাকৃতিক গুণের মাত্রার ইতর বিশেষের কারণ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোকের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। তখনও পুনরাবর্ত্তনের সম্ভাবনা বর্ত্তমান। সত্যলোকের পারে ভগবদ্ধামে গমন করিতে পারিলে, তবে সংসার চক্র হইতে অব্যাহতি; তবে মোক্ষ। তখন জীব নিজ স্বরূপে অবস্থান করে—তখন তাহার স্বরূপ—ভগবানের তটস্থা শক্তিরূপে, ভগবানে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিত, বলিয়া জীব বুঝিতে পারে। যদি বুঝিতেই না পারিবে, তাহা হইলে ত আত্যন্তিক লয়। সমুদায় মুক্ত জীব ইহা আকাঙ্ক্ষা করেন না। যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা যে ইহা পান না, তাহা নহে। সকলেই নিজ নিজ সংকল্পমত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। মোক্ষ প্রাপ্তিতে জীব আনন্দময় কোষ পরিত্যাগ করে; উক্ত কোষ সত্যলোকে অবস্থান করে। তখন জীবের বিশুদ্ধ সত্ত্বময় নিত্যধামের ভোগোপযোগী দেহ লাভ হইয়া থাকে। ইহা ভগবানের সংকল্প বা নিয়ম বশতঃ ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা মূলগ্রন্থে ৪।৪।১ সূত্রে করা হইয়াছে।

বন্ধ মোক্ষের স্বরূপ :—

পঞ্চ কোষের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি, যে উক্ত কোষ সকল জীবের আবরণ সৃষ্টি করে; ভগবান সূত্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "দেহযোগাদ্বা সোঽপি" ৩।২।৬ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মূলগ্রন্থে উক্ত সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য। এই আবরণ জীবের স্বরূপ তিরোধানের কারণ। ইহাই বন্ধ আখ্যায় আখ্যায়িত। এই আবরণের অপসারণে স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। ইহার অপর নাম মোক্ষ। বন্ধই জীবের সংসার পরিভ্রমণের কারণ, এবং মোক্ষ উক্ত পরিভ্রমণের অবসান সাধন করে। জীব নিত্য, শাশ্বত, তাহার স্বতঃ বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই, তবে বন্ধ মোক্ষ কোথা হইতে সংঘটিত হয়? ইহার উত্তরে ভগবান্ সূত্রকার

"পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ" ৩।২।৫ সূত্র প্রণয়ন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মাংশ হইলেও পরমেশ্বরের সংকল্পবশতঃ জীবের স্বরূপাবরণ এবং বন্ধ মোক্ষ সংঘটিত হয়। বন্ধ—অবিদ্যার ক্রিয়া এবং মোক্ষ বিদ্যার ক্রিয়া। এই বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই ব্রহ্মশক্তি। শ্রীমদ্ ভাগবত ১১।১১।৩ শ্লোকে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—উক্ত শ্লোক ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায়, (পৃঃ ৭২৬) উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সেখানে তাহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভগবানের সংকল্পানুসারে যদি বন্ধ-মোক্ষ সংঘটিত হয়, তবে উহাতে জীবের হাত কি? স্রোতে তৃণ খণ্ডের ন্যায় জীব কি নিতান্ত অসহায়ভাবে যদৃচ্ছাক্রমে সংঘটিত বন্ধ-মোক্ষ প্রবাহে পতিত ও উত্থিত হইতে থাকে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ভগবানের সংকল্পের প্রতিরোধ কে করিতে পারে? এই সমুদায় প্রশ্নের সমাধান আমরা সূত্রকারের "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ২।৩।৩৩ সূত্রে পাই। জীব যদি বন্ধের কর্ত্তা হয়, তবে সে জন্ম মৃত্যু প্রবাহে উত্থিত ও পতিত হইতে বাধ্য। কর্ত্তা নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, তাহাতে বলিবার কি আছে। জীবের এই কর্ত্তৃত্বও পরমেশ্বর হইতে, ইহা ভগবান সূত্রকার "পরাত্তু তৎশ্রুতেঃ" ২।৩।৪১ সূত্রে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় ২৫-২৬ পৃষ্ঠায় খেলার বৈচিত্র্যের জন্য প্রত্যেক ক্রীড়কের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে। এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা পরিচালনে কর্ত্তৃত্বের বিকাশ। কর্ত্তৃত্বের অযথা পরিচালনে বন্ধ—ইহা ভগবানের নিয়মানুসারে সংঘটিত এবং ইহার যথাযথ পরিচালনে মোক্ষ—ইহাও তাঁহার নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। ইহাই উপরে উদ্ধৃত ৩।২।৫ সূত্রের অভিপ্রায়। ভগবান জীবকে এই কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিবার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া জীবের সম্ভাব্যমান উন্নতি অসীম। এইজন্য দেবগণও জীবত্ব প্রার্থনা করেন। মনে রাখা প্রয়োজন, যে এখানে জীবত্ব অর্থে মানবত্ব বুঝিতে হইবে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মানবত্ব—পশুত্ব ও দেবত্বের মধ্যে অবস্থিত; একে তমোগুণের প্রাধান্য, অপরে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য—কিন্তু মানবে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। পশুলোক ও দেবলোক উভয়ই ভোগভূমি, মানবলোক কর্ম্মভূমি; এখান হইতে উন্নতির চরমাবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। মানব ভগবদ্ প্রদত্ত কর্ত্তৃত্বের পরিচালনে শাস্ত্রোক্ত পন্থানুসরণ করিয়া পরমা শান্তিলাভে সমর্থ হয়—ইহা উপাসনা তত্ত্বে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

বন্ধ মোক্ষের সহিত জীব-স্বরূপের সম্বন্ধ :—

এখন প্রশ্ন উঠে, বন্ধ ও মোক্ষের সহিত জীব-স্বরূপের সম্বন্ধ কি? শ্রীমদ্ ভাগবত এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোক কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥ ভাগঃ ১১।১১।১

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী ॥ ভাগঃ ১১।১১।২
বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥ ভাগঃ ১১।১১।৩
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ভাগঃ ১১।১১।৪

—ভগবান কহিলেন, বদ্ধ ও মুক্ত ভাব আমার সত্ত্বাদিগুণরূপ উপাধিগত মাত্র, বস্তুগত নহে; অতএব গুণের মায়াকার্য্যত্ব প্রযুক্ত স্বরূপতঃ আমার বন্ধও নাই, মুক্তিও নাই। যেমন স্বপ্ন কেবল বুদ্ধির বিবর্ত্ত মাত্র, তদ্রূপ শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহ প্রাপ্তিরূপ যে সংসার, তাহা কেবল মায়া মাত্র, বাস্তব নহে। হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার শক্তি, উভয়ই অনাদি, উহারাই যথাক্রমে শরীরিদিগের মোক্ষ ও বন্ধকরী, উভয়ই আমার মায়া দ্বারা নির্ম্মিত জানিবে। হে মহামতে! আমার অংশভূত, স্বরূপে প্রকারভেদ রহিত, একমাত্র জীবের উপাধিভেদে, অনাদি অবিদ্যা কৃত বন্ধন এবং বিদ্যা দ্বারাই মুক্তি হয়। ভাগঃ ১১।১১।১-২-৩-৪

সুতরাং আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম—যে জীব স্বরূপের সহিত বন্ধ মোক্ষের সম্বন্ধ—নিত্য নহে, আগন্তুক কারণে ভগবানের ইচ্ছা দ্বারাই সংঘটিত—সেই ইচ্ছাই তাঁহার মায়া—তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী, যে নিয়মাবলী দ্বারা বিশ্বচক্র পরিচালিত হইতেছে—অন্যকথায়, তাঁহার বিশ্বক্রীড়া সুষ্টু সম্পাদনের জন্য শাসক নিয়মাবলী। ইহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় আবার বলিতে হইবে।

জগৎ সৃষ্টিতে ব্রহ্মের স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না :—

পুরুষ সূক্তের মন্ত্র হইতে আমরা জানি যে ব্রহ্মের একপাদে জগৎ এবং তদন্তর্গত সমুদায়, এবং অন্য তিন পাদ স্বরূপে অবস্থিত। অবশ্য পাদ কল্পনা আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে, ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে তাঁহার অত্যল্প শক্তি বিকাশে জগৎ এবং তদন্তর্গত সমুদায়। উহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে ব্রহ্মের যে একপাদে জগৎ এবং তদন্তর্গত সমুদায়, সে পাদে তাঁহার সংকল্প বশতঃ স্বরূপ বিচ্যুতিমত প্রতীতি এবং বিশ্ব প্রকটন। ব্রহ্ম চিরকালই স্বরূপ হইতে অচ্যুত, একারণ তাঁহার একটি নাম অচ্যুত। জীব ও জগৎরূপে প্রকটিত হইলেও তিনি স্বরূপে চিরাবস্থান করিয়া থাকেন; এবং স্বরূপে অবস্থান করিয়াই তিনি নিত্যধামে তাঁহার স্বরূপানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। আমাদের

অজ্ঞানান্ধ চক্ষে—জীব ও জগৎ, দৃশ্যতঃ তাঁহা হইতে পৃথকভাবে বর্ত্তমান, প্রতীয়মান হইলেও, তাঁহার স্বরূপানন্দ উপভোগের কোনও অন্তরায় কোনও কালে উপস্থিত হয় না। তাঁহার একই ভাগবতী শক্তিকে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে কেন, তাহার আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। বোধ সৌকর্য্যার্থে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে ভগবানের স্বরূপ শক্তি, তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি এবং তাহাদের ক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। জীবও জগদ্রূপে প্রকটিত হইলেও যে স্বরূপ-বিচ্যুতির অসদ্ভাব ইহাই ভগবদ্ রহস্য। জীব ভগবানের স্বরূপ শক্তির নিকটস্থা শক্তির অভিব্যক্তি। ভগবদ্ রহস্য যাহা, জীব রহস্যও তাহাই। জীব, জন্মের পর জন্ম, জন্ম মৃত্যু প্রবাহে উত্থিত পতিত হইতে থাকিলেও, উহার স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটে না। স্বরূপ আবৃত থাকে মাত্র এবং তাহা আগন্তুক কারণে সংঘটিত। উক্ত আগন্তুক কারণ জীবের কর্তৃত্ব পরিচালনে উপস্থিত হয়। সুতরাং কর্তৃত্বের পরিচালনে যাহা সংঘটিত, কর্তৃত্বের পরিচালনে তাহা যে অপনোদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এইখানে আমরা কর্ম্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাই। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহার যথাশক্তি আলোচনা করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মতত্ত্ব

কর্ম্মের সংজ্ঞা :—

গীতায় ৮।৩ শ্লোকে ভগবান স্বয়ং কর্ম্মের ব্যাপক সংজ্ঞা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার সংজ্ঞানুসারে "ভূতভাবোদ্‌ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"। ভূতভাবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিধায়ক যে বিসর্গ, তাহা কর্ম্ম সংজ্ঞায় অভিহিত। গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ বিসর্গ শব্দের অর্থ বিসর্জ্জন—দেবোদ্দেশে হবিঃ পুরোডাশাদি দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবিঃ চরু পুরোডাশাদি অর্পণ ভূতভাবের উৎপত্তি, ও বৃদ্ধিকারক—উক্ত প্রকার অর্পণরূপ যজ্ঞ হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে প্রাণীর উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এবং ইহাই কর্ম্ম সংজ্ঞায় আখ্যায়িত—অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞই প্রকৃষ্ট কর্ম্ম। তাঁহাদের এ অর্থ যে সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মনে হয়, যে উক্ত শ্লোকার্দ্ধের সরল অর্থ অধিকতর উদার, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক তথ্যের পরিচয় প্রদান করে। উহার সরল অর্থ কি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

"বিসর্গ" পদটি সৃজ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ—সৃষ্টি পদও উক্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন। সৃজ্ ধাতুর অর্থ নিঃক্ষেপ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং বিসর্গ পদের বুৎপত্তি লভ্য অর্থ—বিশেষরূপ নিঃক্ষেপ—যাহা আত্মস্থ ছিল তাহা বাহিরে নিঃক্ষেপ—তাহার বহিরভিব্যক্তি। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় যে দোলকের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি এবং উহার বহির্ম্মুখীন গমন ও অন্তর্ম্মুখীন আগমন প্রত্যক্ষ দর্শাইবার জন্য যে চিত্রটি প্রদান করিয়াছি তাহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা সৎস্বরূপে তাদাত্ম্যভাবে লীন ছিল, যাহা চিদাকাশে সংকল্পাকারে উত্থিত হইয়া প্রথমে আত্ম প্রকাশ করে, তাহাই বিসর্গের দ্বারা, অন্য কথায় বিকর্ষণী বা কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির প্রভাবে বাহিরে জগদাকারে অভিব্যক্ত হইল। এই অভিব্যক্তিতে ভূতভাবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সংঘটিত হইল। সুতরাং এই বাহ্যরভিব্যক্তিই কর্ম্ম। এই অভিব্যক্তি চৈতন্যের ঈক্ষণে ক্রিয়াশীলা প্রকৃতির ক্রিয়া। ইহার অপর নাম প্রকৃতি যজ্ঞ। ইহা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। শ্রীভগবান গীতায় ৩।১৫ শ্লোকে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্‌ভবং বিদ্ধি" গীতার এই শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ব্রহ্ম পদের অর্থ শব্দ-ব্রহ্ম বা বেদ বলিয়াছেন। যজ্ঞের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই অর্থ যে প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও "ব্রহ্ম" পদের অর্থ ছান্দোগ্য শ্রুতি অনুসারে যে সৎস্বরূপ সৃষ্টি সংকল্প করিলেন, তাঁহা হইতে কর্ম্ম উদ্‌ভূত বলিলে অর্থ সুসঙ্গত হয় এবং গীতার

৮।৩ শ্লোকোক্ত কর্ম্মসংজ্ঞার সহিত সুন্দর সামঞ্জস্য হয়। তিনিই কর্ম্মের মূল উৎস। কর্ম্ম মাত্রই কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তিনিই মূল এবং একমাত্র কর্ত্তা। কিন্তু তিনি অসঙ্গ, উদাসীন, অহং, মম ভাব রহিত বলিয়া সমুদায় কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। ইহাই ভগবদ্ রহস্য।

সমুদায় কর্ম্মের মূলে এক মহাশক্তি :—

মূল গ্রন্থে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় সৃষ্টিতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য যে চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে একের বহু হইবার সংকল্পাত্মক স্পন্দনরূপী যে মহাশক্তির প্রভাবে, মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক পঞ্চ তন্মাত্র ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমাত্মক পঞ্চ মহাভূত উদ্‌ভূত হইল, সেই একই শক্তির প্রভাবে জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গের উদ্ভেদ, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের অভিব্যক্তি, উহাদের নিয়ন্ত্রণে এবং পরিচালনে রূপরসাদির সহিত ইন্দ্রিয়বর্গের সংস্পর্শ, তজ্জনিত দর্শন-শ্রবণ-আঘ্রাণ-আস্বাদন-স্পর্শ-কথন-আদান-গতি-বিসর্গ-আনন্দাদি ক্রিয়া সম্পাদন প্রভৃতি সংঘটিত। চিত্ত মন-বুদ্ধি-অহংকারাত্মক অন্তরিন্দ্রিয়ের বিকাশ, কাম-সংকল্প-বিচিকিৎসা-শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা-ধৃতি-অধৃতি-হ্রী-ধী-ভী প্রভৃতি সমুদায় মানসিক ক্রিয়া, সেই একই মহাশক্তি প্রভাবে প্রবর্ত্তিত,—সেই একই মূল স্পন্দনের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি যে মহাশক্তি প্রভাবে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহনক্ষত্রাদি, স্ব স্ব কক্ষপথে ভীষণবেগে আবর্ত্তিত হইতেছে, প্রতিদিন উহাদের উদয়াস্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, বায়ুর সঞ্চরণ, ঝটিকাবর্ত্তের সংঘটন, বিদ্যুৎ-বিকাশ, অশনি গর্জ্জন, জলের নিম্নগতি, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, জলীয় বাষ্পের ঊর্দ্ধে গমন, মেঘাকারে পরিণতি পুনরায় মেঘ হইতে ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি করকা প্রভৃতি আকারে পতন, বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম, বৃক্ষ-লতা-ওষধি প্রভৃতির উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ফল পুষ্প-শস্য প্রভৃতির উদ্‌ভেদ, উহাদের বৃদ্ধি ও পরিণতি, জীবের জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-নাশ প্রভৃতি সংঘটিত হইতেছে; সেই একই মহাশক্তি প্রভাবে জীবের হৃদ্‌স্পন্দন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, রক্তসঞ্চালন, স্নায়ুযন্ত্রেরক্রিয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য পদার্থের ছবি অন্তরে নীত হওন এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে অচিন্ত্য উপায়ে উহাদের অনুভূতি লাভ, পুনরায় কবিতা বা চিত্রাকারে উহাদের বাহ্য অভিব্যক্তি, প্রভৃতি, যত কিছু ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে। এক কথায় কি প্রাকৃতিক ক্রিয়া, কি জৈবিক ক্রিয়া সমুদায়ের মূলে একের বহু হইবার সংকল্পরূপ চিদাকাশে স্পন্দন। সেই মূল স্পন্দন হইতে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি এবং উহার জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবেশ। সেই মূল স্পন্দনে সমুদায় স্পন্দিত, প্রাণবান, ক্রিয়াশীল। কেহ স্থির নহে। জগতে যে পরিবর্ত্তন স্রোত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় যে পরিবর্ত্তন স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহার মূলে এই মূলস্পন্দনরূপ মহাশক্তি হইতে উদ্‌ভূত অবিশ্রান্ত কর্ম্মশক্তি। জগৎ, সংসার, প্রভৃতি নাম এই অবিশ্রান্ত কর্ম্মশক্তির পরিচায়ক—

পরিবর্তনই ইহাদের বিশেষত্ব। বর্তমান মুহূর্তে যে প্রকার আছে, পরমুহূর্তে—আর সে প্রকার নাই। 'এই মহাশক্তি প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, পরিণতি লাভ করিয়াছে।

বিশ্বচক্রে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের নির্দ্দিষ্ট স্থান ও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে :—

আমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইহা সংখ্যাতীত জীবকোষের সমবায়ে উদ্‌ভূত। দেহের প্রতি জীবকোষ, প্রতি অণু-পরমাণু অনবরত ক্রিয়াশীল। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কর্ম্ম আছে। সেই কর্ম্ম যদি যথাযথ সম্পাদিত হয়, তবে দেহ নিরাময় থাকে। শরীর সচ্ছন্দে থাকে—অর্থাৎ বিশ্বের ছন্দের সমজাতীয় ছন্দে স্পন্দিত হইতে থাকে—অন্য কথায় যে মূল স্পন্দনে বিশ্ব স্পন্দিত, সেই স্পন্দনের তালে তালে নাচিতে থাকে। তাহা হইলে বিশ্বসঙ্গীতের একতানতা সম্পাদিত হয়। ইহার আলোচনা বিস্তারিত ভাবে মৎকৃত "গায়ত্রী রহস্য' নামক পুস্তিকায় করা হইয়াছে। এখানে আর বিস্তার করিলাম না। কিন্তু যদি আমাদের দেহের কোনও কোষ, কোনও অণু-পরমাণু তাহার নির্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে অপারগ হয়, তখন সে, ছন্দের ব্যতিক্রমরূপে, প্রকৃতির ব্যতিচাররূপে, কর্ম্মশৃঙ্খলার বিপর্য্যয়রূপে, আসামঞ্জস্যের হেতুরূপে, আময় ও রোগের নিদানরূপে পরিণত হয়, এবং যতক্ষণ না উহা দেহ হইতে উৎসাদিত ও নিষ্কাশিত হইয়া স্বচ্ছন্দতা, বিশ্বসঙ্গীতের একতানতা পুনরানয়ন করে ততক্ষণ বিরাম নাই, স্বস্থ হইবার উপায় নাই। উহা দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া বিশ্বের উপাদান ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে এবং সেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পুনরায় কর্ম্মঠ হইয়া নূতন কর্ম্মচক্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। কি স্থাবর কি জঙ্গম, প্রত্যেকেই কোন না কোন উপায়ে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতেছে। সৃষ্টির আদি হইতে ইহা চলিতেছে এবং সৃষ্টির ধ্বংস পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। প্রকৃতির অভ্রান্ত ব্যবস্থায়, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত মহৎ, ইতর, স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, কৃমি, একখণ্ড প্রস্তর, একটি বালুকণা পর্যন্ত যে যেরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে প্রত্যেকেরই বিশ্বচক্রে বিশিষ্ট স্থান, বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিক, উক্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিশিষ্ট কর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে। যতদিন উক্ত কর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে থাকিবে, ততদিন প্রত্যেকেরই তদানীন্তন অভিব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিবে, যখন কাল-পরিণামে উক্ত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তখন উক্ত অভিব্যক্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, জঙ্গম জীব সকল মৃত বলিয়া পরিগণিত হইবে, স্থাবর তাহাদের তৎকালিক মূর্ত্তরূপ হারাইবে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে নবকলেবর ধারণ করিয়া নবজীবন লাভ করিয়া পুনরায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে উপযুক্ত হইয়া বিশ্বচক্রের অপর স্থানে, অপর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অপর প্রকার কর্ম্ম পরম্পরা সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রস্তরখণ্ডের বালুকা-কণায় পরিণতি, নদীস্রোতে বালুকার সমুদ্রে নয়ন, এবং ক্রমশঃ স্তরের পর স্তর গঠিত হইয়া দ্বীপের উৎপত্তিতে দেখিতে পাই। ইহাই পুনর্জ্জন্ম বাদ। মানবদেহধারী

জীবগণের সম্বন্ধে ইহার আলোচনা মূলগ্রন্থে ২।১।২৩ ও ৩।১।৮ সূত্রে করা হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে আর করিলাম না।

বিদ্যাধিকারে কর্ম্ম—প্রকৃতি যজ্ঞ :—

কর্ম্ম মাত্রেই দ্বৈতাপেক্ষা করে, ইহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় বলা হইয়াছে। দ্বৈত একের বহু হইবার ইচ্ছা সম্পূরনের জন্য প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত। সুতরাং সমুদায় কর্ম্ম প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতির অপর নাম "মায়া" এবং ইহার বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম্নী দুইটি শক্তি আছে, ইহা মায়াতত্ত্বের আলোচনায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্ম—বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় শক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আচরিত হইয়া থাকে। উপরে যে প্রকৃতি যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে—উহা বিদ্যা শক্তির অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মপরম্পরা। এই বিদ্যাধিকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম পরম্পরা, অন্যকথায় প্রকৃতি যজ্ঞের নিদর্শন, আমরা প্রাকৃতিক সমুদায় ব্যাপারে দেখিতে পাই। সূর্য্য উদিত হইয়া উপাসক, অনুপাসক, ভক্ত, অভক্ত, উদাসীন, বিদ্বেষ্টা প্রভৃতি ভেদ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সকলকে সমভাবে কিরণ বিতরণ করতঃ, স্থাবরগণের তত্তদ্রূপে সংরক্ষণ, জঙ্গমাদির চৈতন্য সঞ্চার ইন্দ্রিয় পরিচালন, ধারণ, পোষণ প্রভৃতি বিধান করিয়া ভূতভাব উদ্‌ভবাত্মক যজ্ঞ কর্ম্মের প্রধান অনুষ্ঠাতারূপে প্রকাশিত হন। কিরণ-প্রসারে জলাশয় পৃষ্ঠ হইতে জলশোষণ করতঃ ঊর্দ্ধে উন্নয়ন করিয়া মেঘাকারে পরিণত করেন। তাপ সহযোগে সঞ্চাল্যমান বায়ুপ্রবাহের দ্বারা উক্ত মেঘ দূরদূরান্তরে ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ ক্ষেত্র সমূহের শিরোদেশে সঞ্চরণ বিধান করেন। তত্তৎক্ষেত্র বারিবর্ষণের দ্বারা আর্দ্রীকৃত করিয়া জীবের প্রাণধারণোপযোগী শস্যোৎপত্তির ব্যবস্থা করেন। নিজ শক্তিবিকাশে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণী শক্তির উদ্বোধন করিয়া পতিত বৃষ্টির নদীপথে সমুদ্রগমন সম্পাদিত করেন এবং আবার তথা হইতে শোষণ, ঊর্দ্ধে উন্নয়ন, মেঘ-প্রকটিকরণ, জলাকারে বর্ষণ প্রভৃতি চক্রাকারে সংসাধন করেন। সূর্য্যের আত্মপর, বন্ধু-শত্রু প্রভৃতি বিচার নাই। সকলের প্রতি সমব্যবহার। কোনও কামনা, বাসনা, ফলাসক্তি নাই। নিষ্কামভাবে সকলের আনন্দ ও তৃপ্তি দানের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান। ইহা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সৃষ্টির আদি হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া• লীলাময়ের লীলাবৈচিত্র্য সাধন করিতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রান্তি নাই, বিরাগ নাই তিলমাত্র ব্যতিক্রম নাই, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জগৎ ক্রীড়নকের ক্রীড়াভিনয় সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য, তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সাধক নিয়মাবলীর অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

মেঘেরও তাই। সমুদায় ক্ষেত্রে আত্মপর নির্ব্বিশেষে ভূরি জলদান। একটি ফলবান বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। নিজে রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া অভ্যাগতকে এমন কি ছেদককেও ছায়া দান করে, পত্র সঞ্চালনে ব্যজন করিয়া শ্রান্তি অপনোদন করে ও, সুপক্ব ফলদানে ক্ষুধা নিবারণ করে। আত্মপর, সুহৃদমিত্র, বন্ধু-শত্রু, রোপক-জলদানে

বর্দ্ধক-ছেদক বিচার নাই, সকলকে সমভাবে তৃপ্তি ও আনন্দদানে তৎপর, কোনও প্রকার কার্পণ্য, বিদ্বেষ, ঈর্ষা কিছুই নাই। কামনা, বাসনা, ফলাসক্তি, প্রতি-গ্রহণের স্পৃহা নাই। প্রকৃতি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেহপুষ্টি করে, এজন্য নিঃশেষে আত্মদান করিয়া প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করে—প্রকৃতির উপাদানের ভাণ্ডার অক্ষুন্ন রাখে। এই সমুদায় প্রকৃতিযজ্ঞের নিদর্শন। এই সমুদায় কর্ম্ম, প্রকৃতির বিদ্যাশক্তির অন্তর্ভুক্ত। জগৎ ও জগতস্থ জীব-অজীব সকলের তৃপ্তি সাধন, আনন্দদান একমাত্র লক্ষ্য। অথবা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বলিয়া কিছুই নাই—আনন্দময়ের আনন্দলীলার জাজ্বল্যমান অভিনয়। স্বার্থজ্ঞান নাই, আত্মাভিমান নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, বিরক্তি নাই। খেলার পরিকররূপে—চলিত ভাষায় খেলুড়রূপে খেলার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া যাইতেছে, নিজানন্দে নিজেই বিভোর। প্রকৃতি এই যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন যে, সংসারে কর্ম্মাচরণ করিবার রহস্য এই যে, ইহা যজ্ঞভাবে অনুষ্ঠান করা। বিসর্গ বা ত্যাগ, আত্মনিবেদন, জীব ও জগতের সেবায় আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ, যজ্ঞানুষ্ঠানের মূলে। যজ্ঞ—বিদ্যাশক্তির আশ্রয়ে কর্ম্ম। জীবও যদি প্রকৃতির নিদর্শনে বিদ্যাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া—যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছি এই জ্ঞানে, কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মবন্ধ নাই—অনাবিল আনন্দ উপভোগ ইহা হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এবং আশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান—এই মহদুদ্দেশ্যে বিহিত।

ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্বান্তর নাই—এই জ্ঞান বিদ্যাধিকারের কর্ম্মতত্ত্বের মূলে :—

গীতায় শ্রীভগবান—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।" ৪।২৪ শ্লোকার্দ্ধে বিদ্যাধিকারে কর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। এই কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন। উক্ত শ্লোকার্দ্ধে ভগবান নিজমুখে স্পষ্ট বলিলেন—অর্পণ-ক্রিয়া ব্রহ্ম, অর্পিত দ্রব্য—হবিঃ ব্রহ্ম, যে অধিষ্ঠানে অর্পিত হয়, তাহা ব্রহ্ম এবং যিনি অর্পণ করেন, তিনিও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর নাই। এই জ্ঞান বিদ্যাধিকারের কর্ম্মতত্ত্বের মূলে। নিম্নোদ্ধৃত তর্পণ মন্ত্রে শাস্ত্র এই শিক্ষাই দিতেছেন :—

ওঁম্ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া॥

এই মন্ত্রে জল গণ্ডুষ অর্পণ দ্বারা কি দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূর সর্প, সুপর্ণ, তরু, বক্রগমনশীল (সরীসৃপ), পক্ষী, বিদ্যাধর, জলচর, আকাশগামী, নিরাহারী, পাপে বা ধর্ম্মে রত, যেখানে যত জীব আছে বা থাকিতে পারে,

তাঁহারা সকলে তৃপ্তিলাভ করুন, এই প্রার্থনা। কোনও ফল কামনা নাই, কেবল তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন ও আনন্দ প্রদান উদ্দেশ্য। ইহা বিদ্যাধিকারে কর্ম্মানুষ্ঠান। যদি তর্পণ করিবার পর মনে উদয় হয় যে আমি তর্পণানুষ্ঠান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলাম, তাহাতে আমার স্বর্গলাভ হইবে বা সুখভোগ ঘটিবে, তাহা হইলে উহাতে অভিমান ঘটিল, কর্তৃত্ব বুদ্ধি রহিল, 'আমার' ভাব রহিল, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিল, তখন উক্ত তর্পণ—যজ্ঞ হইল না। তখন উহা, বিদ্যাধিকার হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অবিদ্যার অধিকারে পতিত হইল। তখন সর্ব্বভূতের তৃপ্তি সাধন ও আনন্দদান—মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য রহিল না। ফলাকাঙ্ক্ষাই মুখ্য উদ্দেশ্য—গোপনে ছিল, অন্তরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিদ্যাধিকারে কর্ম্ম করিতে হইলে, অভিমান থাকিবে না। আপনার কর্তৃত্ব বুদ্ধি মনে উদয় হইবে না, ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। জীব জগৎ সমুদায় অরূপ ব্রহ্মের বা ভগবানের রূপাভিব্যক্তি; যাঁহার জীব ও জগৎ, তাঁহারই কর্ম্ম; তিনিই একমাত্র কর্ত্তা, তিনিই যন্ত্রী, সকলে তাঁহার যন্ত্রমাত্র, তিনিই মূল ক্রীড়ক, সকলে তাঁহার ক্রীড়ার সাধক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে জীব যখন বুঝিতে পারে, পরোক্ষজ্ঞানে ধারণা করিতে সমর্থ হয় যে ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্বান্তর নাই, ব্রহ্মই বিভিন্ন নাম ও রূপে প্রকটিত, তখনই সে বিদ্যাধিকারে কর্ম্মানুষ্ঠানের রহস্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং তখনই তাহার পক্ষে উক্ত প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব হয়। সমুদায় ভগবানের শরীররূপে দর্শন তখনই সম্ভব হয়। তবে জীব শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতিংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥
ভাগঃ ১১।২।৩৯

ইহার অর্থ ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১০৭) দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বভূতে, সর্ব্বজীবে, সর্ব্বপদার্থে ভগবান অনুপ্রবিষ্ট, সমুদায় তাঁহার শরীর স্থানীয়, এই জ্ঞান অল্পমাত্রও হইলে, তবে উপরে উদ্ধৃত গীতায় ৪।২৪ শ্লোকের ও তর্পণ-মন্ত্রের উপাদেয়তা ও উদারতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তখনই উক্ত প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যাধিকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভগবানের ক্রীড়ার পরিপোষক সাধক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আনন্দ দান ও আনন্দ উপভোগ ইহা দ্বারা সংঘটিত হয়।

বৃন্দাবনে গোপ-গোপীদের আচরণ—বিদ্যাধিকারের কর্ম্মের উচ্চে :—

মানবজীবনে বিদ্যাধিকারের কর্ম্মানুষ্ঠাতার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মুখ্য দৃষ্টান্ত ব্রজের গোপবালক ও গোপবালিকাগণ। তাঁহাদের নিজত্ব বোধ নাই, কর্তৃত্ব জ্ঞান নাই। নিজেদের অস্তিত্ব কৃষ্ণে লীন—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ সত্ত্বাবোধ নাই। কৃষ্ণময় তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের আচরণ লোকব্যবহার সমুদায় কৃষ্ণময়। ইহাদের বিশেষতঃ বৃন্দাবনের গোপীগণের মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত ভক্ত উদ্ধবের মুখে প্রকাশ করিলেন :—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং,
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা,
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ভাগঃ ১০।৪৭।৫৪

—অহো! গোপীগণের চরণরেণুস্নাত বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা-ওষধিগণের মধ্যে যদি আমি একটি কেহ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমার জন্মগ্রহণ সার্থক মনে করিতাম। এই গোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণ যে মুকুন্দ পদবীর অনুসন্ধানে নিরত, সেই মুক্তিদাতা ভগবানের চরণ সাক্ষাৎ ভাবে ভজনা করেন। ভাগঃ ১০।৪৭।২৪

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, যে গোপ-গোপীগণের আচরণ ভাগবতে বিশেষভাবে উক্ত থাকিলেও, উহাদের কর্ম্ম বিদ্যাধিকারের কর্ম্ম হইতে উচ্চে। ১।৩।৪১ ও ৩।৩।৪০ সূত্রের আলোচনায় উক্ত হইয়াছে যে বৃন্দাবন লীলা, নিত্যধামের নিত্যলীলার প্রতিচ্ছবি। আদর্শরূপে প্রকটিত। সুতরাং কর্ম্মের সংজ্ঞা হইতে উহাদের আচরণ বাদ দেওয়াই ভাল।

শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণাদির আচরণ—বিদ্যাধিকারের কর্ম্ম :—

তাহা হইলেও শাস্ত্রে বিদ্যাধিকারে কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরামচন্দ্র, জনক রাজা, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জ্জুন প্রভৃতি অনেক নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম, আচরণ, সাধারণ মানবের সহিত তুলনীয় হইতে পারে কিরূপে? এরূপ সংশয় মনে উদয় হইতে পারে, ইহার উত্তরে বলিব, যে ভগবান নরদেহে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইলে, মানবের মতই সমস্ত আচরণ করেন, অতিমানুষী শক্তি প্রকট করেন না। যদি অতিমানুষী শক্তিই প্রকট করিবেন, তবে অবতার গ্রহণের আবশ্যকতা কি? শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ইহাঁরা মানব দেহে বর্ত্তমান কালে অতিমানুষী শক্তি বিকাশে কোনও কর্ম্ম করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা মূলগ্রন্থে ৩।৩।৪০

সূত্রে সংক্ষেপে করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিবার কোন কারণ নাই। পরে ঐতিহাসিক সময়েও দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই—শ্রীমচ্চৈতন্যদেব, মহাত্মা তুলসীদাস, আমাদের নিজ সময়ে শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের নিজেদের কর্তৃত্ব জ্ঞান ছিল না। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে; সর্ব্ব বস্তুতে, তাঁহাদের ভগবদ্‌স্ফূর্ত্তি হইত। জগৎ তাঁহার কর্ম্ম, তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। জীব অভিমান বশতঃ কর্ত্তা সাজিলেও প্রকৃতপক্ষে অকর্ত্তা, ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারা সংসারে যে কর্ম্ম আচরণ করিতেন, তাহা বিদ্যাধিকারের কর্ম্ম। তাঁহারা নিজে উক্ত প্রকার কর্ম্ম আচরণ করিয়া শ্রুতি কথিত "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে," —মন্ত্রাংশের প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহারা সাধারণ দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান সুখ দুঃখময় সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়াও সুখ দুঃখের বহু উর্দ্ধে অমৃতলোকে বিচরণ করিতেন। সুখ দুঃখ সংস্পর্শের সহিত তাঁহাদের কোনও প্রকার সম্বন্ধ ছিল না। সর্ব্বত্রই সর্ব্বব্যাপারে তাঁহারা আনন্দময়ের আনন্দলীলার অভিনয় দেখিতেন; এবং যে সকল ভাগ্যবান জীব, তাঁহাদের সংবেষ্টনীর মধ্যে আসিতেন তাঁহাদের নিকটও ইহা প্রতিভাত হইত। সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার দর্শনের সমকালে লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানি, যে শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দারুণ গলরোগে পীড়িত হইলেও, তাঁহার সর্ব্বসময়ে ব্রহ্মানন্দ উপভোগের ব্যাঘাত হয় নাই, দেহ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের কোনও অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার নিজের কথায়, আমরা অবগত হই, যে তিনি, তাঁহার গলরোগকে, তাঁহার দেহের একপার্শ্বে পড়িয়া আছে, এরূপ অনুভব করিতেন। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিলাম, যে আমাদের ন্যায় মানবের দৃষ্টিতে, তাঁহার দেহ অসাধ্য কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং তজ্জনিত অতি দারুণ কষ্ট ও যন্ত্রণায় পাতিত বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, তিনি নিজে, উক্ত ব্যাধির দুঃখ কষ্টের বহু উর্দ্ধে অমৃতলোকে অবস্থান করিতেন! বিদ্যাধিকারে কর্ম্মানুষ্ঠানের ইহাই বিশেষত্ব।

আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের কর্ম্ম অবিদ্যাধিকারের কর্ম্ম :—

আমরা সাধারণ মানব এখন ক্রমাভিব্যক্তির যে স্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছি, তাহাতে বিদ্যাধিকারে কর্ম্মানুষ্ঠান সহজ সাধ্য নহে—সাধনা সাধ্য। এই সাধনার উপদেশ শাস্ত্রে প্রদত্ত আছে। আমরা সাধারণ মানব অবিদ্যার বশ। আমাদের কর্ম্ম—অবিদ্যাধিকারের কর্ম্ম। পূর্ব্বে যে সাধক নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অপব্যবহারেই জীবকে বা ভগবানের খেলার সঙ্গীকে, তাঁহার কৃত শাসক নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হয়। শাসক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া—মানে অবিদ্যার অধীন হওয়া। জীবের যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার কথা বলা হইয়াছে, তাহার অযথা পরিচালনায় ইহার সংঘটন। উক্ত অযথা পরিচালনা হইতে জীবের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধির পরিচয়, দেহাত্মবুদ্ধির উন্মেষ, বিষয়ে অহং, মম ভাবের উৎপত্তি। এই স্বাধীনতা,

খেলার বৈচিত্র্য বিধানের জন্য ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে প্রদত্ত ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ, উক্ত কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ও অহং মমভাবের মূলে। এই অপপ্রয়োগের শাস্তির জন্য কর্ম্মের সহিত ফলের সংযোগ, কর্ম্মের বন্ধন এবং তজ্জনিত সুখ দুঃখ বোধ—কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ। যাহার কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিতে কর্ম্ম, সে যে ইহার ফলভোগ করিবে, ইহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়। তবে এই যে শাস্তির বিধান—ইহা শাসক নিয়ম প্রবর্ত্তকের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক নহে। তাঁহার করুণার পরিচায়ক। তাঁহার খেলার সঙ্গীকে খেলার গণ্ডীর বাহির হইতে ভিতরে আনিবার উপায়। অল্পবয়স্ক বালক, কোনও অপরাধ করিয়া ফেলিলে, যেমন বিচারক, তাহার কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া, সংশোধনাগারে প্রেরণ করেন, এবং তথায় কিছু কালের জন্য সংশোধক নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখেন—ইহাও সেই প্রকার। সংশোধক নিয়ম সকলও ভগবান শাস্ত্রকর্ত্তৃরূপে শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই নিয়ম মানিয়া চলিলে সংশোধন শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হয়—জীব পাবার বিত্যাধিকারে পুনঃ স্থাপিত হয়। শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে, সাধারণ ক্রম পরিণতির নিয়মে জীব ক্রমশঃ সংশোধিত হইতে পারে বটে, তবে ইহা কাল সাপেক্ষ। শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করিলে আরও অধিকতর কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকাদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বদ্ধ থাকিতে হয়, ইহা মূলগ্রন্থে ৩।১।১৬ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে।

ভগবদ্ প্রদত্ত স্বাধীনতার জন্য মানবের সম্ভাব্যমান উন্নতি অসীম :—

এখন প্রশ্ন উঠে, যে মানব দেহধারী জীব ভগবদ প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে কেন? ইহার উত্তরে বলিব, স্বাধীনতা আছে বলিয়া। যদি স্বাধীনতা যথেচ্ছা চালনা করিবার ক্ষমতা না থাকিত, যথাযথ চালনা করাই যদি একমাত্র বিহিত পথ হইত, তাহা হইলে স্বাধীনতা থাকার কোনও অর্থ থাকিত না। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই, উহার সুব্যবহার এবং অপব্যবহার বর্ত্তমান। মানব জীবনের ইহাই বিশেষত্ব। এই স্বাধীনতার জন্যই মানবদেহে লব্ধজন্ম জীবের সম্ভাব্য আধ্যাত্মিক উন্নতি অসীম এমন কি ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত। মানব জন্ম লাভ হইলেই বুঝিতে হইবে যে সে জীব ক্রমাভিব্যক্তির বিশেষ সোপানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত মানব নিতান্ত অন্ত্যজ হইলেও, নিতান্ত হিংস্র পশু প্রকৃতির হইলেও, উক্ত বিশেষ সোপানের সর্ব্বনিম্ন ধাপে বর্ত্তমান থাকিলেও, উহার সম্ভাব্য উন্নতি ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উঠিয়া, শেষে ব্রহ্মত্বে অথবা নিত্যধামে তাঁহার পরিকরত্বে পরিণতি। এই স্বাধীনতা আছে বলিয়াই দেবতাগণও মানবজন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহার জন্যই মানব সাধনা পথে অসীম উন্নতি লাভ করিতে পারে—দেবত্ব অতিক্রম করিয়া পরমতত্ত্ব অধিগত করিতে পারে। ইহার জন্যই শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের সার্থকতা। ইহার জন্যই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার কর্ত্তব্যতা। এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া মানব-দেহধারী জীব

সাধনা করিতে পারে এবং সাধনা দ্বারা শাসক নিয়মের অধিকার হইতে—অন্যকথায় অবিদ্যার অধিকার হইতে—মুক্তিলাভ করিয়া বিদ্যাধিকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। ইহাও ভগবানের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। যাঁহার ইচ্ছায় বন্ধন, তাঁহার ইচ্ছায় মুক্তি—এই ইচ্ছার অন্য নামই অবিদ্যা ও বিদ্যা—শাসক ও সাধক নিয়ম। ভগবান সূত্রকার এই রহস্য পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩।২।৫ সূত্রে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। মানব-দেহের বিশেষত্ব শ্রীমদ্ ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বড়ই সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
ভাগ: ১১।২০।১৭

—কোটি কোটি জন্মেও সুদুর্লভ আমার ভগবানের মঙ্গল বিধানে যদৃচ্ছা ক্রমে লব্ধ এই নরদেহই ভবসাগর পারের পটুতর নৌকা, এই নরদেহে অবস্থান কালে কৃত কর্ম্ম দ্বারা সমুদায় পুরুষার্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, একারণ ইহাকে 'আদ্য' বা সমুদায় ফলের মূল বলা হইয়া থাকে, গুরুদেব ইহার কর্ণধার। স্মরণ মাত্রই আমি (ভগবান) অনুকূল বায়ু দ্বারা ইহার চালনা করিয়া থাকি। এই সমুদায় সুবিধা সত্ত্বেও, যে পুরুষ এমন দুর্লভ মানব দেহরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগর পার হইতে না পারে—সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। ভাগ: ১১।২০।১৭

আত্মহত্যার ন্যায় পাপ নাই। যে ব্যক্তি মানব দেহ ধারণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি পালন পূর্ব্বক ভবসাগর পারের জন্য চেষ্টা বা সংরাধন না করে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতীর ন্যায় মহাপাপী, ভাগবতকার ইহা প্রকাশ করিলেন।

পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান স্বভাব গঠন করিয়া থাকে :—

শাসক নিয়মে বা অবিদ্যার অধিকারে অবস্থানকালে, জন্মের পর জন্ম, জীব যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাই তাহার স্বভাব প্রস্তুত করে। বারি বিন্দুর ধারাবাহিক পতনে কঠিন প্রস্তরও সেই বারি-পতন-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানালোচনায় আমরা জানি, যে সম জাতীয় স্পন্দন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কোনও বস্তুর উপর প্রযুক্ত হইলে, উক্ত বস্তু সেই স্পন্দন গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ করে, এবং উক্ত স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে থাকে। উদ্দীপক স্পন্দন ক্ষান্ত হইলেও উহাই সমজাতীয় স্পন্দন প্রেরণের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া থাকে এবং উহা হইতে স্বতঃ সমজাতীয় স্পন্দন উত্থিত হইতে থাকে। জীবের স্বভাব গঠনের মূলে সমজাতীয় স্পন্দনের জন্ম জন্ম ধরিয়া প্রয়োগ, অন্যকথায় এক জাতীয় কর্ম্মের জন্মের পর জন্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান, এই স্বভাবই সমজাতীয়

স্পন্দনোৎপাদনের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া জীবকে বাধ্য করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করে। ভগবান গীতাতে ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

> ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ গীঃ ৫।১৪
>
> —প্রভু ঈশ্বর লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা কর্ম্মফল সংযোগ সৃজন করেন না, জীবের স্বভাবই উহাদের প্রবর্ত্তন করে।

ইহা হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না, যে স্বভাব—ভগবান হইতে তত্ত্বান্তর—পৃথক্ কর্ত্তা। ইহার মর্ম্ম এই, যে ভগবান প্রত্যেক জীবের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা কর্ম্মফলসংযোগ সৃজন করেন না। যে সাধক ও শাসক নিয়ম ভগবান সৃষ্টির আদিতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অপরিহার্য্য শক্তি বলে, জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল হইতে উত্থিত সুখ দুঃখাদি ভোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। উহাদের জন্য পৃথক্ বিধান করিতে হয় না।

স্বভাবের বল এত অধিক, যে ইহার নিগ্রহ দুঃসাধ্য :—

এই স্বভাবের বল ক্রমশঃ এত অধিক হয়, যে ইহাকে নিগ্রহ করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। গীতায় ইহাও ভগবান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

> 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি'॥ গীঃ ৩।৩৩
>
> —ভূত সকল নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করে, ইহা কি করিয়া নিগ্রহ করিবে ?

বলা বাহুল্য যে স্বভাবও যা, প্রকৃতিও তাই। এখানে ইহা বলিয়া রাখি, যে এই স্বভাব বা প্রকৃতি, যাহা শাসক নিয়মের অব্যভিচারী ক্রিয়ায় গঠিত হয়, তাহা আমাদের জাতিভেদের মূলে। তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে নিহিত। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠান করিলে, তবে এই স্বভাব বা প্রকৃতির কবল হইতে ক্রমশঃ মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ঋষিগণ ইহা তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বিধি, উপদেশ, যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত, তাহার আলোচনার এ স্থান নহে।

স্বভাব গঠনের বীজ, কবে প্রথম উপ্ত হইল তাহার অনুসন্ধান নিরর্থক :—

সাধক নিয়মের অপব্যবহার প্রথমে কবে এবং কেন হইল—অন্য কথায় স্বভাব গঠনের বীজ প্রথমে কবে উপ্ত হইল, এ প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বলেন, যে সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টির বৈচিত্র্যও অনাদি, বৈচিত্র্য গঠনের কারণও অনাদি। সুতরাং আদিকারণানুসন্ধান-নিরর্থক, শাস্ত্র এই কারণে উক্ত প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধান পরিহার করিয়াছেন। ইহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এতৎ

সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা ২।১।২৩ সূত্রে করা হইয়াছে। সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনায় দোলকের নিদর্শন হইতেও ইহা উপলব্ধ হইবে।

সৃষ্টির অভিব্যক্তির জন্য বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই প্রয়োজনীয় :—

বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে মায়ার শক্তি, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উভয়েই মায়ার অন্তর্গত। মায়া যখন অব্যাকৃত ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃতির গুণ—ক্ষোভ হয় নাই, তখন বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে জড়িতভাবে বর্ত্তমান ছিল। যেমন (+) যোগাত্মক ও (–) ঋণাত্মক তড়িৎ যখন সংমিলিত ভাবে থাকে, তখন তড়িতের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না উহারা পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্ত হইলে, তবে তড়িতের নিদর্শন ও ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তড়িতের অভিব্যক্তির জন্য উহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা যখন সংমিলিত ভাবে ছিল, তখন সৃষ্টির অভিব্যক্তি ছিল না—সৃষ্টির অভিব্যক্তির জন্য উহারা উভয়ে উভয়ের আত্যন্তিক অপেক্ষা রাখে। যেমন আলোকের প্রতীতি না থাকিলে অন্ধকারের উপলব্ধি হয় না, এবং অন্ধকারের উপলব্ধি না থাকিলে আলোকের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, সেইরূপ অবিদ্যা না থাকিলে বিদ্যার প্রতীতি হয় না, এবং বিদ্যা না থাকিলেও অবিদ্যার উপলব্ধি হয় না। সৃষ্টির অভিব্যক্তির জন্য উভয়ই একান্ত প্রয়োজনীয়। এককে পরিত্যাগ করিয়া অপরের অস্তিত্ব ধারণা করা যায় না। উহাদের মধ্যে একটি ভাল, অপরটি মন্দ, এরূপ বলিবার কিছুই নাই। যখন উভয়েই সম প্রয়োজনীয়, তখন ভাল মন্দ প্রশ্ন উঠিবে কিরূপে? ভাল মন্দ আমাদের অসম্যগ্ দর্শনের ফল। প্রকৃত পক্ষে, উচ্চাধিকারীর লক্ষ্যস্থান হইতে এবং ব্রহ্মকোটি হইতে ভাল মন্দ কিছুই নাই। যখন সমুদায় ব্রহ্মেরই নাম—রূপাভিব্যক্তি হইতে জাত, তখন একটি ভাল, অপরটি মন্দ বলা যাইতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে যাহারা আমাদের সুবিধার বিষয়, তাহাদিগকে আমরা ভাল বলি, আবার তাঁহার ইচ্ছানুসারে যাহারা আমাদের অসুবিধার কারণ, তাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া থাকি।

আমরা বায়ু সাগরের নিম্নতম তলচারী জীব, মৎস্য জলচর জীব। বায়ু ও জল উভয়েই আমাদের জীবন ধারণ পক্ষে সমভাবে প্রযোজনীয়। উহাদের মধ্যে একটি ভাল, অপরটি মন্দ আমরা বলিতে পারি না। অথচ, যদি কেহ আমাকে বলপূর্ব্বক জলমধ্যে ডুবাইয়া ধরে, আমি জল হইতে উঠিবার জন্য ছট্‌ফট্ করি—যদি শীঘ্র উঠিতে না পারি, আমার প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে, তা বলিয়া জল যে মন্দ, বা অপ্রয়োজনীয়, তাহা বলিতে পারি না। একটি মৎস্য জল হইতে তুলিয়া উপরে রাখিয়া দিলে, উহা কি প্রকার অস্থির হইয়া আকুলি বিকুলি করে, এবং খানিক পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট; অথচ মৎস্যের জীবন ধারণের জন্য বায়ুর প্রয়োজন, উহার ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের বর্ত্তমানতা তাহার প্রমাণ।

আনন্দের অন্বেষণে অবিশ্রান্ত প্রধাবন আমাদের মনের চঞ্চলতার মূলে :—

আলোকের জীব, আলোক যাহাদের জন্মক্ষেত্র, অবস্থান ক্ষেত্র, সংবর্দ্ধন ক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র, আলোক ভালবাসে। আলোকে তাহাদের শক্তির স্ফুরণ হয়, কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, আনন্দের উপভোগ হয়; অন্ধকারে তাহাদের ভয়, অন্ধকার তাহাদের শক্তি জড়ীভূত করিয়া রাখে, অন্ধকারে তাহাদের নিরানন্দ দুঃখকষ্ট ভোগ। অন্যপক্ষে অন্ধকারের জীবগণ আলোক ভালবাসে না, আলোকে তাহারা জড়ের ন্যায়, মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে; অন্ধকারে তাহাদের শক্তির স্ফুরণ, আনন্দের বৃদ্ধি ও উপভোগ। আমরা স্বভাবতঃ বিদ্যাধিকারের জীব—অমৃতত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ—একারণ বৈদিক ঋষি মানব সাধারণকে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কোনও আগন্তুক কারণে আমরা অবিদ্যাধিকারে পতিত হইয়াছি এবং সে কারণ জলে নিমজ্জিত মানবের ন্যায় নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছি, দুঃখকষ্ট—যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছিনা! আনন্দময় অমৃতলোকের অতিক্ষীণ রেখা, আমাদের উপলব্ধির মূলে সুপ্তভাবে নিহিত থাকিয়া আমাদিগকে আনন্দের অন্বেষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রধাবিত করিতেছে। আমাদের মনের চঞ্চলতার মূলে এই আনন্দের অন্বেষণে অবিশ্রান্ত প্রধাবন। যতদিন না, আনন্দময়ের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, আনন্দময় অমৃতলোকের বিনষ্ট স্থান পুনরুদ্ধার করিতে পারা যায়, ততদিন এ ছুটাছুটির বিরাম নাই। উহা লাভ করিলেই শাশ্বত বিশ্রান্তি, অবিদ্যাধিকার হইতে মুক্তি, আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ বিদ্যাধিকারে অবস্থান।

বিদ্যা ও অবিদ্যা যেমন পরস্পরকে অপেক্ষা করে সেইরূপ বন্ধ ও মোক্ষও পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে :—

একটি তড়িৎ যন্ত্রের প্রতি অণু-পরমাণুতে যোগাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় তড়িৎ বর্ত্তমান থাকিলেও, উহার এককেন্দ্রে কেবলমাত্র যোগাত্মক তড়িতের নিদর্শন ও অপর কেন্দ্রে কেবলমাত্র ঋণাত্মক তড়িতের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়; সেইরূপ বিশ্বযন্ত্রের প্রতি অণু-পরমাণুতে বিদ্যা ও অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকিলেও, উহার একপ্রান্তে বিদ্যা, অপরপ্রান্তে অবিদ্যা, একপ্রান্তে মুক্ত ঈশ্বর ও চৈতন্য, অপরপ্রান্তে বদ্ধ জীব ও জগৎ। উভয়ে উভয়ের অপেক্ষা রাখে। জীব আছে বলিয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, ভগবানের ভগবত্তা। জীব না থাকিলে, ঈশ্বরও নাই, ভগবানও নাই। কি থাকে, তাহা ভাষায় বলা যায় না। যা থাকে, তাই—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা যেমন পরস্পরকে অপেক্ষা রাখে, বন্ধ মোক্ষও সেইরূপ পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা রাখে। বন্ধ না থাকিলে মোক্ষের সার্থকতা নাই, আবার মোক্ষ না থাকিলে বন্ধেরও প্রতীতি নাই। অবিদ্যার সহিত বন্ধ, এবং বিদ্যার সহিত মোক্ষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিই বন্ধনের কারণ :—

কর্ম্মের স্বতঃ বন্ধন-সামর্থ্য নাই। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিই বন্ধনের কারণ। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ভগবানের ইচ্ছায় সংঘটিত, জীবের কর্ত্তৃত্ব ভগবান হইতে প্রাপ্ত, স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নহে, এবং উক্ত কর্ত্তৃত্ব অতি অল্প সীমার মধ্যে নিবদ্ধ—ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যতদিন জীবের উপাধিতে অভিমান বর্ত্তমান, ততদিন কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান—ইহা "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ॥" ২।৩।৩৩ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। বন্ধ যখন এই কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি হইতে, এই কর্ত্তৃত্বের পরিচালনায় জীব নিজকৃত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

ভগবান সূত্রকার "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ॥" ২।৩।৪২ সূত্রে প্রতিপাদিত করিয়াছেন, যে জীব, সীমাবদ্ধ, উপাধির অভিমান হইতে জাত, কর্ত্তৃত্বের পরিচালনে দৃঢ় প্রযত্ন করিতে পারিলে শাসক নিয়মের অধিকার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। "ফলমত উপপত্তেঃ" ৩।২।৩৮ সূত্রে কর্ম্মফল যে ভগবানের নিয়মানুসারেই বিহিত, ইহা সূত্রকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভগবানই স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র একমাত্র কর্ত্তা, জীব প্রকৃত কর্ত্তা না হইয়াও—অর্থাৎ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও, আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে—ইহা জীব-রহস্য। এই অপ্রাকৃত কর্ত্তৃত্বের ধ্বংসেই বন্ধন হইতে মুক্তি—জীবের স্বরূপাভিব্যক্তি, অবিদ্যাধিকার হইতে বিদ্যাধিকারে গমন। জীব যদি বুঝিতে পারে, যে তাহার জীবত্ব, তাহার নিজত্ব, তাহার উপাধি, ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মস্থিত এবং ব্রহ্মে শেষ পরিণতি, জীব যে সমুদায় বিষয় উপভোগ করে তাহারাও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, ব্রহ্মের ইচ্ছায় উহারা তাহার সহিত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; জগৎ, জগৎস্থ যা কিছু, সমুদায়ই ব্রহ্মের নানারূপে অভিব্যক্তি, তখন সে তাহার নিজ কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পায় না, তখন কে কাহাকে কি প্রকারে বন্ধন করিবে? সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের বা ভগবানের লীলা, খেলা, সমুদায়ই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত বুঝিতে পারে। দুঃখ-কষ্ট বন্ধন প্রভৃতি কিছুই নাই তখন তাহার উপলব্ধিগোচর হয়। তখন সে আপনাকে চিরমুক্ত, ভগবানের তটস্থা শক্ত্যংশ বলিয়া বুঝিতে পারে।

জীবের স্বরূপের সহিত কর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ নাই :—

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে জীবের স্বরূপের সহিত কর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ নাই, আগন্তুক কারণে সংশ্লেষ মাত্র সংঘটিত। এই সংশ্লেষ উপাধি সৃষ্টি করিয়া জীবের স্বরূপাবরণের কারণ হয় এবং আবৃত-স্বরূপ জীব ভ্রমবশতঃ আপনাকে সুখী, দুঃখী, কর্ত্তা, কৃশ, দুর্ব্বল, রোগী প্রভৃতি নানাভাবে অনুভব করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শ্রীমদ্ ভাগবত নিম্নোক্ত কয়েকটী শ্লোকে ইহা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥ ভাগ : ১১।১০।৩০

যাবৎ স্যাৎ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈবহি।

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্॥ ভাগ : ১১।১০।৩১
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ। ভাগ : ১১।১০।৩২

—ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম সকলের সৃষ্টি করে, সত্ত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, আত্মা করেন না, জীব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া উপাধি সহকারে কর্ম্মফল ভোগ করে, নিরুপাধি আত্মা ভোগ করেন না। যতদিন গুণ বৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব জ্ঞান হয়, যতদিন আত্মার নানাত্ব থাকে, ততদিন তাঁহার পরাধীনত্ব হয়, যতদিন পরাধীনত্ব থাকে, ততদিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয়। যাঁহারা এইরূপ গুণ-বৈষম্য ও তৎকৃত ভোগ ও কর্ম্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা শোক মোহের বশীভূত হইয়া মুগ্ধ হয়েন। ভাগ : ১১।১০।৩০-৩১-৩২

অবিদ্যাধিকারে কৃত কর্ম্ম চারি প্রকার; উহাদের কাহারও দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হয় না :—

অবিদ্যাধিকারে কৃত আমাদের সাধারণ কর্ম্ম চারি প্রকার :—(১) উৎপাদ্য (২) সংস্কার্য্য (৩) বিকার্য্য ও (৪) আপ্য। জীবের স্বরূপাভিব্যক্তি অথবা ভগবত্তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি—উক্ত চারি প্রকার কর্ম্মের কোনও প্রকারের দ্বারা লভ্য নহে। উহা নিত্য সিদ্ধ বলিয়া "উৎপাদ্য" নহে। চিরোজ্জ্বল, নিত্যকাল সমভাবে দেদীপ্যমান্ থাকায় এবং মলিনতা তাহাতে স্পর্শেনা বলিয়া "সংস্কার্য্য" নহে। অপরিণামী, পরম সত্য বলিয়া "বিকার্য্য" নহে এবং অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান বলিয়া "আপ্য" নহে। ভগবান সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের ৩।৪।১ সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ৩।৪।২ হইতে ৩।৪।১৪ সূত্র পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন ও বিচারের দ্বারা আপত্তি সকল নিরসন করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সংরাধনরূপ কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা :—

যদি আত্মোপলব্ধিতে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষা-নুমানাভ্যাম্॥"—৩।২।২৪ সূত্রের সার্থকতা কি? ইহার বিস্তারিত আলোচনা মূলগ্রন্থে

উক্ত প্রসঙ্গে করা হইয়াছে, এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এক কথায় বলিয়া রাখি যে, কর্ম্মের দ্বারা আবরণ সৃষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্বকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল, সংরাধনরূপ কর্ম্ম দ্বারা তাহা অপসারিত হয় মাত্র। মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিলে সূর্য্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য নিস্তেজ বা জ্যোতিঃহীন হয় না, মেঘ অপসারিত হইলে সূর্য্য আত্মপ্রকাশ করে। আত্মতত্ত্ব সেইরূপ উপাধির মলিনতায় আচ্ছাদিত ছিল, মলিনতার অপসারণে স্বতঃ আত্মপ্রকাশ করে। দর্পণের মলিনতা অপসারণের জন্য যেমন লাঠির আঘাতরূপ প্রচণ্ড কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, উহার দ্বারা দর্পণের ধ্বংস সংসাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু মলিনতা দূর করা যায় না ; তাহার জন্য বালুকাদির দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন। সেইরূপ উপাধির মলিনতা অপসারণের জন্য উৎকট কর্ম্মের প্রয়োজন নাই—"সংরাধন" রূপ বিশেষ কর্ম্ম প্রয়োজনীয়। উহার দ্বারাই মলিনতা সম্যক্ দূরীভূত হয়, একারণ অন্য কর্ম্মাপেক্ষা সংরাধনরূপ বিশেষ কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। কর্ম্মের দ্বারা আবরণের সৃষ্টি, এবং কর্ম্মের দ্বারাই তাহার অপসারণ, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বটে।

কর্ম্মের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল :—

অবিদ্যাধিকারে জীবের কৃতকর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) প্রারব্ধ (২) সঞ্চিত ও (৩) ক্রিয়মাণ। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ২।১।২৩ ও ৩।১।৮ সূত্রে করা হইয়াছে, এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকুমাত্র পুনরুল্লেখ করি যে, যেমন জড় বিজ্ঞান হইতে আমরা জানি যে ঘাত প্রতিঘাত সমান ও পরস্পর বিপরীত মুখে কার্যকারি, এবং উভয়ের উপরে উভয়ের ক্রিয়া, সাম্যভাব সংস্থাপনের হেতু, সেইরূপ কর্ম্ম ও তাহার ফলভোগ পরস্পর বিপরীত মুখে সমান ভাবে কার্য্যকারী হইযা, সাম্যভাব সংস্থাপন করে—অন্য কথায় ফলভোগ, কর্ম্মনাশ করে। কিন্তু যেমন কোনও প্রস্তরের উপর আঘাত করিলে প্রতিঘাতে আঘাত নিবারিত হয় বটে, তথাপি আঘাতের চিহ্ন প্রস্তরের গায়ে অঙ্কিত থাকে, সেইরূপ কোনও বিশেষ কর্ম্ম, ফলভোগে নষ্ট হইয়া যাইলেও চিত্তে তাহার চিহ্ন রাখিয়া যায়। ধৌত বস্ত্রে কালী পড়িলে, তাহা যেমন পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও কালীর দাগ নিঃশেষে অপনীত হয না, অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে উহার সূক্ষ্ম চিহ্ন অনুভব করা যায়, সেইরূপ দৃষ্ট ফলভোগে কর্ম্ম ধ্বংস হইলেও উহার দাগ চিত্তে কামনা, বাসনা, কর্ম্মবীজাকারে—সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহা নিঃশেষে নষ্ট হয় না ; ইহা সংসারে গতাগতির কারণ। এজন্য শাস্ত্রকাররা বলেন, যে কর্ম্মের দষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল উৎপন্ন হয়। দৃষ্টফল, দৃষ্ট ফলভোগে ধ্বংস হয়, অদৃষ্টফল মৃত্যুর পরও জীবের সঙ্গে অনুগমন করে। এই অদৃষ্ট ফলকেই ভগবান সূত্রকার

ভূতসূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত ৩।১।১ সূত্রে ইহা জীবের সহিত জন্ম হইতে জন্মান্তরে, দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই অদৃষ্টফল "দৈব" সংগঠনের হেতু। ফলতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্ম, যাহারা দৃষ্ট ফলভোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের অদৃষ্টফল হইতে উৎপাদিত চিহ্ন সকলের সমবায় শক্তি হইতে দৈব উৎপন্ন হয় এবং পুরুষকার বা ক্রিয়মাণ কর্ম্মসকলের সহযোগে কার্য্যকারী হইয়া, কোন বিশেষ কর্ম্মের সফলতা বা বিফলতার হেতু হয়। যতদিন না কর্ম্ম নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার দৃষ্টফল ভোগের দ্বারা এবং অদৃষ্ট ফলোৎপন্ন বাসনা, কামনা প্রভৃতির নিঃশেষ বিলোপ সাধন না হয়, ততদিন সংসারে গতাগতির বিরাম নাই। এই গতাগতি নাশের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাহা, কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, কর্ম্ম দ্বারা তাহার ধ্বংস, ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত। ভগবান সূত্রকার এই কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম "সংরাধন" বলিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহা উপাসনা নামে প্রসিদ্ধ। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা উপাসনা তত্ত্বের আলোচনা করিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উপাসনাতত্ত্ব

ব্রহ্ম বা ভগবানে জীবের নিত্য আসন :—

জীবতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে জীব, ব্রহ্মের বা ভগবানের তটস্থা শক্ত্যংশ, এবং তটস্থা শক্তি যখন শক্তিমানে তাদাত্ম্যভাবে বর্ত্তমান থাকে, তখন জীবত্ব অনভিব্যক্ত থাকে ; যখন জীবত্বের অভিব্যক্তি হয়—অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম হইতে দৃশ্যতঃ পৃথকরূপে প্রতীত হয়, তখন ব্রহ্ম বা ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সহাবস্থান বর্ত্তমান থাকে ; আবার জীব যখন সংসার যাত্রা হইতে অব্যাহতি লাভ করে, তখনও ব্রহ্ম বা ভগবানের সহিত তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিতি করিয়া (সূত্র ৪।৫।৪), ভগবানের সহিত সমুদায় ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন (সূত্র ৪।৪ ৮, ৪।৪।১৪)। সুতরাং জীব কি অনভিব্যক্ত অবস্থায়, কি অভিব্যক্ত অবস্থায়, কি মুক্ত অবস্থায়—সমুদায় অবস্থায়, সর্ব্বকালে ব্রহ্ম বা ভগবানে নিত্য অবস্থান করেন। ৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৮।৪ মন্ত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। উক্ত শ্রুতির ৭।২৫।২ মন্ত্র বিশদভাবে প্রকাশ করেন, যে আমাদের উপরে, নীচে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্র আত্মা বর্ত্তমান। সাগরে নিমগ্ন ঘটের ন্যায় আমরা আত্মা সাগরে নিমগ্ন। বলা বাহুল্য যে আত্মা, ভগবান, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সৎস্বরূপ সমুদায় একপর্য্যায় ভুক্ত। তাঁহার সত্তায় আমরা সত্তাবান, তাঁহার নিয়ন্ত্রণে আমরা ক্রিয়াশীল। আমাদের দৈহিক, মানসিক সমুদায় ব্যাপারের তিনি পরিচালক, নিয়ন্তা ও সাক্ষী। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, যে আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, আত্মায় বা ব্রহ্মে বা ভগবানে আমাদের শাশ্বত অবস্থান বা নিত্য আসন চির বর্ত্তমান।

উপাসনা :—

উপাসনা—উক্ত নিত্য আসনের অনুকল্পে উপ আসন কল্পনা :—ব্রহ্মে বা ভগবানে আমাদের নিত্য আসন হইলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, আমরা অধুনা, সৃষ্টির অভিব্যক্তির যে স্তরে বর্ত্তমান, তাহাতে আমাদের অনুভূতি আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে নিবদ্ধ। এই ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখীন, বহির্বিষয়ে ইহারা নিমগ্ন। আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারে বহির্বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। অন্য কথায় বহির্বিষয়েই আমাদের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এই বহির্বিষয়ই এক কথায় বিষয় নামে অভিহিত। বিশেষেণ সিনোতি-বধ্নাতি এই ব্যুৎপত্তিতে বিষয় শব্দ নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ এই, যে যাহা বিশেষরূপে বন্ধন করে, তাহাই বিষয়। সেতুপদ, ঐ একই "সি" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

নদী প্রভৃতি জল প্রবাহ দ্বারা পরস্পর অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন উভয় কূলকে বন্ধন করিয়া রাখে বলিয়া "সেতু" নামের সার্থকতা। সেইরূপ দৃশ্যতঃ ব্যবহারিকভাবে পরস্পর একান্ত বিভিন্ন জড় ও চৈতন্যের সংযোগ সাধন করে বলিয়া "বিষয়" পদের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থের সার্থকতা। এই সংযোগকে চৈতন্যের, জড়ের সহিত বন্ধন বলা যায়। যেমন নোঙ্গর নদী স্রোতের উপর ভাসমান নৌকা বন্ধন করিয়া রাখে, বিষয় সেইরূপ চৈতন্যকে বন্ধন করিয়া রাখে। সুতরাং বিষয় সকল, বন্ধনের কারণ এবং উহাতে উত্তরোত্তর অধিক নিমজ্জন, উত্তরোত্তর অধিক বন্ধনের কারণ হয়। এজন্য মধ্যে মধ্যে বিষয় হইতে মন প্রত্যাহৃত করিয়া শাশ্বত, নিত্য, আসনের অভাবে উপ-আসন কল্পনা করিয়া, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। এই "উপ" বা সমীপে অর্থাৎ শাশ্বত, নিত্য আসনের অনুকল্পে সমীপে আসন কল্পনা "উপাসনা" নামে কথিত। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ব্রহ্মে বা ভগবানে আমাদের নিত্য আসন প্রতিষ্ঠিত হইলেও, আমরা যখন উহা বিস্মৃত হইয়া অবিদ্যাধিকারে পতিত হইয়াছি, তখন উক্ত নিত্য আসনের সহিত নিত্য সম্বন্ধ মনে জাগাইয়া রাখিবার জন্য, উপ-আসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন—অর্থাৎ প্রতিদিন অল্পবিস্তর উপাসনা করা আবশ্যক। ইহাই উক্ত বিস্মৃতি হইতে মুক্তিলাভের উপায়। এই মুক্তি লাভেই পুরুষার্থ সিদ্ধি। ভগবান সূত্রকার "উপপূর্ব্বমপিত্বেকে ভাবমশনবৎ, তদুক্তম্॥" ৩।৪।৪২ সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অশন—অন্নাদি আহার যেমন শরীর রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সেইরূপ "উপপূর্ব্বম্ ভাবম্"—বা উপাসনা—পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূ ধাতু ও অস্ ধাতুর অর্থ এক, সুতরাং উপপূর্ব্বম্ ভাবম্ যা, উপাসনাও তাই। এই উপাসনা দ্বারা চিত্তমল ক্ষালন হইলেই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে—ইহাই পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি।

প্রাকৃতিক নিয়মে সকলে কোন না কোন প্রকারে উপাসনা করিতে বাধ্য ঃ—

উপ-আসন কল্পনা পুরুষের ইচ্ছাধীন। উপাসনার উদ্দেশ্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ব্রহ্ম বা ভগবদভিমুখে নিয়োগ—অন্য কথায় মনের ভাব বা স্পন্দন বিষয় হইতে ফিরাইয়া ভগবানের দিকে প্রেরণ। প্রাকৃতিক নিয়মে ইহা স্বতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। কি প্রকারে হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভগবান মায়াশক্তি বিকাশে বিশ্ব সৃষ্টি করেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই শক্তি তাঁহাতে তাদাত্ম্যভাবে লীন ছিল, অভিব্যক্তি ছিলনা। উপনিষদের ভাষায় বলা হয়, তখন মায়া বা প্রকৃতি, অব্যাকৃত ছিল। সৎস্বরূপের চিদাকাশে সংকল্প-রূপ স্পন্দন উত্থিত হইলে এই অব্যাকৃতা প্রকৃতির গুণক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অভিব্যক্তি হয়। আমরা জানি আলোক, স্পন্দন

হইতে উদ্‌ভূত। স্পন্দনের বিভিন্নতার জন্য উহা রক্ত, হরিদ্রা, হরিৎ, নীল, ধূসর প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের আলোকরূপে অভিব্যক্ত হয়; সেইরূপ রজঃ গুণের উপর সংকল্প-রূপ স্পন্দন ক্রিয়াশীল হইয়া 'অ' কার, সত্ত্বগুণের উপর উক্ত স্পন্দনের ক্রিয়া 'উ' কার, এবং তমঃ গুণের উপর উক্ত ক্রিয়া "ম" কার অভিব্যক্ত করে এবং উহাদের সমবায়ে "ওঁম্" কারের অভিব্যক্তি প্রকট করে। চিদাকাশে ইহা আদি নাম, মহাকাশে ইহা আদি শব্দ, চিত্তাকাশে ইহা প্রণব। জগতের সমুদায় বস্তুতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ন্যূনাধিক্যে বর্ত্তমান আছে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও এই তিন গুণের ন্যূনাধিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সুতরাং 'অ'কার 'উ'কার ও 'ম'কার হইতে প্রবাহিত স্পন্দন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিস্থ রজঃ, সত্ত্ব ও তমো গুণকে স্পন্দিত করিয়া যথাক্রমে ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি উদ্বোধিত করে। ইহা স্পষ্টতঃ কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদে কথিত আছে। মৎকৃত "গায়ত্রীরহস্য" পুস্তকে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল মাত্র।

আঘাত থাকিলে প্রতিঘাত থাকিবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। কোনও স্থির, স্তিমিত জলাশয়ে একটি লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিলে, উহা জলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং সেই তরঙ্গ সকল তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং তীরে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিপরীত মুখে কেন্দ্রের দিকে, অর্থাৎ যে স্থানে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়া তরঙ্গ উৎপাদনের কারণ হইয়াছিল, সেই স্থানের দিকে আসিতে থাকে। লোষ্ট্র অতি ক্ষুদ্র হইলে তরঙ্গের শক্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে, এবং তাহা তীরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মিলাইয়া যায়, অথবা তীরে অতি ক্ষীণ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে উক্ত ত্রিবিধ স্পন্দনের অভিঘাত, প্রত্যভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানরূপে মূল কেন্দ্রাভিমুখে ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ যে সৎস্বরূপ কেন্দ্র হইতে মূল স্পন্দন উৎপন্ন হইয়াছে, তদভিমুখে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ আসিতে বাধ্য হয়। সুতরাং জগতে সকলেই প্রাকৃতিক নিয়মে উপাসনা করিতে বা সৎস্বরূপ কেন্দ্রাভিমুখে মনোবৃত্তির স্পন্দন প্রেরণ করিতে বাধ্য, ইহা বুঝা গেল। ইচ্ছা করুক বা না করুক, সকলেই কোন না কোনও প্রকারে বাহ্য দৃষ্ট বিষয় সকলের অন্তরে কোনও অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় শক্তি থাকিয়া উহাদিগকে পরিচালিত করে, এই ধারণা পোষণ করে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি বহুসময় সাপেক্ষ। সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতি বুঝাইবার জন্য যে চিত্র ৩২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে সৃষ্টির এক চক্র পরিভ্রমণ করিতে এক কল্পকালের প্রয়োজন, উহা ব্রহ্মার একদিন। এইরূপ ব্রহ্মার দিনের পর দিন, চক্রের পর চক্র পরিচালিত হইতেছে। এবং বিশ্বের পরমায়ু ঐ প্রকার দিন পরিমাণে ব্রহ্মার একশত বৎসর। উহা মানব হিসাবে কত বৎসর পরিমাণ, তাহা কল্পনা করিতে মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রম পরিণতি কত কালে হইবে,

তাহার ইয়ত্তা নাই। জীব যদি নিজের প্রচেষ্টা বিশ্ব শক্তির সহিত সংযোজিত করিতে পারে, তবে কার্য্যসিদ্ধি শীঘ্র শীঘ্র হয়। আত্মার শক্তি অনন্ত, ইহা ৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৫।৯ মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে। বিশ্বশক্তির সহিত এই আত্মিক শক্তি মিশাইতে পারিলে যে সিদ্ধি আসন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? যোগ শাস্ত্রে স্পষ্ট উপদেশ আছে:—"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ"। পাতঞ্জল-দর্শন, সমাধিপাদ। ২১। যাহাদের সংবেগ তীব্র তাহাদের আসন্ন। অর্থাৎ যাহাদের আগ্রহ তীব্র, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র পুরুষার্থ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে সকলের বাধ্য হইয়া ব্রহ্মাভিমুখে স্পন্দন প্রেরণ করিতে হইলেও সকলের জ্ঞানতঃ তীব্র ভাবে, আগ্রহের সহিত সাধনা বা উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

বিষয়ের স্বরূপ:—

উপরে একাধিকবার বলা হইয়াছে, যে মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মাভিমুখে নিয়োগ করা প্রয়োজন। ইহাতে মনে প্রশ্ন উঠে, বিষয়ের স্বরূপ কি? এবং উহার সহিত ব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের সম্বন্ধ কি? শ্রীমদ্ ভাগবত কয়েকটি শ্লোকে ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। শ্লোক কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথম, ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব কি, এই প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন:—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।। ভাগঃ ১।২।১১

—ইহার অর্থ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোক হইতে বুঝা গেল যে একই বস্তু বিভিন্ন লক্ষ্যস্থান হইতে বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। বস্তুর বিভিন্নতা নাই; উহা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শ্রীমদ্ ভাগবত আবার বলিতেছেন:—

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে।। ভাগঃ ৩।৩২।২১

—জ্ঞানমাত্র স্বরূপ ভগবানই, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এবং পরমপুরুষ শব্দে প্রসিদ্ধ। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং জ্ঞানমাত্রস্বরূপে সকল পদার্থে সম হইলেও দৃশ্যাদি পৃথকভাবে, অর্থাৎ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণরূপে পৃথক প্রতীয়মান হয়েন। ভাগঃ ৩।৩২।২১

ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে ভগবান, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরমপুরুষ, দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং যে করণ বা ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের, শ্রোতার সহিত শ্রাব্যের, আঘ্রাতার সহিত ঘ্রেয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—এই সমুদায় এক পরমতত্ত্ব ভিন্ন কিছু নহে। আমরা পূর্ব্বে যে সমুদায় আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও আমরা

এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে যিনি অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বরূপে স্বস্বরূপে ছিলেন, তিনি নিজ ইচ্ছা বশতঃ দ্বৈত মধ্যে অবতরণ করিয়া পৃথকভাবে প্রতীত হন মাত্র। এই পৃথক্ প্রতীতি কি প্রকারে হয়, তাহার অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত বলিলেন :—

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্মনির্গুণম্।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মণা॥ ভাগঃ ৩।৩২।২৩

—জ্ঞানময় নির্গুণ ব্রহ্মই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি যাহার ধর্ম্ম তাদৃশ অর্থরূপে অবভাসমান হয়েন।

ভাগঃ ৩।৩২.২৩

সুতরাং শব্দাদি, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয় সকল, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই,—বহির্ম্মুখে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা তাহারা বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। একখণ্ড ত্রিপল কাচের মধ্য দিয়া শ্বেত সূর্য্যালোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উহার শ্বেতবর্ণ অনুভব হয় না, রামধনুর বর্ণ রঞ্জনা—পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ একমাত্র জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়দ্বারে বিভিন্ন বিষয়রূপে পরিদৃষ্ট হন। বস্তু প্রকৃত যাহা, তাহাই থাকে।

ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে পারিলে আর বিষয় প্রতীতি থাকে না, আত্মদর্শন হয় :—

উপরে লিখিত শ্রীমদ্ ভাগবত বর্ণিত সিদ্ধান্তের, বিপরীত বিচারে অনুসিদ্ধান্ত আপনিই আসিয়া পড়ে, যে ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তর্ম্মুখীন করিতে পারিলে, আর বিষয়ের প্রতীতি থাকে না। ব্রহ্ম বা আত্মা বা ভগবান তখন অনুভূতি গোচর হন। কঠশ্রুতি ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ কঠ ২।১।১

—স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গনকে বাহ্য পদার্থ দর্শী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কারণে জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অল্পমাত্র ধীর ব্যক্তিই অমৃতত্ব অর্থাৎ নিজের স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্তির ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কঠ ২।১।১

উদ্ধৃত মন্ত্রে "খানি", ইন্দ্রিয়গণ চক্ষুঃকর্ণাদি এবং চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক অন্তঃকরণ এই উভয়ের উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রোক্ত "আবৃতচক্ষুঃ" পদের অর্থ "প্রত্যাহৃত সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ" অর্থাৎ স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তর্ম্মুখীন করিলে তবে প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত (প্রতি অঞ্চতীতি

প্রত্যক্) আত্মা অনুভূতি গোচর হন, ইহা শ্রুতি মন্ত্রের লক্ষ্য। উক্ত শ্রুতির ১।৩।১২ মন্ত্র ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, মন্ত্রটী এই :—

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। কঠ ১।৩।১২

—এই আত্মা সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশ পান না। পরম সূক্ষ্মদর্শী পুরুষ একাগ্রতাযুক্ত ও সূক্ষ্ম বা যোগাদি সাধনে পরিশোধিত বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান। কঠ ১।৩।১২

শ্রুতির এই দুই মন্ত্রে উপাসনার মূলতত্ত্ব নিহিত।

বিষয় ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর নহে, তবে শাস্ত্রে হেয় বলিয়া নিন্দিত কেন ? :—

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতির ও স্মৃতির প্রমাণ সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বিষয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্বান্তর নহে, তবে ইহা শাস্ত্রে হেয় বলিয়া নিন্দিত কেন, উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বন্ধনের কারণ কেন, এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবৃত্ত করিবার উপদেশ কেন? ইহার উত্তর আমরা ক্রমশঃ বুঝিবার চেষ্টা করিব। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩২।২৩ শ্লোকে "ভ্রান্ত্যা" পদ আছে। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি, যে ইন্দ্রিয় দ্বারে বিষয় দর্শন—ভ্রান্তি দর্শন—অসম্যক্ দর্শন। সমুদায়ে, এমন কি বিষয়েও, ব্রহ্মদর্শনই,—সম্যক্ দর্শন—প্রকৃত দর্শন—সত্যদর্শন—অভ্রান্ত দর্শন। এ ভ্রান্তি দর্শন ভগবানের বিধানানুসারে হইয়া থাকে। ইহা তাঁহারই জগৎ সৃষ্টিকারিণী মায়াশক্তির কার্য্য। সপ্তশতী চণ্ডীতে এজন্য ঋষি বলিয়াছেন :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। চণ্ডী ৫।৭৬
—যে দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিত আছেন।

এই ভ্রান্তি ভগবদ্ প্রবর্ত্তিত অব্যভিচারী নিয়মের ফল। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জগৎ ক্রীড়নকের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা ক্রীড়া পরিচালনোপযোগী সাধক নিয়মের অপব্যবহার জনিত প্রায়শ্চিত্ত কল্পে শাসক নিয়মানুসারে সংঘটিত। উপাধির অভিমানে অভিমানী হইয়া, জীব যখন স্বীয় কল্পিত স্বাধীনতা পরিচালনে, উক্ত সাধক নিয়মের অপব্যবহার করিল, তখন সে অপব্যবহারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত যে তাহাকে করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই প্রায়শ্চিত্ত সংসাধনের জন্য জীবের অবিদ্যাধিকারে পতন। মায়াতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে অবিদ্যার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা উভয়বিধ শক্তি আছে। আবরিকা শক্তির দ্বারা জীবের স্বরূপভূত জ্ঞানাবরণ এবং বিক্ষেপিকা শক্তির দ্বারা ভ্রান্তি সংঘটন। তবে ইহা সাময়িক মাত্র। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়ও ভগবান কর্ত্তৃক শাস্ত্রে বিহিত। ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া

অন্তর্মুখে আনয়ন, ঐ উপায় সকলের মধ্যে প্রধান উপায়। যে কর্ত্তৃত্বের পরিচালনে জীব অবিদ্যার অধিকারে পতিত হইয়াছে—সেই কর্ত্তৃত্বের পরিচালনেই উক্ত অধিকার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই শেষোক্ত কর্ত্তৃত্ব পরিচালনের অপর নাম "উপাসনা"—ভগবান সূত্রকার বাদরায়ণের ভাষায "সংরাধন" (সূঃ ৩।২।২৪)।

বাহ্য জগৎ ও মানস জগৎ :—

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে সৎস্বরূপের সংকল্পেই পাঞ্চভৌতিক জগৎ সৃষ্টি—ইহাই পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগৎ। এতদ্ভিন্ন মনোময় জগৎ বিদ্যমান—বিপুলতায় উহা বাহ্য জগৎ অপেক্ষা হীন নহে। ফলতঃ উহা বাহ্য জগতের মনোময়ী প্রতিচ্ছবি, বৈচিত্র্যে উক্ত মনোময় জগৎ বাহ্য জগৎ অপেক্ষা অধিক বলা যায়। বাহ্য জগৎ ঈশ সৃষ্ট—মনোময় জগৎ জীব সৃষ্ট। ঈশ সৃষ্ট যত কিছু—তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একরূপ, সকলের পক্ষে সমান। উহাদের স্বতঃ সুহৃৎ, মিত্র, দ্বেষ্য, শত্রু বর্ত্তমান নাই। মনই সুহৃৎ, মিত্র, দ্বেষ্য, শত্রু ভাব ঐ সকলে আরোপ করিয়া থাকে এবং সেজন্য ঐ সকল হইতে উত্থিত সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকে। স্ত্রীমূর্ত্তি—ঈশ সৃষ্ট—সর্ব্বদেশে একরূপ। কিন্তু জীব-সৃষ্ট মানস জগতে, ঈশসৃষ্ট স্ত্রীমূর্ত্তি—মাতা, পিসী, মাসী, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি কত বিভিন্ন প্রকার মনোময়ী মূর্ত্তিতে আমরা কল্পিত করিয়া থাকি। উহাদের প্রত্যেকের সহিত বিভিন্ন প্রকার আচরণ, প্রত্যেক হইতে বিভিন্ন প্রকার ভোগ আকাঙ্ক্ষা এবং উক্ত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাবের উপর, আমাদের সুখ দুঃখ নির্ভর করে।

মণি ঈশ্বর সৃষ্ট—উহাতে স্বতঃ প্রিয়, অপ্রিয় বা উপেক্ষ্যভাব নাই। উহাতে উক্ত ভাব সকল আমাদের মনঃকল্পিত এবং সেই সেই ভাবের জন্য উহার প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সুখ বা দুঃখ ভোগ। এ প্রকার কত দৃষ্টান্ত দিব। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, যে জীবের সুখ দুঃখ, জীবের মনঃ কল্পিত মানস জগতের উপর নির্ভর করে। মনোময় জগন্নির্মাণের অবলম্বন, বাহ্য জগৎ বটে—কিন্তু মনোময় জগৎই জীবের সংসার বন্ধনের কারণ, এজন্য সংক্ষেপে বলা হয়, মনই সংসার। পঞ্চদশীকার একটী শ্লোকার্দ্ধে ইহা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য বন্ধকৃৎ মানসং জগৎ। পঞ্চদশী ৪।৩৫

—মানস জগৎই সর্ব্বজীবের বন্ধনের কারণ।

শ্রুতিও স্পষ্টভাবে ঈশ সৃষ্টি ও জীব সৃষ্টি উল্লেখ করিয়াছেন :—

ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীব কল্পিতঃ॥

মহোপনিষৎ ৪।৭৩

—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কথিত সৎস্বরূপের ঈক্ষণ হইতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সৃষ্টি ঈশ্বর কল্পিত, আর জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সংসার জীব কল্পিত। মহোঃ ৪।৭৩

সংসার যখন জীব কল্পিত, তখন সংসার হইতে উত্থিত সুখ দুঃখ জীবকে ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বলা বাহুল্য যে সংসারের সুখ নিরপেক্ষ, শাশ্বত সুখ নহে, উহা আপেক্ষিক সুখ মাত্র এবং উহা দুঃখের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু নহে—কিন্তু যেমন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এক জাতীয়, সেজন্য দুঃখের প্রতিক্রিয়ারূপ সুখ, দুঃখই ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে ইহা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

দুঃখেষ্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু।
জীবস্য নব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেত্তত্তৎ প্রতিক্রিয়া॥ ভাগঃ ৪।২৯।২৯

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন সমাধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥ ভাগঃ ৪।২৯।৩০

—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের সকলেরই প্রতিক্রিয়া আছে, তথাপি ঐ প্রতিক্রিয়াও দুঃখরূপ হওয়াতে দুঃখের সম্পূর্ণ বিয়োগ হইতে পারে না। যেমন কোনও পুরুষ মস্তকে গুরুভার বহন করিতে করিতে অতিশয় কষ্ট পাইলে, তাহার প্রতিকারার্থ উক্ত ভার মস্তক হইতে নামাইয়া স্কন্ধে স্থাপন করিয়া মস্তককে কথঞ্চিৎ আরাম প্রদান করে, কিন্তু তাহাতে ভারবহনের আত্যন্তিক প্রতিকার হয় না। সমুদায় দুঃখের প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ। ভাগঃ ৪।২৯।২৯-৩০

সুতরাং সংসারে সুখভোগই যে পুরুষার্থ প্রাপ্তি, তাহা নহে। সুখভোগও বন্ধন—তবে এ বন্ধন লৌহ শৃঙ্খলের না হইয়া স্বর্ণ শৃঙ্খলের, কিন্তু তাহা হইলেও বন্ধনের কঠোরতার অল্পতা নাই। বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই পুরুষার্থ প্রাপ্তি। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াও, অসঙ্গ বলিয়া যেমন নির্লিপ্ত থাকেন, জীব যদি সাধনা দ্বারা অসঙ্গ থাকিতে পারে, তবে জীবেরও কোনও বন্ধন নাই। ভগবান গীতায় ইহার উপদেশ স্পষ্টভাবে দিয়াছেন।

বিষয় স্বতঃ দোষাবহ নহে, তবে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহারের উপদেশ কেন? :—

অতএব বিষয়, বিষয় হিসাবে দোষাবহ নহে—উহা ঈশসৃষ্ট; উহা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সকলের পক্ষে একরূপ। আমরা উহার যে মূর্ত্তি কল্পনা করি, তাহাই

দোষাবহ—তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। সাধারণ জীবের জীবন ধারণ জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় অধিক নহে। কিন্তু আমাদের সম্ভোগ অপেক্ষা সঞ্চয়ের আগ্রহ অধিক। সামান্য ২।৪টি মিষ্ট আম্রভক্ষণে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে আমি সন্তুষ্ট নহি, আমার শতবিঘাব্যাপী আম্রকানন না হইলে চলে না। আমার দেহ ধারণের জন্য প্রতিদিন একপোয়া চাউলের অন্ন যথেষ্ট, কিন্তু আমি তাহাতে সন্তুষ্ট নহি, বিস্তৃত তালুক, জমিদারী প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিতে পশ্চাদ্‌পদ নহি, নানা প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত নহি। উহাদের সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হইলে কত মনঃ কষ্ট, ইহা আমাদের সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সমুদায় বিষয় সম্বন্ধে ঐ একই কথা। সুতরাং বুঝা গেল, যে বিষয় সম্বন্ধে আমরা যে মনোভাব পোষণ করি, তাহাই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ। উহা স্বতঃ অমঙ্গলজনক নহে।

বিষয় যদি স্বতঃ দোষাবহ নহে, তবে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিবার উপদেশ শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ দেওয়া হইয়াছে কেন? আমরা বুঝিয়াছি, যে জীবের সংকল্পানুসারে মনোময় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং মনোময় জগৎ সৃষ্টির অবলম্বন বিষয়—বিষয়কে ভোগ্য কল্পনা করিয়া আমরা মনোময় জগৎ সৃজন করিয়া থাকি। বিষয় বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয় দ্বারে উপলব্ধ হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিষয়কে ভোগ্য কল্পনা করিয়া, তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে, বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়ের বশে থাকিতে হয়, এবং তাহাতে পরমতত্ত্বের প্রতীতি হইতে ক্রমশঃ দূরে অপসারিত হইতে হয়। শ্রুতি প্রমাণে আমরা আরও বুঝিয়াছি, যে ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে না পারিলে, পরমতত্ত্ব অধিগত করিবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিবার জন্য শাস্ত্রে উপদেশ। ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ বিহিত নহে, উহাদিগকে প্রত্যাহরণ করিয়া অন্তর্ম্মুখীন করাই উপদেশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে চৈতন্যের সহিত জড়ের সম্মিলনে বা ভোক্তার সহিত ভোগ্যের সংযোগে সংসার। এই সম্মিলন অগ্নির সহিত জলের মিলনের ন্যায়;—অগ্নি সংযোগে জলের স্বাভাবিক শৈত্যগুণ তিরোহিত হয়, জল অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা গ্রহণ করে, অগ্নিও জলের সংযোগে প্রকাশিকা শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং জলের শৈত্যগুণের সংস্পর্শে তাপের উগ্রতা প্রশমিত হইয়া তাপমান যন্ত্রের নির্দিষ্ট ১০০°C এ থাকিতে বাধ্য হয়। সেইরূপ জড় ও চিতের সংমিলনে উভয়ের ধর্ম্ম উভয়ে সংক্রামিত হয়। চিৎ জড়ধর্ম্ম এবং জড় চিৎএর ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অগ্নির ন্যায় চিৎ এর প্রকাশিকা শক্তি জড সংস্পর্শে আবৃত থাকে; জড়, চিতের সংশ্লেষে, অভিমান, কামনা, বাসনা প্রভৃতি আকারে প্রকটিত হয়। সংসার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, চিৎ এর স্বরূপাভিব্যক্তির প্রয়োজন—বা জড় সংশ্লেষ হইতে চিৎ এর মুক্তি সংঘটন আবশ্যক। ইন্দ্রিয় দ্বারে উভয়ের মিলন ঘটিয়া থাকে, সুতরাং উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইলে,

ইন্দ্রিয় দ্বার অবরোধ আবশ্যক—শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাই জড় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ, একারণ শাস্ত্রে ঐ প্রকার উপদেশ বিহিত হইয়াছে।

বিষয়ের সহিত জীবের সংস্পর্শ ভগবদ্ বিধানে সংঘটিত :—

বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ যদি প্রত্যেক শ্রেয়োকামীর কর্ত্তব্য, তবে জীবের বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ কেন? ভগবান ত বিষয় হইতে বিরাগ, জীবের স্বভাব সিদ্ধ করিয়া দিতে পারিতেন; তাহা না করিবার কারণ কি! ধীরভাবে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলে আমরা বুঝিতে পারি, যে বিষয়ের সহিত জীবের সংস্পর্শ, ভগবানের মঙ্গল বিধানে সংঘটিত। বিষয়ের সংস্পর্শেই, জীব আপনার জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ এক কথায় বিষয় হইতে আপনার পৃথকত্ব, আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে বলিয়া, জীব বিষয়ে এত অনুরক্ত। পরিবর্ত্তন স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত সদা পরিণামী বিষয়ের সংসর্গে—আপনার অপরিণামী, শাশ্বত, নিত্য অস্তিত্বের সন্ধান পায়। সাধনার প্রথম স্তরে ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। যেমন উচ্চ গৃহের চূড়ায় উঠিতে হইলে সোপানাবলীর সাহায্য প্রয়োজন; নিম্নের ধাপ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ ধাপে আরোহণ করিতে হয়, এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া চূড়ায় উঠিতে হয়, এবং উঠিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, যে আরোহণের জন্য প্রত্যেক ধাপ অপরিহার্য্য; সেইরূপ সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে হইলে, ক্রমশঃ নিম্ন বিষয় হইতে উচ্চ বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণকে উত্তোলিত করিতে হয় এবং ক্রমশঃ যখন সাধনার সর্ব্বোচ্চস্তরে উঠিতে সমর্থ হওয়া যায়, তখন বুঝা যায়, যে কি নিম্ন, কি উচ্চ, সমুদায় বিষয় প্রয়োজনীয়, একটিকে পরিহার করিয়া অপরটি গ্রহণ করা যায় না। ভগবানের বিধানে সকলই আবশ্যক। সুতরাং বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ দোষের নহে। উহার সাময়িক উপযোগিতা বর্ত্তমান। বিষয়ে "অহংমম" ভাবই দোষের। উহাই বন্ধনের কারণ। বিষয়ে উক্ত ভাব সংযোগ না করিয়া, যদি বিষয় উপভোগ করা যায়, তবে বন্ধন নাই, কোনও দোষ নাই। ভগবান গীতায় ইহার উপদেশ ভূয়োভূয়ঃ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা সহজসাধ্য নহে। অনেক সাধনায় উহা অধিগত হইতে পারে। একারণ সাধনার প্রথম স্তরে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণের উপদেশ।

মন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ও রাজা—মনকে বশে আনিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন হয় :—

মন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক, নিয়ন্তা ও রাজা। মানস জগৎ—মনেরই ক্রিয়া। যেমন কণ্টক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা না কাটিয়া মূলচ্ছেদ করিলে, বৃক্ষটির নাশ করা যায়, সেইরূপ ইতর ইন্দ্রিয়গণকে ছাড়িয়া মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই অভীপ্সিত জড় হইতে চৈতন্যের বিচ্ছেদ সংসাধিত হইতে পারে। একারণ যোগশাস্ত্রে এবং অন্যান্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রে মনঃনিগ্রহের উপদেশ। মন, চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহংকারাত্মক অন্তঃকরণের সাধারণ

ও পরিচিত নাম। মন নিয়োগ না করিলে, ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া অনিষ্টকারী হয় না, বন্ধনের কারণ হয় না। পূর্ব্বে ৯১ পৃষ্ঠায় যে অভ্যাস বা প্রকৃতি গঠনের কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতির শক্তিতে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে অনুধাবন করিবে, তাহা করিলেও, যদি মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সংস্পর্শ হইতে আপনাকে পৃথকভাবে রাখিতে অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ পুরুষার্থ প্রাপ্তির পথ সুগম হয়। গীতায় শ্রীভগবান ইহাই বলিয়াছেন।

> নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
> পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।। গীতা ৫।৮
> প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
> ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। গীতা ৫।৯

> —কর্ম্মযোগী তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার সংসাধন করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়; বুদ্ধি দ্বারা ইহা ধারণা করায়, "আমি কিছু করি না" ইহা মনে করেন। গীতা ৫.৮-৯

সমুদায় কার্য্য ইন্দ্রিয়ের, আত্মার নহে, এই প্রকার চিন্তা অহর্নিশ করায় কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, সুতরাং বন্ধন থাকে না; উপাসনা ক্ষেত্রে এ প্রকার চিন্তা অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রকার চিন্তা অভ্যাস করিবার জন্য মনকে সংযত করা অত্যাবশ্যক।

মনই সংসার—ইহা বলা হয় কেন?:—

উপরে বলা হইয়াছে, মনই সংসার। ইহা বিশদরূপে বুঝিবার জন্য আমাদের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। আমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছি, উহা আমার নিকট হইতে দূরে অবস্থিত। উহার সহিত আমার কোনও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ কোনও প্রকার সংস্পর্শ নাই। আলোক তরঙ্গ বৃক্ষ হইতে প্রতিহত হইয়া আমার চক্ষু গোলকে প্রবিষ্ট হইয়া উহার অভ্যন্তরে অবস্থিত দর্শন পট (Ratina) স্পন্দিত করে—এবং সেই স্পন্দন দর্শন পটের সহিত সংগ্রথিত স্নায়ু সমূহকে (Sensory nerves) স্পন্দিত করত, মস্তিষ্কের অংশ বিশেষে নীত হয়। মস্তিষ্কই অনুভূতি উৎপাদনের স্থূল যন্ত্র। উহার পশ্চাতে অর্থাৎ উহা হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম যন্ত্র অন্তঃকরণ—চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহংকার—ইহারা সমবায়ে মন নামে পরিচিত। বাস্তবিক পক্ষে উহারা প্রত্যেকে অন্তঃকরণের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি। বৃক্ষ হইতে প্রতিফলিত আলোক স্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হইয়া চিত্তে বৃক্ষের একটি প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করে। অন্যান্য বাহ্যবস্তুর প্রতিচ্ছবিও চক্ষু এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারে—ঐ একই প্রকারে চিত্তে অঙ্কিত হয়। পরে অন্য কোনও একটি বস্তুর

প্রতিচ্ছবি চিত্তে নীত হইলে, মন প্রথমে উহা পূর্ব্বাঙ্কিত প্রতিচ্ছবি সকলের সহিত তুলনা করে এবং ইহা বৃক্ষের বা অন্য কোনও প্রকার বস্তুর প্রতিচ্ছবি এই প্রকার বিকল্প উত্থাপন করিয়া বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করে, বুদ্ধি পূর্ব্বাঙ্কিত বৃক্ষের ছবির সহিত তুলনায়—ইহা বৃক্ষেরই প্রতিচ্ছবি এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া অহংকারের নিকট স্বীয় সিদ্ধান্ত উপস্থিত করে। অহংকার উহা বৃক্ষের প্রতিচ্ছবি রূপে গ্রহণ করিয়া প্রাণ বা কর্ম্মশক্তির দ্বারা পরিচালিত স্নায়ুগণের (Motor nerves) সাহায্যে, উক্ত ছবি অক্ষিগোলকের নিকট প্রতিপ্রেরণ করে এবং সেখান হইতে চক্ষুর্দ্বারে উহা বাহিরে আলোক স্পন্দনের আকারে বৃক্ষে পুনরাগত হইলে, তবে আমাদের বৃক্ষ দর্শন সম্পূর্ণ হয়। এতগুলি ক্রিয়া পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে সংঘটিত হইলেও তড়িৎ ক্রিয়ার ন্যায় উহা এত শীঘ্র শীঘ্র হয়, যে উহা যুগপৎ সম্পাদিত হয় বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, যে আমাদের বাহ্য জগতের প্রতীতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তঃকরণের উপর নির্ভর করে। যেমন কোনও রুদ্ধ গৃহের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি গবাক্ষপথে বহির্জগতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়—সেইরূপ আমাদের অন্তঃকরণ বা মন ইন্দ্রিয়রূপ গবাক্ষপথে বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করে। ইন্দ্রিয়গণ উপায়মাত্র, অন্তঃকরণ বা মন উক্ত জ্ঞান লাভের প্রধান সাধন। অতএব ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, আমাদের জগৎ আমাদের নিজস্ব এবং উহা আমাদের মনের উপর নির্ভর করে—একারণ মনই আমাদের সংসার। মনকে উপযুক্ত-রূপে শিক্ষিত করিতে পারিলে—আমাদের জগদ্দর্শন—ভ্রান্ত দর্শন না হইয়া ব্রহ্ম দর্শনে পরিণত করা যাইতে পারে। অন্য কথায় বিষয় নিমগ্ন মনই বন্ধনের হেতু এবং নির্ব্বিষয় মন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন মন মোক্ষের হেতু। উপনিষৎ ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥ ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ ২;
মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৪.১১

—মনই মানবগণের বন্ধ মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত মনই বন্ধের হেতু এবং নির্ব্বিষয় মনই মুক্তির হেতু।

চিত্ত এবহি সংসারো রোগাদিক্লেশদূষিতম্।
মহোপনিষৎ ৪।৬৬

—রোগাদি ক্লেশদূষিত চিত্তই সংসার।

বলা বাহুল্য চিত্ত মনের পর্য্যায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। ভাগবত বলিতেছেন :—

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃপরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ ॥

ভাগঃ ১১।২৩।৩৮

—এই সমুদায় দুষ্ট মানব, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম, কাল ইহারা কেহই আমার সুখদুঃখের হেতু নহে, কেবল একমাত্র মনই তাহার কারণ; মনই সংসার চক্র পরিভ্রমণ করাইতেছে। ভাগঃ ১১।২৩।৩৮

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥ ভাগঃ ১২।৫।৬

—মনই আত্মার দেহ, গুণ ও কর্ম্মসকল সৃষ্টি করে। মায়া সেই মনের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেইজন্য জীবের সংসার গতিপ্রাপ্তি হয়।

ভাগঃ ১২।৫।৬

মায়া দ্বারা মনঃ সৃষ্টি—ভগবানের ইচ্ছানুসারে, বা তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসক নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মায়া সংসার গতাগতির কারণ নহে। মনই তাহার প্রত্যক্ষ কারণ, কেননা মনই দেহ, গুণ ও কর্ম্মাদি সৃষ্টি করে।

ভাগবত অন্যত্র এই কথাই বলিলেন :—

মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্ ॥ ভাগঃ ৪।২৯।৭৬

—হে রাজন্! মনই ভূতগণের সংসারে গতাগতির কারণ।

অতএব আমরা বুঝিলাম, মনের ক্ষমতা অসীম। মনের কল্পনা বলেই—জীবের কল্পিত স্বাধীনতা, এবং তাহার পরিচালনে ভগবানের বিশ্বক্রীড়ার সাধক নিয়মের অপব্যবহার এবং অবিদ্যাধিকারে পতন। মনের সংকল্পেই সংসার, জীবের দেহ, পারিপার্শ্বিক সন্নিবেশ, জন্মমৃত্যু স্রোতে উত্থান-পতন, স্বরূপ-আবরণ, ভ্রান্তি দর্শন প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহাদিগের মূলে মনের সংকল্প, তাহাদিগের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে, সংকল্পেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—সংকল্প দ্বারাই সংকল্পের ক্রিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

মনই যদি সংসারে গতাগতির কারণ, তবে মুক্তি লাভের উপায় কি ? :—

মনই যদি বন্ধনের কারণ, তবে ইহা হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—

বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ ॥ ভাগঃ ১১।১৮।২২

—ইন্দ্রিয়গণের বিক্ষেপই বন্ধ এবং তাহাদের সংযমই মোক্ষ।

মনই ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক ও রাজা, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। রাজাকে জয় করিতে পারিলে যেমন রাজার ইতর সেনাগণকে আর পরাজয় করিতে হয় না, সেইরূপ মনঃ সংযম হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ আপনাপনি সংযত হইয়া পড়ে। ভাগবত ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

মনো বশেঽন্যেহ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যাস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্‌বশং তং স হি দেবদেবঃ॥
ভাগঃ ১১।২৩।৪৩

—ইন্দ্রিয় সকল মনের বশে বর্ত্তমান, কিন্তু মন কাহারও বশতাপন্ন নহে, যেহেতু যোগীদিগের ও ভয়ঙ্কর মনোরূপ দেবতা বলিষ্ঠ হইতেও বলবান, যে ব্যক্তি তাহাকে বশতাপন্ন করিতে পারেন, তিনি দেবদেব অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় জেতা। ভাগঃ ১১।২৩।৪৩

মনকে বশে আনিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন :—

মন এব সমর্থং হি মনসো দৃঢ় নিগ্রহে। মহোপনিষৎ ৪।১০৫
মনসৈব মনশ্ছিত্বা পাশং পরম বন্ধনম্।
ভবাদুত্তারয়াত্মানং নাসাবন্যেন তার্য্যতে॥ মহোপনিষৎ ৪।১০৮

—মনই মনের দৃঢ়নিগ্রহে সমর্থ। সংসার বন্ধনের দৃঢ় পাশ স্বরূপ মনকে মন দ্বারা ছেদন করিয়া আপনাকে সংসার হইতে উত্তীর্ণ কর অন্য কাহারও দ্বারা উত্তরণের উপায় নাই।

মন দ্বারাই মন নিগ্রহ কর্ত্তব্য, ইহা শ্রুতির উপদেশ।
ভাগবত ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্নদান্তস্যার্ব্বতো মুহুঃ॥ ভাগঃ ১১।২০।২১

—অদমনীয় অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহী যেমন তাহার মুখের লাগাম ধরিয়া, কিছুক্ষণ তাহার স্বেচ্ছানুসারে গমনের অনুবর্ত্তন করিয়া, ক্রমশঃ উক্ত রশ্মি দ্বারা উহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে, অদমনীয় মনকেও সেইরূপ কিছুকাল অনুবর্ত্তন করিয়া দৃঢ়সংকল্প দ্বারা উহাকে বশে আনিতে হয়, এই প্রকার মনঃসংযম-সাধন পরম যোগ। ভাগঃ ১১।২০।২১

চতুর কর্ণধারও নদীর প্রবল স্রোতের অনুবর্ত্তন করিয়াই, দৃঢ় প্রচেষ্টার সাহায্যে নদীর একপার হইতে অপর পারে গন্তব্য স্থানে নৌকা আনয়ন করে। সেইরূপ মনের দ্বারাই মনের সংযম সাধন করিতে হয়। কতকদূর মনের অনুবৃত্তি করিয়াই মনকে জয় করিতে হয়।

মনের চঞ্চলতার কারণ কি ? :—

কিন্তু মন বড়ই চঞ্চল, ক্ষণমাত্রও স্থির নহে, এ চঞ্চলতা কোথা হইতে আসিল ? প্রথমতঃ মন যে উপাদানে গঠিত, সে সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। আমরা প্রত্যক্ষ জানি, যে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল দ্রব্য অধিক চঞ্চল এবং তদপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্য আরও অধিক চঞ্চল; সুতরাং স্থূল দ্রব্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম দ্রব্য অধিক চঞ্চল, অধিকতর সূক্ষ্ম দ্রব্য অধিকতর চঞ্চল। জগতের উপদানীভূত পঞ্চ মহাভূত অতি সূক্ষ্ম, ইহা আমরা জানি। পঞ্চতন্মাত্র তাহাদের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। পঞ্চ মহাভূত প্রত্যেকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূল জগন্নির্ম্মাণে উপযোগী না হওয়ায় উহাদের পরস্পরের ইতর বিশেষে সংমিশ্রণে বা দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় পঞ্চীকরণে স্থূল ভূত উৎপাদন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা জগন্নির্ম্মাণ করিলেন ইহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সুতরাং জগতে অতি সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ ও পঞ্চীকৃত মহাভূত পঞ্চকে গঠিত। মন—অপঞ্চীকৃত পঞ্চ তন্মাত্র কার্য্য—সুতরাং ইহা অতি সূক্ষ্ম এবং সেকারণ ইহা স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল। প্রাকৃতিক নিয়মে ইহা চঞ্চল না হইয়া অন্যপ্রকার হইতে পারে না। এইত গেল উপাদান হইতে প্রাপ্ত চঞ্চলতা। এতদ্ভিন্ন চঞ্চলতার অন্য কারণও বর্ত্তমান। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম পরিচ্ছেদে কর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় আমরা মনের চঞ্চলতার কারণানুসন্ধানে বুঝিয়াছি, যে আমরা আনন্দলোকের অধিবাসী,—আনন্দলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জল হইতে উত্থিত মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্ববস্তুতে আনন্দকণালাভের জন্য ছুটাছুটি করিতেছি। মনই অনুভূতি লাভের মুখ্যসাধন। একারণ মন আনন্দের অন্বেষণে সর্ব্বত্র প্রধাবিত। ইহা মনের স্বভাব। এই চঞ্চল স্বভাব ভগবানের মঙ্গল নিয়মে মনের সহিত সংজড়িত।

মনশ্চাঞ্চল্যের উপযোগিতা :—

মন যদি চঞ্চল না হইত, তাহা হইলে কি অনিষ্ট হইত, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলে মন একবার যাহাতে নিবিষ্ট হইত, তাহা হইতে ফিরাইয়া বিষয়ান্তরে নিয়োগ দুঃসাধ্য হইত। জড়-বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারে আমরা জানি যে অতি ক্ষীণ বিক্ষেপ প্রত্যক্ষগোচর করিতে হইলে, তদুপযোগী যন্ত্র এরূপ হওয়া উচিত, যে একটী অতি সূক্ষ্ম বালুকা কণার পতনে বা অতিক্ষীণ নিঃশ্বাস ত্যাগে, তাহা সাম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষেপের সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গঠিত নিক্তি (Perfect Balance), মাইক্রমিটার (Micrometer) প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। চির বিক্ষোভের মধ্যে যে যন্ত্রকে রাখিতে হইবে তাহাও অতি চঞ্চল হওয়া আবশ্যক। সমুদ্রপোতে নাবিকগণের দিক্‌দর্শন যন্ত্র (Mariner's Compass) ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। সমুদ্রে গমনশীল জাহাজে ইহার অবস্থিতি।

অন্নবিস্তর বিক্ষোভ সমুদ্রে সর্ব্বসময়ে বিদ্যমান। যদি উক্ত দিক্‌দর্শন যন্ত্র চঞ্চল না হইয়া দৃঢ় সংবদ্ধ হইত, তাহা হইলে জাহাজ যখন উন্মাদ নর্ত্তনে প্রবৃত্ত, তখন উক্ত যন্ত্র ধ্রুব লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। জাহাজের আন্দোলনে উহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত, অথবা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইত। সেইরূপ চির পরিবর্ত্তন স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত সংসারী জীবের অনুভূতির সাধন স্বরূপ মন যদি চঞ্চল না হইত, তাহা হইলে কোনও কালে উহা ধ্রুব লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। যে কোনও ইতর বিষয়ে দৃঢ় সংবদ্ধ হইয়া থাকিত—বিষয়ের আবার সংখ্যা নাই, পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই—সুতরাং একটি বিষয় হইতে অতি কষ্টে ছাড়াইতে না ছাড়াইতে আর একটিতে বদ্ধ হইয়া পড়িতে পারিত। একারণ জীবের অদৃষ্ট যে অতি মন্দ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য বলিতে হইবে, যে মনের চঞ্চলতা ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের নিদর্শন। দৃঢ়ভাবে সংহত কঠিন দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট আকার আছে; কিন্তু তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তরল বা বায়বীয় দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। উহাদিগকে যে আধারে রাখা যায়, উহারা তাহাদের আকার ধারণ করে। মন উহাদের অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং উহাদিগের নিদর্শনে, আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি, মনকে যে আধারে রাখা যাইবে, উহা তাহারই আকার ধারণ করিবে। অর্থাৎ মনে যে বিষয় চিন্তা করা যাইবে, মন সেই বিষয়ের আকার ধারণ করিবে—দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় মন তদাকারে আকারিত হইবে। উপাসনা ক্ষেত্রে মনের এই স্বভাব বড়ই উপযোগী। মন উপাস্য সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিবে, ততই উহা তদাকারাকারিত হইতে হইতে উহা ক্রমশঃ তাহার ধর্ম্ম, শক্তি, গুণ গ্রহণ করিয়া তদ্রূপে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন মনের পৃথক্ অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা সুকর নহে। একারণে ৺রামকৃষ্ণপরমহংসদেব বলিয়াছেন, যে "শুদ্ধ মন ও যা, শুদ্ধ আত্মাও তা" মন আত্মার যন্ত্র মাত্র বলিয়া আমরা জানি, কিন্তু উক্ত যন্ত্রের স্বভাব এই, যে উহা যন্ত্রীর চিন্তা করিতে করিতে যন্ত্রীতে পরিণত হয়, তখন আর যন্ত্রী ও যন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয় সহজ নহে।

আর একটি প্রধান কথা। জীব ভ্রান্ত কর্ত্তৃত্বের পরিচালনায় সাধক নিয়মের অপব্যবহার করায় অবিদ্যাধিকারে পতিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে একাধিক বার বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত যে জীবের মুক্তি ও সেই কর্ত্তৃত্বের পরিচালনায় সংসাধিত হওয়া আবশ্যক; এবং তাহার অনুকূলে বা প্রতিকূলে জীবের অতি সূক্ষ্ম প্রচেষ্টাও অপরিলক্ষিত না থাকে; প্রত্যেকটিই নিজ নিজ শক্তিমত চিহ্ন অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয়, এরূপ বিধান প্রয়োজনীয়; মন চঞ্চল হইলেই উহা সম্ভব। যেমন একটি অতি সূক্ষ্ম বালুকা কণার পতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে গঠিত নিক্তির সাম্যভাব বিচলিত করিয়া উক্ত বিক্ষেপ প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত করে, সেইরূপ জীবের অতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও অতি চঞ্চল মন সন্দোলিত করিয়া প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত করে

এবং জীব ইচ্ছা করিলে অনুকূল প্রচেষ্টা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়া অবিদ্যাধিকার হইতে মুক্তিলাভের পথ সুগম করিতে পারে। মনের চঞ্চলতার ইহাই প্রধান উপযোগিতা। মন চঞ্চল বলিয়াই, কোন একটি ব্যাপারের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান, মনকে উক্ত ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ ও নিয়োগ করে এবং তাহার ফলে বারিবিন্দু পতনে কঠিন প্রস্তরের গায়ে চিহ্ন অঙ্কনের ন্যায়, কোমল মনে উক্ত বিশেষ ব্যাপারের চিহ্ন সহজে অঙ্কিত হয়, এবং তাহা অভ্যাস সৃষ্টি করিয়া মনকে সহজেই উক্ত ব্যাপারে প্রযোজিত করে। উপাসনা ক্ষেত্রে ইহা বড়ই প্রয়োজনীয়। দিনের পর দিন বিষয় হইতে প্রত্যাহার বা সংযম অভ্যাস করিতে করিতে মন অভ্যাস বশতঃ আপনাপনিই সংযত হয়। গীতায় শ্রীভগবান ইহা বিশদভাবে বলিয়াছেন :—

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গীঃ ৬।৩৫

—হে কৌন্তেয়! অভ্যাস এবং বিষয় বিরাগ দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।

যোগ শাস্ত্রেও সেই একই উপদেশ আছে, "অভ্যাসবৈরাগাভ্যাং তন্নিরোধঃ" পাতঞ্জল দর্শন সমাধিপাদ ১২।

—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায়।

মন যদি দৃঢ়সংবদ্ধ হইত, চঞ্চল না হইত, তাহা হইলে অভ্যাস গঠন ও বিষয় হইতে প্রত্যাহার অতিশয় দুঃসাধ্য হইত। একারণ আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম, যে স্নেহময় পিতা যেমন কুপথে চালিত পুত্রকে, স্নেহের শাসন, সদয় অনুযোগ দ্বারা, সুপথে আনিয়া থাকেন, সেইরূপ বিশ্বপিতা, ভ্রান্ত কর্তৃত্ব বুদ্ধির পরিচালনায়, তাঁহার খেলার সঙ্গী, অতি প্রিয় জীব, বিদ্যাধিকার হইতে অবিদ্যাধিকারে পতিত হইয়াছে, দেখিয়া তাহাদিগকে পুনরায় বিদ্যাধিকারে প্রত্যাবৃত্ত করিবার জন্য প্রেমের শাসন বিধান করিয়াছেন। সেই শাসন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মাথায় তুলিয়া লইয়া, তদনুসারে চলিলেই পুনরায় পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থানলাভ—ইহাই পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি, ইহাই অমৃতলোক, ইহাই শাশ্বত আসন, ইহাই স্বরূপ প্রাপ্তি—ইহাই মোক্ষ।

অতএব মন চঞ্চল বলিয়া দুঃখিত বা হতাশ হইবার কিছুই নাই। মনের চঞ্চলতা বিধান জীবের শুভাদৃষ্ট বশতঃ বিহিত হইয়াছে। আত্মার শক্তি অসীম। মনই আত্মার শক্তি অভিব্যক্তির প্রকৃষ্ট যন্ত্র। আত্মার শক্তি মনে সহজে সংক্রামিত করা যায়। মন এই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, আপনি আপনাকে সংযত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, ইহা শ্রুতির উপদেশ। এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং মঙ্গলময় ভগবানের শিবদ, শুভদ, অভয়প্রদ চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া গন্তব্য পথে সকলের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। পথে বাধা বিঘ্ন ঘটিতে পারে কিন্তু ভগবানের নাম ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে, বাধা বিঘ্নাদির মস্তকে পদার্পণ করিয়া সোপানাবলীর

সাহায্যে ছাদে আরোহণের ন্যায় পরমতত্ত্বে পৌঁছুছিতে পারা যাইবে। শ্রীমদ্ ভাগবত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

তথা ন তে মাধব। তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ভাগ : ১০।২।৩৩

—ব্রহ্মা বলিতেছেন, হে মাধব! যে সকল ব্যক্তি আপনার ভক্ত, আপনাতেই সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই প্রকৃত মার্গ ভ্রষ্ট হন না। তাঁহারা আপনা কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, নির্ভয়ে বিঘ্নকারীগণের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক, সোপান সাহায্যে উচ্চে আরোহণের ন্যায়, বিচরণ করেন। ভাগঃ ১০।২।৩৩

সুতরাং দুঃখিত, হতাশ বা ভীত হইবার কিছুই নাই। "নায়মাত্মাবলহীনেন লভ্যঃ" (মুণ্ডক ৩।২।৪) শ্রুতির এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ভগবানের নিকট শক্তিসঞ্চার প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার প্রদত্ত আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া দৃঢ়পদে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সিদ্ধি নিশ্চিত—তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ভগবানের উপর কায়মনোবাক্যে একান্ত নির্ভর করিলেই, তিনি সমুদায় সুবিধা সংযোগ করিয়া দেন, সমুদায় বাধাবিঘ্ন দূর করেন, সমুদায় অমঙ্গল নাশ করেন, বাহিরে গুরু মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপদেশ দান করিয়া পরমপদ লাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং হৃদয়ে নিজের স্বরূপ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ ভাগবত একটি শ্লোকার্দ্ধে ইহা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং
ব্যনক্তি॥ ভাগঃ ১১।২৯।৬

—যে ভগবান, দেহধারীগণের অন্তর ও বাহিরের সমুদায় অমঙ্গল দূর করিয়া বাহিরে আচার্য্য বা গুরুরূপে এবং চিত্তে স্বরূপে প্রকটিত হইয়া স্বগতি অর্থাৎ পরমপদ প্রকাশ করেন। ভাগঃ ১১।২৯।৬

ইহা কত বড় আশা ও সান্ত্বনার কথা। অতএব সাধক, হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় কর, দৃঢ় বিশ্বাসে অগ্রসর হও, সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সিদ্ধি নিশ্চিত। ভগবানের নাম গ্রহণ করিবে, আবার বলিবে, "আমি মহাপাপী, হে ভগবান্! রক্ষা কর"—এ প্রকার দুর্ব্বলতা কেন? ভগবানের নাম করিলে, কি আর পাপ থাকে? প্রজ্বলিত অগ্নিতে তৃণগুচ্ছ নিঃক্ষেপ করিলে, তাহা কি নিঃশেষে দগ্ধ হয় না? ভগবানের নামে কর্ম্ম, তাহার ফলরূপ পাপ, বীজরূপ কামনা, বাসনা

সমুদায় দগ্ধ হইয়া যায়, এজন্য গায়ত্রী মন্ত্রে, ইহা "ভর্গ" আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে, একারণ উক্ত মন্ত্রে ভর্গ-উপাসনার উপদেশ। সমুদায় ভর্জ্জন করে বলিয়া "ভর্গ" নামের সার্থকতা। হে ব্রাহ্মণ দেহধারী সাধক! ত্রিসন্ধ্যায় পরব্রহ্মরূপী ভর্গের উপাসনা করিবে, আবার বলিবে, আমি পাপী! এ প্রকার দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া, দৃঢ় বিশ্বাসে, ধীর পদে, শাস্ত্রের উপদেশে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হও— সাফল্য তোমার করায়ত্ত সন্দেহ নাই। তুমিত অমৃতের পুত্র, অমৃত লোক তোমার শাশ্বত স্থান, তুমিত চিরমুক্ত। ভ্রান্তি বশতঃ আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া সংসারে দুঃখ-কষ্টের উত্থান পতনে আন্দোলিত হও কেন? "অমৃতস্য পুত্র" বলিয়া আপনাকে চিনিতে উদ্যুক্ত হও, জাড্য পরিত্যাগ কর, নিজ কৃত মোহপাশছেদন করিয়া স্বরূপ প্রকটিত কর, জলবুদ্বুদের ন্যায় দুঃখকষ্ট বিলীন হইবে, অজ্ঞানান্ধকার এবং তজ্জনিত ভয়ভাবনা তিরোহিত হইবে, আত্মার নির্ম্মল, শান্ত, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে অন্তর বাহির উদ্ভাসিত হইবে।

উপাসনা প্রত্যেকের নিজস্ব :—

মনঃ সংযম সম্পাদনের জন্য উপাসনার প্রয়োজন বুঝিলাম। জগতের সমুদায় মানব অভিব্যক্তির একই স্তরে বর্ত্তমান নাই। প্রত্যেকের দৈহিক গঠন, মানসিক চিন্তার ধারা, ভঙ্গী, বাক্য কথন, ভাব বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা উহাদের অভিব্যক্তির বিভিন্নস্তরে বিদ্যমানতার সাক্ষ্য দেয়। এই বিভিন্নতা কোনও বিশেষ উপাসনার অধিকারী ও অনধিকারী ভেদ প্রতিপাদন করে। একারণ উপাসনাও নানাপ্রকার। ইহা প্রত্যেকের নিজস্ব। তাহা শাস্ত্র ও গুরুমুখে প্রাপ্তব্য। সুতরাং উপাসনার প্রকারভেদ উল্লেখ করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। উপাসনার তত্ত্বালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। উহাদের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। উহা করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। উপাসনার মূল ভিত্তির আলোচনা আমরা শেষ করিয়াছি। এখন উহার আনুষঙ্গিক উপায়, আলম্বন প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনার পথে অগ্রসর হইতেছি। প্রবন্ধের কলেবর আমাদের কল্পিত আকার অপেক্ষা এখনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব অতঃপর আমরা অতি সংক্ষেপেই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

মনঃ সংযম করিবার অত্যাবশ্যক আনুষঙ্গিক উপায় :—

মনঃ সংযত করিবার জন্য উপাসনার বারংবার অনুষ্ঠান প্রয়োজন—ইহা পূর্ব্বে অভ্যাস গঠন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ভগবান্ সূত্রকার "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥" ৪।১।১ সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অনুষ্ঠান কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহার উত্তরে ভগবান্ সূত্রকার বলিলেন, "আসীনঃ সম্ভবাৎ॥" ৪।১।৭ সূত্র। সুখাসনে বসিয়া অনুষ্ঠান করা উচিত। কোন্ স্থানে বসিতে হইবে? তাহার উত্তরে বলিলেন

"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥" ৪।১।১১ সূত্র, যে স্থানে মনের একাগ্রতা বিচলিত করিবার কোনও প্রতিবন্ধক নাই—এইরূপ স্থান প্রয়োজন। হাটবাজারের সন্নিকটে নানা প্রকার গোলমাল, বিবাদ কলহ সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, তাহাতে মনে বিক্ষেপ আনয়ন করে; যেখানে দংশ, মশক, হিংস্রজন্তু প্রভৃতি থাকা সম্ভব, সে স্থানও পরিত্যাজ্য; যেখানে তীক্ষ্ণ রৌদ্র বা তীক্ষ্ণ শীত অথবা বৃষ্টির উৎপাতে পীড়িত হইতে হয়, সে স্থানেও মনের স্থৈর্য্য সাধনের পক্ষে উপযোগী নহে। যেখানে ঐ সকল উদ্বেগের এবং তজ্জনিত বিক্ষেপের কারণ বর্ত্তমান নাই, তাহাই উপযুক্ত স্থান। ঐরূপ উপযুক্ত স্থানে সুখাসনে আসীন হইয়া "অচলত্বং চাপেক্ষ্য॥" (৪।১।৯ সূত্র,) অচলভাবে, "ধ্যানাচ্চ॥" (৪। ।৮ সূত্র,) ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় চিত্তের একতানতা। প্রথমতঃ এপ্রকার একতানতা সহজসাধ্য নহে। বিক্ষেপ আপনাপনিই আসিয়া পড়ে। এবং তজ্জনিত বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়। অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ উহা আয়ত্ত করিতে হয়। একারণ ভগবান সূত্রকার বলিয়াছেন, "আ প্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥"—৪।১।১২ সূত্র—যাবজ্জীবন ঐ প্রকার উপাসনা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—নিরুদ্বেগকর স্থানে সুখাসনের উপর নিশ্চলভাবে বসিয়া একই বিষয় ধ্যান করিতে হইবে, এবং উক্ত ধ্যান যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, তাহার চেষ্টা প্রতিবারে করিতে হইবে, এপ্রকার যাবজ্জীবন করা প্রয়োজন; ক্রমশঃ অভ্যাসের বলে অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় চিত্তের একতানতা লাভ হইবে—ইহাই শ্রেয়ো লাভের উপায়।

উপাসনায় বিহিত ধ্যানের আলম্বন:—

দিক নির্ণয় যন্ত্র অতি চঞ্চল হইলেও, যেমন চঞ্চলতার মধ্যে, উহার লক্ষ্য পৃথিবীর ধ্রুব বিন্দুর দিকে চিরস্থির থাকে; বৈজ্ঞানিক উপায়ে গঠিত অতি সূক্ষ্ম বিক্ষেপ প্রকাশকা নিক্তি, যেমন অতি সামান্য স্পন্দনে বিচলিত স্বভাব হইলেও, উহার শিরোবিন্দুর দিকে স্থির লক্ষ্য থাকে, স্থির লক্ষ্যের তুলনায় যেমন উহাদের চাঞ্চল্য পরিমাপিত হয়, সেইরূপ মন অতি চঞ্চল হইলেও, উহার লক্ষ্য কোনও একটি বিশেষ বস্তুর উপর স্থির রাখা প্রয়োজন। এই স্থির লক্ষ্যের তুলনায় উহায় বিক্ষেপ পরিমাপিত হয় এবং উক্ত বিক্ষেপ হইতে স্থিরত্বে পুনরানয়নের প্রচেষ্টা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের সুবিধা সম্পাদিত হয়। এই লক্ষ্যস্থির রাখার প্রয়োজনীয়তা পঞ্চদশীকার একটি সাধারণ উপমায় সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন:—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গ রসায়নম্॥ পঞ্চদশী ১১।১২২

—যেমন পর সঙ্গাভিলাষিণী স্ত্রী নানাপ্রকার গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা হইয়াও অন্তঃকরণে পরসঙ্গরস আস্বাদন করে অর্থাৎ পরপুরুষ সঙ্গ সর্ব্বদা চিন্তা করে।

সেই প্রকার অনন্ত প্রকার বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকিলেও অন্তরে লক্ষ্য সেই "পরসঙ্গ রসায়নে"—পরম পুরুষের সঙ্গলাভ হইতে উদ্ভূত রসাস্বাদনের উপর থাকা প্রয়োজন। এখন বিচার করা আবশ্যক, লক্ষ্য কাহার উপর স্থির রাখিতে হইবে? যে বস্তু স্থির, তাহারই উপর লক্ষ্য স্থির রাখা উচিত। যাহা নিজে চঞ্চল, তাহার উপর চঞ্চল মনের স্থিরতা রক্ষা কি প্রকারে সম্ভব? জগতে একমাত্র স্থির বস্তু, ব্রহ্ম, আত্মা বা ভগবান। তাঁহার উপরই চঞ্চল মনের স্থির লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অন্যান্য যতকিছু বস্তু আছে, তাহারা সকলে পরিবর্ত্তন স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত, কেহই চির স্থির নহে। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন। কঠ শ্রুতি ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন:—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ কঠ ১।২।১৭

—ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরম আলম্বন, এই আলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। কঠঃ ১।২।১৭

ভগবান সূত্রকার এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য নিম্নোদ্ধৃত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন—"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ॥" সূত্র ৪।১।৩। ব্রহ্ম, জীবাধিক হইলেও, তাঁহাকে আত্মস্বরূপে উপাসনার বিধান কেন? ইহার আলোচনা মূলগ্রন্থে ৪।১।৩ সূত্রের আলোচনায় বিস্তারিত ভাবে করা হইয়াছে। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে জীবতত্ত্ব আলোচনায় ৭২ পৃষ্ঠায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সহাবস্থান প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জীবের সত্তা ক্রিয়া, অভিব্যক্তি সমুদায়ের মূলে পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মার শরীর স্থানীয়। জীবাত্মা যেমন আমাদের স্থূল দেহকে সঞ্জীবিত, ক্রিয়াশীল রাখে,—পরমাত্মা সেইরূপ জীবাত্মাকে সঞ্জীবিত ও ক্রিয়াবান রাখেন। সুতরাং আত্মস্বরূপে ভগবদুপাসনার মূল কোথায়, তাহা বুঝা গেল। ব্রহ্ম আত্মা বা ভগবান রূপ স্থির লক্ষ্যে আলম্বন না করিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না, উহা বুঝাইবার জন্য, ভগবান সূত্রকার সূত্র করিলেন "ন প্রতীকে ন হি সঃ॥" সূত্র ৪।১।৪।

আলম্বন বিশেষে উপাসনা সাধারণতঃ দুই প্রকার:—

আলম্বন বিশেষে উপাসনা সাধারণতঃ দুই প্রকার (১) আত্মোপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনা এবং (২) প্রতীকোপাসনা। এই উভয়বিধ উপাসনার পার্থক্য বুঝিবার উপায় কি? সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, যে মানবগণের মধ্যে নানাপ্রকার উপাসনা প্রচলিত। আমাদের হিন্দু সমাজেই রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, নৃসিংহ, সূর্য্য, গণপতি প্রভৃতি কতবিধ উপাসনা প্রচলিত। হিন্দু সমাজের বাহিরে বৌদ্ধ, জৈন, জরথুস্ত্র, খৃষ্ট, মুসলমান প্রভৃতি সমাজেও উপাসনা বিভিন্ন প্রকার।

সকলেই আপনাপন উপাস্তের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বদ্ধপরিকর। ঐ নানা-প্রকার উপাসনার মধ্যে কাহার উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা এবং কাহার উপাসনা প্রতীকোপাসনা, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা আমাদের হিন্দু সমাজে প্রচলিত উপাসনা সম্বন্ধেই। তাহা হইলেও উক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ন্যায় যুক্তি অন্যান্য সমাজে প্রচলিত উপাসনা ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

ভগবান সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয়পাদে অনেকগুলি সূত্র প্রণয়ন করিয়া আত্মোপাসনার বা ব্রহ্মোপাসনার মূলতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, উহাদের বিস্তারিত আলোচনা প্রতিসূত্রে প্রসঙ্গে মূলগ্রন্থে করা হইয়াছে। এখানে উহাদের পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অত্যধিক বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এইটুকু জানা প্রয়োজন, যে যে উপাসনায় আলম্বন বস্তুতে ব্রহ্মভাব আরোপ করা যায়, অর্থাৎ যে আলম্বনে ব্রহ্মের অনন্তত্ব, বিভূত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, বাক্যমনের অগোচরত্ব, সর্ব্বপ্রমাণাগোচরত্ব, দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ রাহিত্য, স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদরাহিত্য, দেশ-কালাতীতত্ব, জগৎ কারণত্ব, সর্ব্বাভীষ্টদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণোপসংহার করিয়া উপাসনা করা যায়, তাহা ব্রহ্মোপাসনা। আর উক্ত প্রকার ব্রহ্মভাব যে উপাসনায় আরোপ না করা যায়, তাহা প্রতিকোপাসনা। বলা বাহুল্য, যে সংকল্পানুসারেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে আমাদের মনই মনোময় জগৎ রচনা করে। আবার মনই সমুদায়ে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া উক্ত মনোময় জগতের ধ্বংস সাধন করত অব্যাহতি প্রদান করে।

ভগবান "ভাববন্ধু" :—

বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে (যাহা অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত) ব্রহ্ম বা আত্মা জীবের চিন্তা, ভাব প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা, পরিচালক ও নিয়ন্তা বলিয়া স্পষ্ট কথিত আছে। মনের সমুদায় ভাব, যখন তাঁহার পরিচালনে, নিয়ন্তৃত্বে উদ্‌ভূত তখন আমাদের মনের কোনও ভাবই তাঁর অজ্ঞাত নহে। ভাগবত এজন্য তাঁহাকে "ভাববন্ধু" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। ভাবের দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করা যায় বা লাভ করা যায়। এজন্য তিনি "ভাববন্ধু"। ভগবান সূত্রকারও "কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥" ৩।৩।১৮ সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। যে যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করে, তিনিও তাহাকে সেইভাবে প্রতিভজন করেন। গীতায় শ্রীভগবান ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন :—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহন্।" গীঃ ৪।১১। ভাগবত ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :—

যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

ভাগবত ৩।৯।১১

ইহার সরল অর্থ ১।২।৩০ সূত্রে (পৃঃ ৫৪৯) দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম, যে যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন, যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আপনার ইষ্টরূপে

উপাসনা করেন, তিনি সেই ভক্তের অনুগ্রহ বিধানের জন্য সেই সেই ইষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন। তবে ভাব উপযুক্তমত গাঢ় হওয়া চাই। মানব অসংখ্য, সকলেই কোন না কোন প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। ভগবান ভাব, শক্তি, গুণ, মূর্তি প্রভৃতি সমুদায়ের অনন্ত ভাণ্ডার—যে যাহা কামনা করে, ভাণ্ডার হইতে সমুদায়ই পাইতে পারে। অনন্ত ভাণ্ডারের সমগ্র ধারণা ক্ষুদ্রশক্তি মানবের পক্ষে, খণ্ড শক্তিতে শক্তিমান দেবতার পক্ষেও সম্ভব নহে। যে, যে কোনও বিশেষভাব ধারণা করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই অনুগৃহীত করেন।

ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মার্গের প্রয়োজনীয়তা ঃ—

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্ম সম্বন্ধে সকলের জ্ঞানই খণ্ডজ্ঞান। শাস্ত্র মানবের জন্য বিহিত। শাস্ত্রে উপদিষ্ট জ্ঞানও খণ্ডজ্ঞান। ভাগবত একটি শ্লোকে সুন্দর উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন :—

যথেন্দ্রিয়ৈঃপৃথক্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ ভাগঃ ৩.৩২।২৮

—যেমন বহুগুণাশ্রয় কোনও একটি অর্থ বা বিষয় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে বিভিন্নরূপে প্রতীতিগোচর হয়, সেইরূপ একই ভগবান বিভিন্ন শাস্ত্র পথে বিভিন্নরূপে উপাদিষ্ট হন। ভাগঃ ৩।৩২।২৮

উপমাটি বড়ই সুন্দর। মনে কর একটি সন্দেশ—ইহার আকার শ্বেতবর্ণ সুগোল, স্পর্শ সুকোমল, গন্ধ মনোরম, আস্বাদ মধুর ইত্যাদি নানাপ্রকার গুণ ইহার আশ্রয়ে বর্ত্তমান। কিন্তু কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহার সমুদায় গুণ আমাদের উপলব্ধি গোচর হয় না। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা মাত্র ইহার সুন্দর শ্বেতবর্ণ আকারের উপলব্ধি হয়, অন্যান্য গুণ উপলব্ধির বহির্ভূত থাকিয়া যায়। জিহ্বা দ্বারায় ইহার মধুর আস্বাদ উপলব্ধি করি, কিন্তু ইহার গন্ধ, রূপ প্রভৃতি অনুপলব্ধ থাকিয়া যায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তাই। সেইরূপ ব্রহ্ম অনন্ত গুণের আশ্রয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচ না হইয়া অনন্ত হইলে আমরা অনন্ত প্রকারে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতাম। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অনন্ত আত্মিক শক্তি বিকাশিত হইলে হয়ত তাঁহার সমগ্র জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শাস্ত্র, উপাসনার পন্থা নির্দ্দেশ করে মাত্র এবং উহার উপদেশ, উপাসকের অধিকার ও ধারণা করিবার শক্তি বুঝিয়া প্রদত্ত। সুতরাং শাস্ত্র তাঁহার একদেশ মাত্র নির্দ্দেশ করে।

ভাগবতের ৩।৩২।২৮ শ্লোক হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে বহুগুণাশ্রয়

অর্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে বিভিন্নরূপে উপলব্ধ হইলেও, যেমন চিত্ত উক্ত সমুদায় প্রতীতি সমীকরণ করিয়া আত্মার সম্মুখে উপস্থিত করে, অর্থাৎ জিহ্বার মিষ্ট স্বাদ, নাসিকার মধুর ঘ্রাণ, চক্ষুর সুন্দর রূপ, ত্বকের সুকোমল স্পর্শ, সমুদায় চিত্তে উপলব্ধ হয়, সেইরূপ ভাব গাঢ় হইলে, অন্য কথায় ভক্তি হইলে, ভগবান নিজ স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশ করেন। ভাগবত ৩।৯।১১ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন, যে তিনি "ভক্তি পরিভাবিত হৃদ্ সরোজে" আত্মপ্রকাশ করেন। সমগ্র আত্ম প্রকাশ করিলেও উপলব্ধির ক্ষমতা উপাসকের অধিকারের উপর নির্ভর করে। তিনি "রসকদম্বমূর্ত্তি"। সমুদায় রস তাঁহাতে মূর্ত্তিমানরূপে বিরাজমান। উপাসকের সাধ্য কি যে তাঁহার সমগ্র রস আস্বাদন করিতে পারে। একারণ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মার্গ। এক ভক্তিমার্গেই কেহ শান্ত, কেহ দাস্য, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য, কেহ মধুর রসে তাঁহাকে আস্বাদন করেন।

যখন ভগবান দৃশ্যতঃ পাঞ্চভৌতিক শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে মথুরায় কংশের ধনুর্যজ্ঞের সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন একমাত্র তিনিই—মূর্ত্তিমান রৌদ্র, অদ্‌ভূত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, মধুর সমুদায় রসের সাকার মূর্ত্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের চক্ষে প্রতীত হইলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত একটী শ্লোকে ইহা বড়ই সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

ভাগঃ ১০।৪৩।১৭

ভাব গাঢ় হইলে ভগবান ইষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া উপাসকের অভীষ্ট পূরণ করেন :—

ভাব গাঢ় হইলেই হইল। কোনভাব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা উপাসকের প্রকৃতি ও রুচির উপর নির্ভর করে। তাহার জন্য মাথাব্যথার প্রয়োজন নাই। যে ভাব মনে গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে সমর্থ, তাহাই নিজস্ব ভাব। তাহার আশ্রয়ে অগ্রসর হইলে ভগবল্লাভ হইবে। ভাগবত ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ভাগঃ ৭।১।২৯

—হে রাজন্! গোপীগণ কামভাবে, কংস ভয়ে, শিশুপালাদিরাজগণ দ্বেষভাবে, বৃষ্ণিবংশীয়গণ সম্বন্ধহেতু, আপনারা (পাণ্ডবগণ) স্নেহভাবে এবং আমরা (নারদাদি) ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভাগঃ ৭।১।২৯

অতএব আমরা বুঝিলাম তিনি ভাবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। ভাব সকলের এক প্রকার নহে, তাহাও বুঝিলাম। সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তিও এক প্রকার হইতে পারে না। যে ভক্ত যে ভাবের ভাবুক, তাহার ইষ্ট মূর্ত্তিও সেই ভাবের। শাস্ত্র হইতে এবং প্রত্যক্ষতঃ বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ইষ্ট মূর্ত্তি সকলের এক প্রকার নহে। এখন প্রশ্ন উঠে, এই সকল মূর্ত্তি কি পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি? যদি তাহা হয়, তবে উহারা বিভু, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, কি করিয়া হইবে? পরস্পর পরস্পরের বিভুত্বের, সর্ব্বব্যাপিত্বের, অনন্তত্বের হানির কারণ হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে ভগবান সূত্রকার "বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ॥" ৩।২।৩৩ সূত্র ও "স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ॥" ৩।২।৩৪ সূত্র প্রণয়ন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যে উপাসকের উপাসনা সৌকর্য্যার্থে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা নির্দ্দেশ। যদিও তিনি অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, তাহা হইলেও উপাসকের ধ্যান ধারণার সুবিধার জন্য, তাঁহার পরিচ্ছিন্নতা চিন্তা দোষাবহ নহে। শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন :—

> চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
> উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা॥ রামপূর্ব্বতাপিনী ৭
>
> —উপাসকগণের কার্য্য সংসাধনের জন্য চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা।

ইষ্ট মূর্ত্তি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহার সর্ব্ব অবয়ব সমকালে বিভু অনন্ত :—

ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, তিনি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে উভয়লিঙ্গক—অর্থাৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ, সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার। সূত্র ৩।২।১১ ইহা প্রতিপাদন করে। তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই, তাঁহার মুখ, চক্ষুঃ হস্তপদাদি উপাসকের অন্তশ্চক্ষে পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন; সুতরাং তিনি উক্তরূপ হইলেও অরূপ বটে—ইহা ভগবান সূত্রকার ৩।২।১৪ সূত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই অনন্তত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, উভয় লিঙ্গকত্ব দেহ-দেহী ভেদ ও স্বগত ভেদ রাহিত্য প্রভৃতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।১৬ মন্ত্রের সার্থকতা সম্পাদন করে। মন্ত্রটি এই :—

> সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
> সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬

ভগবান গীতায় ১৩।১৩ শ্লোকে এই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এই মন্ত্র হইতে আমরা বুঝিতেছি যে তাঁহার হস্ত পাদ সর্ব্বত্র প্রসারিত, তাঁহার চক্ষু,

মস্তক, মুখ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তিনি সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া সমুদায় লোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। জড়ের স্থানাবরোধকতা রূপ যে গুণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই। কারণ জড়ের সংস্পর্শ তাঁহাতে নাই। তাঁহার দেহ এবং দেহের সমুদায় অবয়ব—সমকালে বিভু, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী। ইষ্ট মূর্ত্তিতে তাঁহার মস্তক, চক্ষু, মুখ, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি প্রতীয়মান হইলেও, তাহারা প্রত্যেকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে ধর্ম্মী, পরিচ্ছিন্নবৎ দেখা গেলেও, তাহারা সমকালে সর্ব্বব্যাপী। পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মানতা তাঁহার ইচ্ছা বশতঃই হইয়া থাকে। আবার তিনিও যাহা তাঁহার ইচ্ছাও তাই, ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইষ্ট মূর্ত্তির উপাসনায় এই প্রকারে যদি ইষ্টমূর্ত্তিতে সর্ব্ব গুণোপসংহার করিতে পারা যায়, তবেই তাহা ব্রহ্মোপাসনা, নতুবা উহা প্রতীকোপাসনা মাত্র। উপাসকগণ প্রত্যেকেই বলেন, যে তাঁহাদের ইষ্টোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাদের ইষ্টমূর্ত্তিতে সমুদায় গুণোপসংহার করা উচিত, ইহা বুঝা গেল।

উপাসনা কর্ম্মের ব্যাপক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত :—

কর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় কর্ম্মের যে ব্যাপক সংজ্ঞা আমরা দিয়াছি, উপাসনা উক্ত ব্যাপক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, ইহা বলাই বাহুল্য। উপরে ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে, যে ব্রহ্মোপাসনা বিদ্যাধিকারের কর্ম্ম এবং প্রতীকোপাসনা অবিদ্যাধিকারের কর্ম্ম। ব্রহ্মোপাসনার প্রারম্ভেই কায়মনোবাক্যে তাঁহাতে আত্মদান কর্ত্তব্য; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এরূপ আত্মদানে কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, সুতরাং উক্ত প্রকার উপাসনারূপ কর্ম্মে বন্ধন নাই, একারণ উহা বিদ্যাধিকারের কর্ম্ম।

ব্রহ্মতত্ত্ব কর্ম্মলভ্য নহে :—

এখন ব্রহ্মোপাসনায় প্রাপ্তব্য কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে ব্রহ্মতত্ত্ব কর্ম্মলভ্য নহে। ব্রহ্মোপাসনা যখন কর্ম্ম, তখন ইহা বিদ্যাধিকারের কর্ম্ম হইলেও, ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় নহে। তবে ইহার উপযোগিতা কি? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা চেতো
মলানি বিধমেদ্ গুণকর্ম্মজানি
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥

ভাগবত ১১।৩।৪০

—যখন পদ্মনাভ ভগবানের চরণোপাসনা হেতু লব্ধ দৃঢ়া ভক্তি দ্বারা গুণকর্ম্ম হইতে উৎপন্ন চিত্তমল নাশ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই বিশুদ্ধ চিত্তে নির্ম্মল দৃষ্টি পুরুষের চক্ষে সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে উদ্‌ভাসিত হয়।
ভাগঃ ১১।৩।৪১

ইহা বলিয়া ভাগবত আবার বলিতেছেন :—

যথাহি ভানুরুদয়ো নৃচক্ষুষাং
তমো বিহন্যান্নতু সদ্‌বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে
হন্যাত্তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥ ভাগঃ ১১।২৮।৩৫

—সূর্য্য-প্রকাশ যেমন মানব চক্ষের আবরক অন্ধকার মাত্র নষ্ট করে, কোনও পূর্ব্ব হইতে অবর্ত্তমান নূতন বস্তুর সৃষ্টি করে না, সেইরূপ নিপুণ ব্রহ্মদর্শন পুরুষের বুদ্ধির ভ্রমান্ধকার নষ্ট করে মাত্র। কোনও নূতন বস্তুর উৎপত্তির কারণ নহে। ভাগঃ ১১।২৮।৩৫

ভগবান সূত্রকারও "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ॥" ৪।৪।১ সূত্র প্রণয়ন করিয়া প্রতিপাদন করিলেন, যে বিদ্যা প্রাপ্তিতে বা ব্রহ্মদর্শনে স্বরূপাভিব্যক্তি হয়; অর্থাৎ স্বরূপ, যাহা আবৃত ছিল, তাহা উদ্‌ভাসিত হয়। অতএব আমরা পাইলাম যে ব্রহ্ম ও তাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ইহা নিত্য বর্ত্তমান। ইহা কর্ম্মলভ্য নহে। কর্ম্ম ইহার আবরক ভ্রমান্ধকার নষ্ট করে মাত্র।

প্রতীকোপাসনার উপযোগিতা :—

ব্রহ্মোপাসনায় আলম্বন ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মভাবে বিভাবিত ইষ্ট মূর্ত্তি। কিন্তু ব্রহ্ম বা ব্রহ্মভাব—প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণগম্য নহে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অথচ আমাদের জ্ঞানমাত্রই সবিকল্প জ্ঞান। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের ধারণা আমরা করিতে পারি না। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানের এরূপ আলম্বন প্রয়োজন, যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণগম্য। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহারা যে অতি উচ্চস্তরের অধিকারী, সাধারণ উপাসকের অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের ন্যায় সাধারণ মানব, যে স্তরে অবস্থিত, তাহাতে ব্রহ্মোপাসনা আমাদের পক্ষে অতিদুষ্কর। আমরা ব্রহ্মের বা ব্রহ্মভাবের ধারণা করিতে পারি না। একারণ আমাদের উপাসনায় আলম্বন এরূপ বস্তু হওয়া আবশ্যক, যাহার ধারণা আমরা করিতে পারি, অর্থাৎ অন্য কথায় যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানগম্য। এই প্রকার আলম্বনই প্রতীক। ইহা রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মানবদেহের সমজাতীয় দেহধারী হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই—উঁহাদিগকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া, উঁহাদের লোকাতীত শক্তি, চরিত্র গৌরব, দেবদুর্ল্লভ দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি গুণ অহরহঃ

চিন্তনে মন তদাকারে আকারিত হইতে হইতে উপাসককে ক্রমশঃ উঁহাদের স্তরে উন্নমিত করিতে থাকে এবং পরিণতিতে উঁহাদের লোকে সাযুজ্য, সারূপ্য প্রভৃতি প্রাপ্তির কারণ হয়। অনন্তের দৃশ্যমান নিদর্শন আকাশ সাগর প্রভৃতিও প্রতীক হইতে পারে। উহাদের অহরহঃ ভাবনায়, মনের প্রসারতা লাভ হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ মন অনন্ত স্বরূপে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। ব্রহ্মই অনন্ত—সুতরাং মনের এই পরিণতি ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি। রামকৃষ্ণাদির উপাসনার পরিণতিতে যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় না, তাহা নহে। লোকাতীত, দেবদুর্লভ শক্তি, গুণ প্রভৃতি চিন্তনে, মন, ক্রমশঃ প্রসারতা লাভ করিতে করিতে, পরিশেষে ঐ সমুদায় গুণের অনন্ত পরিণতি যাঁহাতে, তাঁহার সন্ধান পায়। আকাশ-সাগরের চিন্তনে হউক, বা রামকৃষ্ণাদির ভাবনায় হউক, যখন উপাসনার পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তি হয়, তখন আর উহা প্রতীকোপাসনা থাকে না, তখন উহা ব্রহ্মোপাসনার স্তরে পরিণত হয়। শালগ্রাম শিলায় বা শিবলিঙ্গে উপাসনা ও প্রতীকোপাসনা। ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইয়া উপাসনা করিলে, উহাই ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত হয়। মনের ভাবনাই আসল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে আমাদের জগৎ, আমাদের মনের সংকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত—মনের সংকল্পের শক্তি অসীম। ঐ শক্তির প্রসারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইতে পারে। যখন দৈনিক শিবপূজায়, আমরা সম্মুখস্থিত ক্ষুদ্র লিঙ্গ মূর্ত্তিতে "সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ"… ইত্যাদি বলিয়া পুষ্প চন্দন প্রদান করি, তখন আমরা উক্ত প্রতীকে ব্রহ্মভাব আরোপ করি ; ইহা অহরহঃ দৃঢ়তার সহিত করিতে থাকিলে, মনও ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইতে হইতে, ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করিবে, ইহা নিশ্চয়। ইহার জন্যই উক্ত প্রকার ভাবনা ও পূজাদির ব্যবস্থা।

অতএব আমরা বুঝিলাম, যে প্রতীকোপাসনা আমাদের ন্যায় নিম্নাধিকারীর জন্য বিহিত। ক্রমশঃ সোপান পরম্পরায় ইহাতে উন্নতি লাভ করা যায়। এবং উন্নতির পূর্ণ পরিণতি ব্রহ্ম। যতদিন না পূর্ণ পরিণতি লাভ করা যায় ততদিন ইহা প্রতীকোপাসনা, ব্রহ্মোপাসনা নহে। প্রতীকোপাসনার উদ্দেশ্য প্রতীকের সমতুল্য হওয়া, সেকারণ ইহা কাম্য এবং অবিদ্যাধিকারের কর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রতীকে ব্রহ্মভাব আরোপ অভ্যস্ত করায়, উক্ত উপাসনার সার্থকতা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বাক্, মন, সংকল্প, চিত্ত প্রভৃতি প্রতীক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহাদের ব্রহ্মভাবে চিন্তনে, উহাদের উপাসনার সার্থকতা, ইহা বলাই বাহুল্য। যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—তখন যাহাকে ইচ্ছা প্রতীক গ্রহণ করিয়া, তাহাতে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও, যে সমস্ত প্রতীক শাস্ত্র সম্মত, যাঁহাদের উপাসনা স্মরণাতীত কাল হইতে সহস্র সহস্র উপাসকগণের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া আসিয়াছে, যাঁহাদের ধ্যান, পূজা, বীজ, মন্ত্র শাস্ত্রে নিবদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যে নিজের প্রকৃতি ও অধিকার অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতীক নির্ব্বাচন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করা প্রয়োজন। ইংরাজিতে যাহাকে Law of Associa-

tion বলে—অর্থাৎ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠানহেতু সংঘাত শক্তির সমবায়ী বলে উহারা শক্তিমান—সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ। সাধারণ মানব নিজের প্রকৃতি ও অধিকার অনুযায়ী প্রতীক নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হয় না। একারণ অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অভিজ্ঞ গুরুর প্রয়োজন। তিনি শিষ্যের প্রকৃতি, শক্তি, অধিকার পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতীক নির্ব্বাচন করিয়া দেন। এই প্রতীকই শিষ্যের ইষ্ট দেবতা। ইহারই উপাসনা শিষ্যের প্রয়োজন। এই ইষ্টোপাসনা কি প্রকারে ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত হইতে পারে—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

নিষ্ঠা বা অনুষ্ঠানভেদে উপাসনা তিন প্রকার :—

উপাসনার আলম্বন ভেদে উপাসনা দ্বিবিধ ইহা বুঝিলাম। নিষ্ঠা বা অনুষ্ঠানের বিভিন্নতানুসারে উহা ভাগবত মতে তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই নিষ্ঠা বা অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা, উপাসকগণের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং অধিকারের উপর নির্ভর করে, ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন :—

> নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
> তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥ ভাগঃ ১১।২০।৭
> যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
> ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ভাগঃ ১১।২০।৮
>
> —এই সংসারে কর্ম্মত্যাগী, বৈরাগ্যবানগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ প্রকৃষ্ট পন্থা। কাম্যকর্ম্মকারী, অবৈরাগ্যশীলগণের পক্ষে কর্ম্মযোগই প্রশস্ত। যাহারা বৈরাগ্যশীল নহে এবং কাম্যকর্ম্মেও অত্যধিক আসক্ত নহে, এবম্বিধ যদৃচ্ছাবশতঃ ভাগবত কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদানকারী। ভাগঃ ১১।২০।৭-৮

সংসারে একপ্রান্তে আসক্তি, অন্যপ্রান্তে বৈরাগ্য—আসক্তি প্রান্তে অবস্থিত জনগণের পক্ষে কর্ম্ম এবং বৈরাগ্য প্রান্তে অবস্থিতগণের পক্ষে জ্ঞান প্রশস্ত। একারণ ভগবান গীতায় এই দুই প্রকার নিষ্ঠারই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবত বলিলেন, ভক্তি এই উভয় প্রান্তের অন্তরস্থ জনগণের পক্ষে প্রযোজ্য। এই অন্তরস্থগণের সহিত উভয় প্রান্তস্থগণের সীমাচিহ্ন নির্দ্ধারণ দুষ্কর বলিয়া, বুঝিতে হইবে, যে ভক্তি সকলের পক্ষে প্রযোজ্য। যিনি জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইবেন, তিনি যদি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত অগ্রসর না হন, তবে তাঁহার সফলতা সুদূরপরাহত। কর্ম্মীর পক্ষেও ঐ একই কথা।

ভাগবতে ভক্তিমার্গের বিশেষ উল্লেখের উদ্দেশ্য :—

ভাগবতে ভক্তিমার্গের উল্লেখ বিশেষভাবে করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা অন্য দুই

মার্গ অপেক্ষা সুগম এবং অতি আসক্ত নয় এবং বৈরাগ্যবানও নয় এরূপ লোকের সংখ্যা সংসারে অধিক। বিশেষতঃ ইহাতে জ্ঞানমার্গের কঠোরতা নাই, কর্ম্ম মার্গের খুঁটিনাটি, আপনা বাঁচান ভাব বর্ত্তমান নাই। ইহা প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম। সাধারণ ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনুষ্ঠান চলিতে পারে। ইহার মূলমন্ত্র :—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

ভাগবতঃ ১১।২।৩৪

—কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার দ্বারা বা স্বভাব বশে যাহা যাহা অনুষ্ঠান করা যায়, সমুদায় পরব্রহ্ম স্বরূপ নারায়ণে সমর্পণ করা বিধেয়।

ভাগঃ ১১।২।৩৪

ইহাতে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ করিবার প্রয়োজন নাই, ফিরাইয়া ভগবন্মুখী করা বিধেয়। ধারাবাহিক ভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিযা গেলে, ভক্তিদেবী ক্রমশঃ তাঁহার কৃপা প্রকাশ করেন। ভক্তি লাভ হইলে আর পাইবার কিছু অবশেষ থাকে না।

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে। ভাগবত ১১।২৬।২৯

—যে সাধুব্যক্তি ভক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার পাইবার জন্য আর কি অবশিষ্ট আছে? ভাগ : ১১।২৬।২৯

ভক্তির অসীম শক্তি :—

ভগবান "ভাববন্ধু" ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভক্তি গাঢ় হইলে ভাব রূপ ধারণ করে। এই ভাব ভগবানকে বন্ধন করিবার শক্তি রাখে। বন্ধন দ্বারা যেমন স্বাধীনতা হরণ করা যায়, সেইরূপ স্বতন্ত্র ভগবান ভাবের জোরে অস্বতন্ত্র হইয়া ভক্তের প্রতিভজন করিতে বাধ্য হন। ভাগবত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

অহং ভক্ত পরাধীনোহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। ৯।৪।৪৬

—ভগবান বলিতেছেন, হে দ্বিজ! আমি ভক্ত-পরাধীন, অস্বতন্ত্রের ন্যায়।

ভাগঃ ৯।৪।৪৬

যিনি একমাত্র স্বতন্ত্র বস্তু, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কারণ, সূর্য্য-চন্দ্র-বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্র-বরুণ-প্রজাপতি প্রভৃতি যাঁহার আজ্ঞাধীন, ভক্তির জোরে তিনি তাঁহার স্বাধীনতা ভুলিয়া যান ; বিশ্বৈশ্বর্য্য বিস্মৃত হন ; অচিন্ত্য, অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য, চিরপূর্ণ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তু নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যাইবার মত হইয়া, ভক্তের সুহৃৎ, সখা, পুত্র, কন্যা সাজিয়া, ভক্তের প্রত্যক্ষ গোচর হন। এই প্রকার ভক্ত বৎসলতার জন্য ভক্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করেন। এবং তাঁহাতে একান্ত ভক্তি প্রার্থনা করেন। তিনি রসসিন্ধু। সমুদায় রস তাঁহাতে অনন্ত পরিমাণে বর্ত্তমান। উহা

সম্পূর্ণ উপভোগের শক্তি, ভক্ত কোথায় পাইবে? তিনি তাঁহার অপার করুণায় উপভোগের শক্তিও বাড়াইয়া দেন। তাড়িত যন্ত্রের উভয় কেন্দ্রের যোগাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ যেমন উভয়ের বৃদ্ধির কারণ হয়, সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও উপভোগ পরস্পরের বৃদ্ধির কারণ হয় এবং উভয়ে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যতক্ষণ না ভক্ত গিয়া রসস্বরূপে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া যায়।

ভক্ত তাঁহার রসাস্বাদ করিয়াই বলেন, যে তাঁহাতে স্থিরভক্তি লাভ হইলে, মুক্তি বা অন্যান্য সম্পদ ধূলি মুষ্টির ন্যায় পরিত্যজ্য। তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে থাকেন :—

> ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করেস্থিতা।
> সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥ বিঃ পুঃ ১৷২০৷২৭

> —হে ভগবন্! সমস্ত বিশ্বের মূলকারণ স্বরূপ তোমাতে যাহার স্থির ভক্তি আছে তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কামে প্রয়োজন কি? মুক্তি তাহার কর সঙ্কেতের দাসী। বিঃ পুঃ ১৷২০৷২৭

তখন সেই ভক্ত ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

> ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
> ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥
> ভাগবত ৬৷১১৷২৩

> —হে সমঞ্জস! তোমার বিরহ যেখানে অর্থাৎ যেখানে তোমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি নাই, এমন স্বর্গ, পরমেষ্ঠিপদ, সার্ব্বভৌমসম্পদ্, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষপদও আমি আকাঙ্ক্ষা করি না।
> ভাগঃ ৬৷১১৷২৩

ভক্তির এত অসীম ক্ষমতা বলিয়া এবং ভক্ত, ভক্তি জোরে, তাঁহাকে তাঁহার স্বরূপ হইতে নামাইয়া নিজের সখা, সুহৃৎ, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির মূর্ত্তি ধারণ করিতে বাধ্য করিয়া, নিজের ইচ্ছামত খেলা খেলিতে, সাজ সাজিতে বাধ্য করেন, বলিয়া ভগবান মুক্তি দিবার জন্য মুক্তহস্ত হইলেও সহজে ভক্তি দান করেন না। ভগবান সূত্রকার "উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকাবৎ॥" ৩৷৩৷৩০ সূত্রে এই তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থে উক্ত সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য। ভাগবত এই জন্য বলিয়াছেন :—

> ......ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ
> স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ ভাগঃ ৫৷৬৷১৮

—ভগবান মুক্তিদাতা মুকুন্দ উপাসকদিগকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি সহজে দান করেন না। ভাগঃ ৫।৬।১৮

পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি একই :—

শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোক—মুক্তি ও ভক্তি উভয়ের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহাতে মনে প্রশ্ন উঠে, যে মুক্তি ও ভক্তি উভয়ের প্রাপ্তি ও অনুভূতিতে পার্থক্য আছে কি? অথবা উক্ত শ্লোক মাত্র ভক্তির প্রশংসা জ্ঞাপক? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে আমরা কি পাই, দেখা যাউক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলিলেন :—

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ গীঃ ৪।৪০

—জ্ঞানলাভ করিয়া অতি শীঘ্র পরম শান্তি লাভ করে। গীঃ ৪।৪০

এই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান—ভগবান বাদরায়ণের ভাষায় বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা; এবং পরম শান্তি মুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কারণ মুক্তি প্রাপ্তিতে সংসার চক্রে গতাগতি হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করা যায়, ত্রিতাপজ্বালার অবসান হয় এবং শাশ্বত বিশ্রান্তি লাভ হয়। এই মুক্তিই পুরুষার্থ লাভ, ইহা ভগবান সূত্রকার "পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥" ৩।৪।১ সূত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন। ইহাই যদি পুরুষার্থ প্রাপ্তি, তবে ভক্তির প্রাধান্য কোথায় রহিল? ভগবান নিজেই এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন; তিনি গীতায় বলিলেন :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ গীতা ১৮।৫৪

—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি, কিছুর জন্য শোক করেন না এবং কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না; সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া তিনি আমার পরাভক্তি লাভ করেন। গীঃ ১৮।৫৪

"ব্রহ্মভূত" পদের লক্ষ্য কি তাহা ভগবান ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮।৫৩ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি, জ্ঞান দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিই পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, যে পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি একই, উভয়ের পার্থক্য নাই। ইহাদের মধ্যে যে পরস্পর পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাও নহে। অধিকারী ভেদে এবং সাধনার অনুষ্ঠানের প্রকার ভেদে, কোনও ভাগ্যবান সাধকের পরাজ্ঞান আগে হয়, আবার কাহারও বা পরাভক্তি আগে হয়; তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, একটি লাভ হইলে, আর একটি আপনাপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। উভয়ের

মধ্যে আত্যন্তিক বিভিন্নতা নাই। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত সাধক যখন সমাধি অবস্থায় থাকেন, তখন তিনি আনন্দস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া, পরাজ্ঞান প্রাপ্তির পরিচয় স্বরূপ হন; সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, সেই একই ব্যক্তিরই দ্বৈত দৃষ্টিহীন ভগবদ্ ভাবই বর্ত্তমান থাকে—সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্ববস্তুতে তাঁহার ভগবদ্ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে; দৃশ্যতঃ দ্বৈতের মধ্যে বিচরণ করিলেও, তিনি ক্ষণমাত্র ভগবান হইতে বা ভগবদ্ ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হন না—ইহা পরাভক্তি লাভের অবস্থা। এই উভয় ভাবের নিদর্শন আমরা শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ও শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীতে দেখিতে পাই, উক্ত সর্ব্বোচ্চ স্তরের সাধক যখন জীবিত অবস্থায় স্থূলদেহে বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাঁহার সমাধি ও ব্যুত্থান অবস্থাদ্বয়ের নিদর্শনে উক্ত উভয় প্রকার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি অবস্থায় অনুভূতি ঃ—

সাধক যখন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ চতুষ্টয় হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দময় কোষে, কারণ শরীরে অবস্থান করেন, তখন তিনি জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মোক্ষপদ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। সে অবস্থায় উক্ত মুক্ত জীব যখন সমাধি অবস্থায় আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার সাযুজ্য মুক্তি বা একত্ব প্রাপ্তি লাভ হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে এ অবস্থায় তিনি অনন্ত কাল অবস্থান করিতে পারেন—ইহা পরাজ্ঞানের অবস্থা। তখন তাঁহার আনন্দস্বরূপ হইতে অভেদে অবস্থান, এবং অভেদ অনুভূতি লাভ হইয়াছে। তখন তিনি আপনাকে আনন্দস্বরূপ হইতে অপৃথকভাবে অনুভব করেন। বলা বাহুল্য, এ অনুভূতি সমাধি অবস্থাতেই উপগম্য। আনন্দের অত্যধিক আতিশয্য হেতু, সাধক উক্ত অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়া লোক সমাজে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না। সমাধি অবস্থাতেই দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি পদ লাভ করেন। তবে ভগবদিচ্ছানুসারে জীবের উপকারের উদ্দেশ্যে তত্ত্বদর্শী গুরুরূপে প্রকৃত পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যুত্থানের পর লোক সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন এবং পিপাসু সাধক ভক্তগণের পরমপন্থা নির্দ্দেশের হেতু দেহ ধারণ করিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। অথবা, উক্ত ভাগ্যবান্ সাধক, আবার যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নির্ব্বাণমুক্তি অঙ্গীকার না করিয়া, উক্ত সমাধি অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া আনন্দময়ের সহিত, আনন্দলোকে, তাঁহার সেবাপরিকররূপে আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন—ইহা পরাভক্তির অবস্থা। এ অবস্থায় আনন্দস্বরূপ ভগবান, উক্ত সাধকের ইষ্টমূর্ত্তিতে প্রকটিত হন; অনন্ত—সান্ত হইয়া, অরূপ বহুরূপ ধারণ করিয়া, সাধকের অভিলাষ মত, প্রভু, সখা, পুত্র, কন্যা, স্বামী প্রভৃতি সাজিয়া তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করেন। ভগবান সূত্রকার "গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ॥" ৩।৩।২৯ সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মূলগ্রন্থে উক্ত সূত্রের আলোচনায় বর্ত্তমান প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত

হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে ভগবানের রূপ, ধাম, পরিকর, পরিজন প্রভৃতি সমুদায় ভগবানের স্বরূপ ভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বে গঠিত—সমুদায় চিন্ময়। ইহা ভগবান সূত্রকার "অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ॥" ৩।৩।৩৫ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিত্য ধামের বস্তুর অভেদ, উহাতে দ্বৈত প্রতীতি নাই; ইহা মূল গ্রন্থে "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ॥" ৪।৪।৪ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। ভক্তকে আনন্দ দিবার জন্য ভোগ ভগবানের বিধানে আপনাপেনিই উপস্থিত হয় ইহা "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ॥" ৪।৪।১৩ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে।

আনন্দস্বরূপকে অনন্তপ্রকারে সম্ভোগ, যে কত আনন্দকর, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, মনে চিন্তা করা যায় না, বুদ্ধির ধারণার অতীত। এইজন্য ভক্ত ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছাড়িয়া মোক্ষ প্রার্থনা করেন না ইহা উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ৬।১১।২৩ শ্লোকে সুস্পষ্ট কথিত আছে। এইজন্য ভক্ত মুক্তিলাভ পরিহার করেন। মুক্তি অবস্থায় আনন্দস্বরূপের অনুভূতি—ভূমা আনন্দ প্রদান করে বটে, কিন্তু উক্ত অনুভূতিতে নিজেরই আনন্দ ভোগ। আনন্দস্বরূপ ভগবানকে আনন্দদানরূপ অনুভূতির স্থান উহাতে নাই। এ কারণ শ্রীমদ্ ভাগবত উহাকে "কৈতব" বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভক্ত নিজের সুখের জন্য ভগবানকে উপাসনা করেন না, ভগবানের জন্য ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁহার উপাসনা করেন। ভগবান সূত্রকার "উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ॥" ৩।৩।৩০ সূত্রে ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থে উক্ত সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য। পরাভক্তি লাভের অবস্থা, উক্ত ৩।৩।৩০ সূত্রে প্রতিপাদিত রাগানুগা ভক্তি সাধনার চরমপ্রাপ্তি। উক্ত পরাভক্তির অবস্থায়, যে আনন্দস্বরূপের সঙ্গ সম্ভোগরূপ অনুভূতি তাহার সহিত আনন্দস্বরূপকে আনন্দদানরূপ মধুর অনুভূতি—সংজড়িত। নিজের আনন্দ সম্ভোগ গৌণ মাত্র—মুখ্য লক্ষ্য ভগবানকে আনন্দ দান—একারণ ভক্তি পথাবলম্বী আচার্য্যগণ পরাভক্তির অবস্থা গরীয়সী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে নিজের ইচ্ছামত সাজে সাজায়, নিজের ইচ্ছামত খেলা খেলিতে বাধ্য করে। বিশ্বরাজের ঐশ্বর্য্য উহাদের চক্ষে হেয়; তাঁহার মাধুর্য্যেই উহারা বিভোর এবং সেই মাধুর্য্যের বিভিন্ন প্রকার আস্বাদনের জন্য ভগবানকে বিভিন্ন প্রকারে উপভোগ করিয়া থাকে। উহাদের হাতে ভগবান খেলার পুতুল, নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে অসমর্থ—এজন্য তিনি সহজে এ প্রকার অবস্থা প্রদান করেন না। এ কারণ বলা হয়, যে যদিও তিনি মুক্তিদানে মুক্ত হস্ত, ভক্তিপ্রদানে রুদ্ধ হস্ত। নিত্যধামে যে অনুভূতির কথা বলা হইল, উহা নিত্য। সুতরাং ভক্ত নিত্য, ভগবান নিত্য, ধামপরিকর প্রভৃতি সমুদায় নিত্য। প্রলয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও, নিত্য ধামে এবং তত্রস্থ বস্তু জাতে কালের প্রভাব বর্ত্তমান নাই। উহা অনন্তকাল স্বরূপে বর্ত্তমান। প্রকৃত কথা, ভগবানের স্বরূপ হইতে উহাদের পার্থক্য নাই।

পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি অবস্থার অনুভূতি, ভাগ্যবান সাধক দ্বৈত প্রপঞ্চে জীবিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও, লাভ করিতে পারেন; তখন তাঁহার জীবন্মুক্ত অবস্থা। ভগবান সূত্রকার এ অবস্থার আলোলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদে ৩।৪।১৫ সূত্র হইতে ৩।৪।৩৫ সূত্র পর্য্যন্ত ২১টি সূত্রে বিস্তারিত ভাবে করিয়াছেন। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। মূল গ্রন্থে উক্ত সূত্রগণের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী:—

প্রথমোক্ত পরাজ্ঞানের অবস্থাকে সংক্ষেপতঃ জ্ঞানীর অবস্থা এবং শেষোক্ত পরাভক্তির অবস্থাকে এক কথায় বিজ্ঞানীর অবস্থা বলা হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—"ঈশ্বর আছেন, এটি বোধে বোধ—এর নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্য ভাবে, সখ্যভাবে, দাস্যভাবে, মধুর ভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব-জগৎ তিনি হ'য়েছেন, এটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান"। জড় বিজ্ঞানের নিদর্শনে ইহা বুঝবার-চেষ্টা করা যাউক।

জল উত্তপ্ত করিলে, সম্প্রসারিত হইয়া, বাষ্পে পরিণত হয়, উক্ত বাষ্প কোনও পাত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, উহা উক্ত পাত্রের চতুর্দ্দিকে চাপ দিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করে—ইহা জ্ঞান। কিন্তু যখন বালক ষ্টীফেনসন্ (Stephenson) চায়ের কেট্‌লির ঢাকান, অভ্যন্তরস্থ গরমজল হইতে উত্থিত বাষ্পের চাপে উত্থিত পতিত হইতে দেখিয়া, বাষ্পের সাধারণ সম্প্রসারণ শক্তিকে সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ষ্টীম্ এনজিন প্রস্তুত করিলেন, এবং তদ্দ্বারা শিল্পজগতে যুগান্তর আনয়ন করিলেন, ভূপৃষ্ঠে বা সমুদ্রের উপর দিয়া সুদূর গমনাগমন সুকর করিলেন, তখন তাহার কার্য্য বিজ্ঞানের পরিচায়ক।

দুইটি বিজাতীয় পদার্থের ঘর্ষণে তড়িতোৎপত্তি হয় এবং তড়িৎ যোগাত্মক ও ঋণাত্মক ভেদে দুই প্রকার; পরীক্ষা দ্বারা ইহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি—জ্ঞান, কিন্তু যখন উক্ত উভয় প্রকার তড়িৎ দুইটি পৃথক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহাদের সুকৌশল নিয়মণে ব্যবহারোপযোগী করত, বৈদ্যুতিক আলোক, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ট্রাম বৈদ্যুতিক রেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের আরাম, সুখ, সুবিধা প্রভৃতি সংঘটিত করা হইল, তখন উহা বিজ্ঞানের কার্য্য।

সেইরূপ ভগবান, ব্রহ্ম বা সৎস্বরূপ বিশ্বের সমুদায় বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, পিতৃ-মাতৃ শক্তিরূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া সকলকে প্রাণবান্, ক্রিয়াশীল

করিতেছেন—ইহা জ্ঞান। কিন্তু যখন উক্ত পিতৃ-মাতৃ শক্তি পৃথক্ পৃথক্ কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিয়া, পিতৃ-শক্তি স্থানীয় যোগাত্মক কেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং মাতৃশক্তিস্থানীয় ঋণাত্মক কেন্দ্রকে, তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিরূপা রাধিকারূপে প্রকটিত করিয়া, উহাদের মিলন বিরহ প্রভৃতি ঘটাইয়া আনন্দলাভের এবং জনসাধারণকে আনন্দদানের ব্যবস্থা করা হয়, তখন উহা বিজ্ঞানের কার্য্য। জড় বিজ্ঞানীর হাতে যেমন বাষ্পের সম্প্রসারণ শক্তি, অথবা তড়িতের যোগাত্মক ঋণাত্মক শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া, লোকের সুখের, আনন্দের কারণরূপে পরিণত হয়; সেইরূপ সাধক বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানীর হাতে ভগবানের পিতৃ-মাতৃশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করতঃ, আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ ছুটাইতে থাকে এবং উক্ত প্রস্রবণের ধারা উক্ত সাধককে প্লাবিত করিয়া—আপামর সাধারণের আনন্দ উৎপাদনের কারণ হয়।

জ্ঞানীর অবস্থা তড়িৎ বাহক তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহের গতির তুল্য—তড়িৎ প্রবাহের শক্তিতে তার পরিপূর্ণ, কম্পমান, কিন্তু বাহ্যিক অভিব্যক্তি নাই—অন্তরে অন্তরে উহার ক্রিয়া। বিজ্ঞানীর অবস্থা, তড়িতের যোগাত্মক ও ঋণাত্মক কেন্দ্রদ্বয় পরস্পরের নিকট সংস্থাপন, উভয়ে উভয়ের তড়িৎশক্তি উদ্দীপনের ও বৃদ্ধির কারণ। জ্ঞানী যখন সমাধি অবস্থায় আনন্দস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন আনন্দ প্রবাহ তাঁহার অন্তরে বাহিরে প্রবহমান। কিন্তু যখন তিনি ব্যুত্থান অবস্থায় বিজ্ঞানীর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত, তখন সমুদায়ে তাঁহার ব্রহ্মভাব, তিনিও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত। ব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার শক্তিও অসীম। ব্রহ্ম যেমন রস স্বরূপ—সমুদায় রসের চিরপূর্ণ অফুরন্ত ভাণ্ডার, তিনিও তেমন রস উপভোগের অসীম শক্তি ধারণ করেন। এক কেন্দ্রে ব্রহ্ম বা ভগবান——যোগাত্মক পিতৃশক্তির প্রতীকরূপে এবং অপর কেন্দ্রে তিনি স্বয়ং ঋণাত্মক মাতৃ বা প্রকৃতিশক্তির প্রতীকরূপে, বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়ে উভয়ের আনন্দ বৃদ্ধির কারণ হন।

এই শেষোক্ত ভাব সহজ লভ্য নহে। জ্ঞানী নিজের ভূমা আনন্দ উপভোগ পরিত্যাগ করিয়া সহজে ব্যুত্থান অবস্থায় নামিতে চান না, ভূমা আনন্দে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্তু একবার নামিয়া আনন্দময়কে প্রত্যক্ষ উপভোগ করিতে পারিলে, আর তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই উপভোগে আনন্দের অনুভূতি যে কত, তাহা ভাষায় বলিবার নহে। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারে যে আনন্দ উপভোগ করি, তাহা উক্ত ভূমা আনন্দের অতিক্ষীণতম প্রত্যাভাস মাত্র। আত্মার শক্তি অসীম, উপভোগ করিবার ক্ষমতাও অনন্ত; পরমাত্মাও রসের অনন্ত ভাণ্ডার—উহার সম্ভোগও অনন্ত প্রকারে অনন্ত গুণে সম্ভব। সুতরাং বিজ্ঞানীর আনন্দ উপভোগের সহিত কোনও প্রকার তুলনা সম্ভব নহে। অতএব আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম, যে ভাগবতের ৬।১১।২৩ ও ১১।১৪।১৩ শ্লোকে কেন বলা হইয়াছে, যে ভক্ত ভগবানকে ছাড়িয়া স্বর্গ সুখ, প্রজাপতিপদ প্রভৃতি এমন কি মোক্ষ পদও প্রার্থনা করেন না।

ভগবানের কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না :—

ভগবানের কৃপা ভিন্ন, তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার গুণ, কর্ম্ম, শক্তি প্রভৃতি অনুভব করা যাইতে পারে না শ্রুতি ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনুং স্বাম্॥ কঠ ১।২।২২

—বহুশাস্ত্রাধ্যয়নে, বা বুদ্ধি দ্বারা, অথবা বহু শাস্ত্র শ্রবণে আত্মজ্ঞান লভ্য নহে ; ভক্তিভাবে আরাধিত ঈশ্বর যে ভক্তকে বরণ করেন, অর্থাৎ নিজস্বরূপ অনুভবের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার নিকট তিনি নিজ স্বরূপ ব্যক্ত করেন। কঠ ১।২।২২

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ভাগবত বলিতেছেন :—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ভাগবত ২।৯।৩১

—ভগবান ব্রহ্মাকে বলিতেছেন :—তুমি জীব পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ; জীবের সাধ্য কি, আমি আপনি আপনাকে না জানাইয়া দিলে, আমার তত্ত্ব জানিতে পারে ?

চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী ইহার অর্থ নিম্নোদ্ধৃত পযারে প্রকাশ করিতেছেন :—

যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণকর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি॥
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে॥

—ভগবানের কৃপা না হইলে তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার লীলা, তাঁহার শক্তির খেলা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

ভগবানের কৃপা লাভের উপায় :—

ভগবানের কৃপা লাভ করিতে হইলে, তাঁহার ভক্ত মহৎ ব্যক্তির চরণ-রজে স্নান করা প্রয়োজন। ভাগবত ইহা বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি নচেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্‌॥
ভাগঃ ৫।১২।১২

—হে রহূগণ! এই প্রকার আত্মতত্ত্ব, মহাপুরুষদিগের চরণরজের অভিষেক ব্যতিরেকে, তপস্যা, বৈদিককর্ম্ম, অন্নাদি সংবিভাগ, গৃহধর্ম্মার্থ পরোপকার, বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির উপাসনা, কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভাগঃ ৫।১২।১২

ভাগবত অন্যত্রও বলিতেছেন :—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং
ন বৃণীত যাবৎ॥ ভাগঃ ৭।৫।২৫

—যদিও এক বিষ্ণু সর্ব্ব প্রাণীতে গূঢ়, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী সত্য, তথাচ বিষয়াভিমান শূন্য মহত্তম পুরুষদিগের পদধূলি দ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয়, তাবৎ বেদবাক্য দ্বারা ঐরূপ বিষ্ণু পরোক্ষভাবে জ্ঞাত হইলেও গৃহাসক্ত পুরুষদিগের মতি তাঁহার চরণ প্রাপ্ত হইতে পারে না বরং অসম্ভবনাদি দ্বারা ব্যাহত হয়। পরন্তু এ প্রকার ভগবৎ পদারবিন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই সংসার দূরীভূত হয়। ভাগঃ ৭।৫।২৫

ভগবদ্‌ভক্তের সেবা, ভগবদ্‌ভক্তি প্রাপ্তির প্রধান সাধন। ভগবান সূত্রকার ইহা "অনুবন্ধাদিভ্যঃ।",—৩।৩।৫০ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেরূপ কোনও ধনবান ব্যক্তি দয়া করিয়া আপনার প্রাচুর্য্য হইতে কিছু ধন, দানের যোগ্য দরিদ্র ভিক্ষুককে দান করিতে পারেন, কোনও কষ্ট বোধ করেন না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম ধনে ধনী গুরু, কৃপা করিয়া আপনার প্রাচুর্য্য হইতে তত্ত্বজ্ঞান, উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যকে প্রদান করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। ভগবান সূত্রকার ইহা "প্রদানবদেব তদুক্তম্‌।" ৩।৩।৪৩ সূত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, নিজ দেহ রক্ষার প্রাক্কালে তদীয় উপযুক্ত শিষ্য বিবেকানন্দে, আপনার সমূহ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের ন্যায় সন্দিগ্ধ মনাঃ প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি। গুরুকৃপার শক্তি অসীম। এ প্রকার গুরুলাভ কি সহজে হয়? উক্ত সঙ্গ লাভ এবং উপযুক্ত গুরুপ্রাপ্তি, ভগবানের কৃপাতেই সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি বাহিরে গুরুরূপে, বা নিজ ভক্তরূপে দেখা দিয়া চরণ রজে অভিষিক্ত হইবার সুযোগ প্রদান করেন,

এবং অন্তরে নিজের স্বরূপ প্রকট করেন। ইহা ১১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৯।৬ শ্লোকার্দ্ধ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব দুঃখ করিবার বা হতাশ হইবার কিছুই নাই। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্য সহাবস্থান। আগন্তুক কারণে অজ্ঞান মেঘ স্বপ্রকাশ নিজ স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়াছে মাত্র। ভগবানের মঙ্গল বিধানে মেঘ দূরীভূত হইবেই এবং চিরোজ্জ্বল আত্মজ্যোতিঃ বিমল তেজে প্রদীপ্ত হইতে থাকিবে। পাপ মনে সন্দেহ উঠে, তাঁর কি কৃপা করিবার শক্তি আছে? যেন আমরা তাঁহার সমগ্র শক্তি, সমগ্র ভাব প্রভৃতি অবধারণ করিয়া তাঁহাকে আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি! কি ভ্রম ধারণা! কি আত্মঘাতী সন্দেহ! যিনি অনন্ত, তাঁহাকে আমাদের ক্ষুদ্র মন বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত করিব কিরূপে? যিনি একমাত্র স্বতন্ত্র, স্বরাট্ ঈশ্বর, তাঁহার শক্তি প্রকাশের হেতু নির্দ্দেশ করিবার কি দারুণ স্পর্দ্ধা, আমরা ক্ষুদ্র মানব আমাদের ক্ষুদ্র মনে পোষণ করি। ভগবান নিজের করুণায় ও প্রকার চিন্তার কল্পনা হইতে মুক্ত করুন, তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা করিয়া উপসংহার করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

অবতার তত্ত্ব

প্রত্যেক অবতারই পূর্ণ :—

প্রতীকোপাসনায় রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রতীকরূপে উপাসনার কথা লিখিত হইয়াছে। রাম কৃষ্ণাদির অবতার বলিয়া চিরন্তন প্রসিদ্ধি। প্রতীকে ব্রহ্মভাব অর্পণ করিয়া উপাসনা করিলে, উহা ব্রহ্মোপাসনার পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে, ইহাও কথিত হইয়াছে, এখন রাম কৃষ্ণাদি অবতার ব্রহ্ম স্বরূপ কি না, অথবা উহাতে ব্রহ্মভাব অর্পণ কেবল মনঃ কল্পনা মাত্র, ইহা বুঝিবার জন্য অবতার তত্ত্বের অবতারণা। অবতার প্রধানতঃ তিন প্রকার—ইহার আলোচনা পরে করা হইবে। বর্ত্তমানে প্রথমতঃ অংশাবতারের আলোচনা করা হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, যে "অংশাবতার" ভগবদবতারের সাধারণ নাম—অংশাবতারগণই পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম বলিয়া ভাষায় কথিত হন, কেন হন, তাহা আমাদের আলোচ্য।

মূলগ্রন্থে ৩।৩।৪০ ও ৩।৩।৪২ সূত্রে অবতার সম্বন্ধে স্থূল কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি, যে প্রত্যেক অবতারই পূর্ণ; পূর্ণের অংশ অসম্ভব, একারণ কোনও বিশেষ অবতার পূর্ণের অংশ, ইহা মনে করা ভ্রম মাত্র। তবে যে পূর্ণাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে, কোনও বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কোনও বিশেষ অবতারে সমগ্র শক্তি প্রকটনের আবশ্যকতা না হওয়ায়, শক্তির আংশিক প্রকটনে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায়, উক্ত অবতারকে অংশাবতার বলা হয় মাত্র। এই প্রকার শক্তি প্রকটণের অল্পাধিক্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ভাষায়, অংশাবতার, পূর্ণাবতার, পূর্ণতর অবতার, পূর্ণতম অবতার প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। এ প্রকার উক্তির মূল—শক্তি প্রকটনের আপেক্ষিকতায়, ইহা বুঝা গেল। ৫২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং..." ৫।১ মন্ত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যে অবতারী পূর্ণ এবং অবতারও পূর্ণ, এবং পূর্ণ এক, অদ্বিতীয় হওয়া উচিত। এ সিদ্ধান্ত শক্ত্যাবেশ অবতারে প্রযোজ্য নহে, ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

অবতারে জীবভাব ও ব্রহ্মভাব উভয় ভাবই বর্ত্তমান :—

৩।৩।৪০ সূত্রের আলোচনায় আমরা আরও বুঝিয়াছি, যে অবতারে জীবভাব ও ব্রহ্মভাব উভয় ভাবই বর্ত্তমান। ব্রহ্ম বা ভগবান, রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতাররূপে প্রপঞ্চে

প্রকটিত হইলেও, এবং ইতিহাস বা পুরাণ উঁহাদের নাম ও কৃতকর্ম্মের ভূরি ভূরি উল্লেখ করিলেও, ইতিহাস বা পুরাণ কথিত, সূর্য্য-চন্দ্র বংশোদ্ভব রাম-কৃষ্ণ আমাদের উপাস্য নহেন, এবং তাঁহাদের ইতিহাস—পুরাণাদিতে উল্লিখিত কার্য্যাবলী আমাদের চিন্তনীয় নহে। তাঁহাদের ব্রহ্ম ভাবই, অথবা অন্য কথায় রাম-কৃষ্ণরূপী পরব্রহ্মই আমাদের উপাস্য এবং তাঁহাদের লীলা ও ঐতিহাসিক ব্যক্তির কর্ম্মে অনেক অন্তর। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে ৩।৩।৪০ ও ৩।৩।৪২ সূত্রে আলোচিত বিষয়ের অতি সংক্ষেপ উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

অবতার তত্ত্বের মূল সূত্র :—

অবতার তত্ত্বের মূল সূত্র ভগবান গীতায় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন :—

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা: ৪।৬

> —আমি জন্ম রহিত, আমার স্বাভাবিক জ্ঞান, শক্তি চিরকাল অক্ষীণ ভাবে বর্ত্তমান, আমি ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভবনধর্ম্মশীল সমুদায়ের ঈশ্বর (নিয়ন্তা), এবম্প্রকার হইলেও, আমি আমার স্বকীয়া প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, এবং উহাকে বশে আনিয়া আমার সংকল্পের দ্বারা দেহবানের ন্যায় আবির্ভূত হই। গী: ৪।৬

শ্লোকে "স্বাং প্রকৃতিং" ও "আত্ম মায়য়া" এই উভয় প্রয়োগ রহিয়াছে। মায়াতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে প্রকৃতি ও মায়া, ব্রহ্ম বা ভগবানের শক্তি; ভগবান উদ্ধৃত শ্লোকে "স্বাং" ও "আত্ম" পদের ব্যবহারে ইহাই প্রকাশ করিলেন। প্রকৃতি ও মায়া উভয়ে ব্রহ্মশক্তি হইলেও, উভয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিভেদ আছে, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হয় নাই; এখানে তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ করিতেছি। মায়াতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে মায়া ব্রহ্মের বা ভগবানের সংকল্পাত্মিকা অচিন্ত্যা শক্তি। এই শক্তি বিকাশে নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, নিগুর্ণ-সগুণ ব্রহ্ম, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত প্রকটন করেন, বিশ্ব অভিব্যক্ত করেন এবং অবতার প্রকটন করেন। অবতার প্রকটনের জন্য উপাধির প্রয়োজন—প্রকৃতিই উপাধির উপাদানের ভাণ্ডার, প্রকৃতি হইতে উপাধি সংগ্রহ করিয়া, ভগবান আপনাকে দেহবানের ন্যায় অভিব্যক্ত করেন। এই সূক্ষ্ম বিভেদ বুঝাইবার জন্য মূলগ্রন্থে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় যে

দুটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে "মায়া" ও প্রকৃতি পৃথক্ ভাবে দেখান হইয়াছে। তিনি নিজেই কর্ত্তা, নিজেই কর্ম্ম, নিজেই করণ, নিজেই অধিকরণ। ভাগবত একটি শ্লোকে ইহা সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন :—

স এব আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ॥ ভাগঃ ২।৬।৩৭

—যিনি নিজে অজ, তিনি পুরুষাবতার হইয়া, আপনি, আপনাতে, আপনা দ্বারা, আপনাকে সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন, অর্থাৎ যিনি আপনি কর্ত্তা, আপনি অধিকরণ, আপনি করণ এবং আপনিই কর্ম্ম, তিনি এই জন্মরহিত আদিপুরুষ ভগবান। ভাগঃ ২।৬।৩৭

ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম, যে তিনি যা, তাঁহার অধিষ্ঠান প্রভৃতিও তাই, এবং তাঁহার অবতারও তাই। পরস্পরের মধ্যে ভেদ মাত্র নাই। তাঁহার সংকল্পবশতঃ বিভিন্নতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র।

অবতার গ্রহণের উপযোগিতা :—

'অবতার' শব্দের অর্থ অবতরণ, অথবা অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে অবতরণে যিনি প্রকটিত মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই প্রকটিত মূর্ত্তিধারী। মাণ্ডুক্য শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম "অদৃষ্টমব্যবহার্যমলক্ষণমব্যপদেশ্যম্" (দেখ পৃষ্ঠা ৪২)। যিনি সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দেশের অযোগ্য, বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকে কি করিয়া ধারণা করা যাইবে? তিনি যদি আপনার সর্ব্ব প্রকারে নির্দ্দেশের অযোগ্য ভাব পরিহার করিয়া আমাদের ধ্যান ধারণার স্তরে অবতরণ করেন, অন্য কথায় অবতার গ্রহণ করেন, আমাদের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করেন, আপনার অসঙ্গ, উদাসীন, সর্ব্ব বিলক্ষণ ভাব, আপনাতে সাময়িক ভাবে লুক্কায়িত রাখিয়া আমাদের হর্ষ-বিষাদ, জয়-পরাজয়, সাফল্য-বৈফল্য প্রভৃতি অঙ্গীকার করিয়া আমাদের পরিবেশের মধ্যে, আমাদেরই স্বজন, সখা, বন্ধু, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী প্রভৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তবেই ত আমরা অনুভব করিতে পারি, তিনি কত মধুর, কত প্রাণারাম। তবেই ত আমরা তাঁহার আচরণের, কার্য্যের অনুকরণ করিয়া আমাদের নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তির পথ সুকর করিতে পারি। প্রকৃত পক্ষে, যিনি স্বরূপে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঠ ১।৩।১৫), তিনি আপনার স্বরূপ সাময়িকভাবে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদেরই আত্মীয়রূপে রাম-কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে, সেই স্বরূপ যখন প্রকটিত হইলেন, তখন তিনি "ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈক পদং" "সকল সুন্দর সন্নিবেশং" বপুঃ ধারণ করিয়া "ভূমিষ—

মহোৎসবং” বিধান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার “অশব্দ” স্বরূপ কোথায় রহিল? তাঁহার বংশী নিনাদে ও কলগানে স্থাবর জঙ্গমগণ পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গো মৃগ পক্ষী প্রভৃতি “দন্তদষ্টকবলাধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিব”-জড় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং অন্য পক্ষে বনলতা ও তরুগণ “প্রণতভারবিটপামধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবঃ ববৃষুঃ স্ম”—প্রেম রোমাঞ্চিত তনু হইয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়া জঙ্গম স্বভাবের পরিচয় দিয়াছিল। তাঁহার “অস্পর্শ” স্বরূপের কি তখন চিহ্নমাত্র ছিল? তাঁহার অঙ্গ স্পর্শে লোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্রহ্মানন্দানুভূতির অমৃত প্লাবন প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি দৃশ্যমান নরবপুঃ ধারণ করিয়া এবং সেই বপুতে বাল্য, কৌমার, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব প্রভৃতি প্রকটিত করিয়া আপনার অব্যয় স্বরূপ আচ্ছাদিত রাখিয়াছিলেন। এক কথায়, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ছিলেন, তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত হইয়া, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার উপভোগ কত মধুর, তাহা তৎকালে বর্ত্তমান ভাগ্যবান্ জীবগণের অনুভব গোচর করাইয়া ভবিষ্যৎ অসংখ্য জীবের উক্ত প্রকার অনুভূতি লাভের পথ সুগম করিবার জন্য, লীলা প্রকটন করতঃ পুনরায় আপনাকে লোক-চক্ষুঃর অন্তরালে তিরোহিত করিলেন। অবতারের আবির্ভাব-তিরোভাব, আমাদিগের জন্ম মৃত্যুর মত নহে; ইহা ৩।৩।৪২ সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি নিত্য, অনন্ত, অবিকারী, সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন, তিনি যখন আপনাকে সান্ত, পরিচ্ছিন্ন, দেহবান্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আমরা তাঁহার আবির্ভাব বা উৎপত্তি বা জন্ম বলি; আবার যখন তিনি উক্ত অভিব্যক্তি উপসংহার করেন, তখন আমরা তাঁহার তিরোভাব বলি, এজন্য সপ্তশতী চণ্ডীতে ঋষি বলিয়াছেন :—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ১।৬৪
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥১।৬৫

—সেই দেবী নিত্যা বা উৎপত্তি নাশ রহিতা; এই জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি; তিনি, এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও, তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া জগতে অভিহিতা হন।

তিনি উৎপন্ন হইলেও, বা অন্যকথায় অবতার গ্রহণ করিলেও, তাঁহার সর্ব্বভূত-মহেশ্বরস্বরূপ স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না। তিনিই সকলের নিয়ন্তা। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিয়া তিনি সকলকে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত

করিতেছেন। তাঁহার নিয়ন্তা ত কেহ নাই, তাঁহাকে অবতার গ্রহণে বাধ্য করিবে কে? তাঁহার অপার করুণাই তাঁহার অবতার গ্রহণের কারণ। তাঁহার ক্রীড়ার সঙ্গী, অতি প্রিয় জীব, তাঁহার কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার অযথা পরিচালনে সংসার প্রবাহে উত্থিত পতিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি, তাহাদের কল্যাণের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের সুপথে প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় প্রদর্শন করেন; ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

অবতারের উপাধি বা দেহ কি জীবের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক?

১৪০ পৃষ্ঠায় উপরে ভাগবতের যে ২।৬।৩৭ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত স্বতঃই হইয়া পড়ে, যে অবতারের দেহ তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ উক্ত শ্লোকে নাই। মহাভারতের টীকাকার দর্শনাচার্য্য শ্রীমন্নীলকণ্ঠ, গীতার ৪।৬ শ্লোকের টীকায় শিরোদেশে উদ্ধৃত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। নীলকণ্ঠ বলিতেছেন:—

নন্থ তর্হি ভগবচ্ছরীরস্য কিমুপাদানম্? অবিদ্যেতি চেৎ, ন, পরমেশ্বরে তদভাবাৎ। জীবাবিদ্যা চেৎ, ন, শুক্তিরজতাদেরিবতুচ্ছত্বাপত্তেঃ চিন্মাত্রং,চেন্ন, চিতঃ সাকারত্বাযোগাৎ, তথাত্বে বা তস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাপত্তিঃ। তস্মাৎ কিমালম্বনোঽয়ং ভগবদ্দেহো দেবকী-গর্ভ-প্রবেশ-জনন-বাল্য-কৌমার-পৌগণ্ড-যৌবনাদি প্রতীতি বিষয় ইতি চেৎ শৃণু, "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" ইতি। অয়মর্থঃ—জীবাত্মানো হি অনাত্মভূতং প্রকৃতিং তেজোবন্নাত্মিকাং পঞ্চভূতাত্মিকাং বা অধিষ্ঠায় সম্ভবন্তি, জন্মাদীন্ লভন্তে, অহন্তু স্বাং প্রত্যগনন্যাং প্রকৃতিং প্রত্যক্ চৈতন্যমেবেত্যর্থঃ,তদেবাধিষ্ঠায় নতূপাদানান্তরম্, আত্মমায়য়া স্বীয় মায়য়া সম্ভবামি। যথা কশ্চিন্মায়াবী স্বয়ং স্বস্থানাদপ্রচ্যুতস্বভাবোঽপি অদৃশ্যো ভূত্বা, স্থূলসূক্ষ্মভূতান্যনুপাদায় কেবলয়া মায়য়া দ্বিতীয়ং মায়াবিনং স্বসদৃশমেব সূত্রমার্গেণ গগনমারোহন্তং সৃজতি। এবমহং কূটস্থ চিন্মাত্রোঽগ্রাহ্যঃ স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং সৃজামি, তস্য বাল্যাদ্যবস্থাশ্চ—সূত্রারোহণবদ্দর্শয়ামি, এতাবাংস্তু বিশেষঃ। লৌকিক মায়াবী মায়ামুপসংহরন্ দ্বিতীয়ং মায়াবিনমপ্যুপসংহরতি। অহন্তু তামনুপসংহরন্ স্ববিগ্রহমপি নোপসংহরামীতি।......তস্মাৎ সিদ্ধং—পরমেশ্বরস্য মায়াময়ং শরীরং নিত্যমিতি।"

আচ্ছা, তাহা হইলে ভগবদ্ গৃহীত শরীরের উপাদান কি? উহা কি অবিদ্যা?—তাহা হইতে পারে না, কেননা পরমেশ্বরে অবিদ্যা থাকিতে পারে না। তবে কি জীবাবিদ্যা? না, তাহাও নয়, তাহা হইলে শুক্তি-

রজতাদির ন্যায় উক্ত শরীরের তুচ্ছতা সিদ্ধ হইয়া পড়ে। তবে কি চিন্মাত্র? না, তাহাও নয়, কেননা চিৎ সাকার হইতে পারে না, সুতরাং চিন্মাত্র হইলে উক্ত শরীর ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইত। অতএব ভগবদ্দেহের আলম্বন কি? কিছু আলম্বন না থাকিলে দেবকী গর্ভে—প্রবেশ, জনন, বাল্য, কৌমার পৌগণ্ড, যৌবনাদি, প্রতীতিবিষয় হয় কি প্রকারে? ইহার উত্তর শুন, ভগবানই—বলিতেছেন, "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—ইহার অর্থ এই, জীব তাহার নিজের অনাত্মভূত, তেজ-জল-অন্নাত্মক বা পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, জন্ম প্রভৃতি লাভ করে। কিন্তু আমি আমার নিজ প্রত্যক্‌চৈতন্যাত্মক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, অন্য উপাদান গ্রহণ না করিয়া, আপনার মায়া দ্বারা প্রকটিত হই। যেমন কোনও মায়াবী, নিজে স্বস্থান হইতে অপ্রচ্যুত স্বভাব হইয়াও, অদৃশ্য হওত, স্থূল সূক্ষ্মভূত উপাদান রূপে গ্রহণ না করিয়া, কেবলমাত্র মায়া বিকাশে নিজের সদৃশ দ্বিতীয় মায়াবী এবং তাহার, একগাছি সূত্রসহযোগে, আকাশারোহণ সৃজন পূর্ব্বক, দর্শকগণের দৃষ্টি সমক্ষে প্রকটিত করে, সেইরূপ আমিও কূটস্থ চিন্মাত্র ভাবে অপ্রচ্যুত স্বরূপে থাকিয়া আমার মায়া বিকাশে, আমার চিন্ময় শরীর সৃজন করিয়া, সূত্রারোহণরূপ, উক্ত শরীরের বাল্যাদি অবস্থা প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত করি। লৌকিক মায়াবী মায়া উপসংহার করিলে, দ্বিতীয় মায়াবীও উপসংহৃত হয়, কিন্তু আমি আমার মায়া উপসংহার করি না এবং আমার বিগ্রহও উপসংহার করি না। ......এজন্য পরমেশ্বরের মায়াময় শরীর নিত্য।

অতএব পূজ্যপাদ মহাভারত-টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠের মতে, ভগবানের অবতারগণের বিগ্রহ নিত্য এবং লীলাও নিত্য। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিত্যধাম ও সেখানে ভগবানের অবতার বিগ্রহগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বে গঠিত। ইহা মূল গ্রন্থে ৪।৪।১ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। নিত্যধামে ভগবানের অবতার বিগ্রহগণ বর্ত্তমান থাকিয়া নিত্য লীলা করিতেছেন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে কাল বিপ্লবে অবতার পরিগ্রহণ এবং লীলা প্রকটন চলিতেছে এবং চক্র ভ্রমিক্রমে আমাদের পৃথিবীতে যখনই উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় তখনই অবতার প্রকটিত ও লীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; ইহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের মত। শ্রীমদ্ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও তাঁহার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে সীতাদেবীর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা, তাঁহারই শ্রীমুখে কথিত উক্তি এবং উক্ত উক্তির সমকালে, আমাদের ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সন্দিগ্ধচিত্ত, অথচ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা লিপিবদ্ধ বিবরণ হইতে অবগত হই।

অবতার তত্ত্বের রহস্য :—

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, যে ভগবানে দেহ-দেহী ভেদ নাই, এবং অবতার—ভগবানেরই ব্যক্তে প্রকটিত মূর্ত্তি, উক্ত মূর্ত্তি মায়াময়, অর্থাৎ ভগবানের সংকল্প বশতঃই উক্ত মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করে। যুক্তিতেও আমরা এই একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই। ব্রহ্ম বা ভগবান, সর্ব্বব্যাপী, চিরপূর্ণ। তিনি অদ্বিতীয় এককই পরিপূর্ণস্বরূপে, সমুদায় দেশকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তদতিরিক্ত অন্য দ্বিতীয় বস্তুর স্থান কোথায়? সুতরাং ভগবানে দেহ-দেহী ভেদ থাকিতেই পারে না; যদি ভেদ থাকিত, তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা উপস্থিত হইত; তিনি অবতার হউন, বা সমুদায় অবতারের আধারস্বরূপ অবতারী হউন, তাঁহার স্বরূপ-বিচ্যুতি কোনও কালে নাই। অবতারের দেহ, বাল্য, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতির প্রতীতি তাঁহার সংকল্পবশতঃই হইয়া থাকে এই সংকল্পই তাঁহার মায়া, ভাগবত ইহাকে "যোগমায়া" বলিয়াছেন। অবতার মূর্ত্তিতে ভগবান মনুষ্যরূপে প্রতিভাত হইলে, অজ্ঞান লোক তাঁহাকে সাধারণ মানুষ মনে করে, কিন্তু তখনও তিনি তাঁহার পরম ভাবে বর্ত্তমান। ভগবান গীতায় ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীঃ ৯।১১

—মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূতমহেশ্বর রূপ পরমভাব না জানিয়া, অবতার-রূপে মানবদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। গীঃ ৯।১১

অবতার তত্ত্ব বুঝিবার ইহাই রহস্য। তিনি আপনার পরমভাব নিজে জানাইয়া না দিলে অজ্ঞানান্ধ মানব তাহা বুঝিতে পারে না। একারণ শ্রীকৃষ্ণাবতারে বৃন্দাবনের রাসলীলা বহির্ম্মুখ জীবগণের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকটই উহা প্রকটিত হইয়াছিল। সুতরাং অবতার—সমকালে পূর্ণ হইলেও বহির্ম্মুখ মানবের নিকট তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রকটিত হয় না; জীবভাব মাত্র প্রকটিত হয় এবং তাঁহার কর্ম্ম জীবের কর্ম্ম হইতে উচ্চতর বলিয়া প্রতিভাত হয় না। এজন্য মানবাবতার মানবভাবেই কার্য্য করেন বলিয়া প্রতীত হয়।

অবতারে জীবভাব ও ব্রহ্মভাব বর্ত্তমান—এ কথার অর্থ কি? :—

উপরে অবতারের যে জীবভাব ও ব্রহ্মভাব বর্ত্তমান থাকার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে না, যে অবতারের দেহাদি আমাদের দেহাদির মত, অথবা

তাঁহার জন্ম-বৃদ্ধি প্রভৃতি আমাদের ন্যায়। উহারা ঐ প্রকার প্রতিভাত হইলেও, উহাদের সহিত সাধারণ জীবের তত্তৎ প্রকারের কিছুমাত্র ঐক্য নাই। অবতারে জীবভাব ও ব্রহ্মভাব বর্ত্তমান, বলায়, বুঝিতে হইবে, যে অবতার জীবের সহিত ব্রহ্মের সংযোগ সাধনের সেতু স্বরূপ। যেমন সেতু নদীর উভয় তীরকে ধারণ করিয়া পরস্পরের সংযোগ সাধন করে, সেইরূপ অবতার, জীব ও ব্রহ্ম উভয়কে ধারণ করিয়া উভয়ের সংযোগ বিধান করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে এবং উপাসনা তত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতিই সমুদায় সাধনের সিদ্ধি এবং বেদান্ত দর্শনের লক্ষ্য। ব্রহ্ম—বাক্য মনের অগোচর। নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্মের ত কথাই নাই। শক্তিও আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। শক্তির ক্রিয়াই আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম বা ভগবান শক্তি অঙ্গীকারে শক্তিমান হইয়া সবিশেষ, সগুণ, সশক্তিক হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং তাঁহার ধারণা সুসাধ্য নহে। তাঁহার ধারণা হীন অধিকারীর পক্ষেও সুসাধ্য করিবার জন্য, ব্রহ্ম, আত্মমায়া আশ্রয় করিয়া বা নিজের সংকল্প বশতঃ, আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন। তখন আমরা তাঁহাকে, আমাদেরই, আত্মীয়, সখা, পুত্র, কন্যা, স্বামী প্রভৃতি রূপে দেখিয়া, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে যত্নবান হই, তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখি এবং ক্রমশঃ নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হই।

অবতার পরিগ্রহণের উদ্দেশ্য :—

মূল গ্রন্থে ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে ব্রহ্ম আমাদের অন্তঃকরণের স্তরে অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্ররূপে প্রকটিত হন। শাস্ত্র বিধিনিষেধের বিবৃতি। উক্ত বিধি নিষেধ সমূহ শাস্ত্রে নিবদ্ধ থাকিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। উহাদের যথাযথ অনুষ্ঠান পুরুষার্থ লাভের উপায়। অনুষ্ঠান শিক্ষা সাপেক্ষ। উপদেষ্টা নিজে আচরণ করিয়া আদর্শরূপে দেখাইতে পারিলেই তবে মানব সহজে উহাদের অনুষ্ঠান করিতে পারে। যিনি শাস্ত্র কর্ত্তা, তিনিই যদি আদর্শ আচরণকারী হন তবে আচরণ সুষ্ঠু সম্পাদিত হয়, কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকে না। এজন্য ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া নিজের ব্যবহারে, দৈনিক আচরণে, শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া জীবের সমক্ষে আদর্শরূপে প্রকটিত হন। জীবের কল্যাণের জন্যই ভগবানের অবতার পরিগ্রহণ। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য—আত্মসংবেদন লাভ। (দেখ পৃষ্ঠা ৭৩)। আত্মসংবেদনের শেষ পরিণতি এবং সম্যক্ সার্থকথা স্বস্বরূপ জ্ঞানে, ইহাই মুক্তি, সংসার হইতে চির অব্যাহতি। ভগবান সূত্রকার ৪।৪।১ সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ভাগবতকারও এইজন্য বলিয়াছেন :—"মুক্তি হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"।

ভাগঃ ২।১০।৬।—স্বরূপ হইতে পৃথকভূত অন্যপ্রকার রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। কি প্রকার আচরণে সহজে স্বরূপ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহার উপদেশ দান, এবং নিজের আচরণে অনুষ্ঠান, অবতারের মুখ্য কর্ম্ম।

ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান গীতায় বলিলেন, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কালবিপ্লবে সংঘটিত হয়, তখনই আমি আপনি আপনাকে প্রকটিত করি, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে," গীঃ ৪।৮—ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। গীতার এই স্থানে "ধর্ম্ম" পদ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত পদ "ধৃ" ধাতুর কর্তৃবাচ্যে সিদ্ধ হয়। যাহা ধারণ করে, অর্থাৎ বিশ্বস্থ—দেব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি সকলকে নিজ নিজ স্থানে, স্ব স্ব অধিকারে ধারণ করে, পোষণ করে, বর্দ্ধন করে, কেহ কাহারও অবস্থানের, বৃদ্ধির অন্তরায় জনক হয় না, মর্য্যাদা হানির কারণ হয় না, তাহাই ধর্ম্ম। অন্য কথায়, যাহা স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচক্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে, বিশ্বের ছন্দের সহিত ছন্দ মিলাইয়া, বিশ্বচক্র পরিচালনের নিয়মাবলীর অনুকূলে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা ধর্ম্ম। আমাদের শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিশ্বছন্দের অনুকূলে ব্যবস্থিত, এ বিশ্বাস সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার তীব্র আক্রমণে এ বিশ্বাস সাময়িক আক্রান্ত হইলেও, ইহা এখনও দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এ বিশ্বাস, ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—আমাদের অবনতির কারণ, অথবা আমাদের অস্তিত্বের হেতু, সে বিচারের স্থান ইহা নহে। যাহা হউক, উক্ত বিশ্বাসের কারণ গীতায় উক্ত শ্লোকের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ, ধর্ম্ম পদ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বিশেষতঃ যজ্ঞ, বিশ্বসঙ্গীতের একতানতা বিধান করে—ইহা মৎকৃত গায়ত্রীরহস্য পুস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে—এখানে উক্ত আলোচনার অবতারণা করিয়া—প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই।

অবতার পরিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা :—

অতএব আমরা বুঝিলাম যে জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনের জন্য ভগবানের অবতার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে বিশ্ব যখন জীব-জাতের সহিত বীজ, ভাব, বা শক্তিরূপে প্রলয়ে ভগবানে তাদাত্ম্যভাবে লীন ছিল, তখন কি জীবের দুঃখ সুখ বা তদুত্থিত অকল্যাণ বর্ত্তমান ছিল? ইহার উত্তর এই যে, তখন সুখ দুঃখ বা অকল্যাণ তত্তদ্রূপে বর্ত্তমান থাকে না বটে, কিন্তু উহারা সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে; এবং কাল বিক্ষোভে বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তির ন্যায়, বৃক্ষ হইতে পুষ্পোদ্গমের ন্যায়, পুষ্প হইতে ফলাভিব্যক্তির ন্যায়, ঐ সকল বীজভূত সংস্কার হইতে সৃষ্টির পুনরভিব্যক্তি, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতির বিকাশ, সুখ দুঃখ ভোগ প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া

থাকে। সৃষ্টিতত্ত্বালোচনায় দোলকের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। এই প্রকার অনাদি কাল হইতে চলিতেছে, সুতরাং কবে প্রথম উক্ত বীজভূত সংস্কার উৎপন্ন হইল, সে প্রশ্নের অবকাশ নাই। জীবের স্বস্বরূপ জ্ঞানে উক্ত সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন সংসার চক্র হইতে সম্যক্ অব্যাহতি বা মুক্তি—তখনই জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। জীব, সম্মুখে জাজ্বল্যমান আদর্শ দর্শন করিয়া, এই কল্যাণ সহজে লাভ করিতে পারিবে বলিয়া ভগবানের অবতার গ্রহণ। ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ইহা প্রকাশ করিলেন :—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৩

—তুমি কৃষ্ণকে সমুদায় আত্মার আত্মা বলিয়া জানিও। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি মায়ায় দেহবানের ন্যায় প্রতিভাত হন। ভাগঃ ১০।১৪।৫৩

অন্যত্রও এই এক কথাই আছে :—

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১০।২৯।১৩

—হে রাজন্! ভগবান অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ এবং গুণনিয়ন্তা। তাঁহার দেহধারী হইয়া প্রকাশ, কেবল মানবদিগের নিঃশ্রেয়সার্থ অর্থাৎ আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য। ভাগ : ১০।২৯।১৩

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

ভাগঃ ১০॥৩৩।৩৬

—ভগবান যদিও আত্মারাম, আপ্তকাম, তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধানার্থ মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশী ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোক তৎপরায়ণ হয়। ভাগ : ১০।৩৩।৩৬

চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় অবতার তত্ত্বের মূলসূত্র বলিলেন :—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
সেরূপ রতন, ভক্তগণের প্রিয়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্য লীলা হৈতে॥

....

কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত ধার।

আর কত উদ্ধার করিব? প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে নিরস্ত হওয়াই ভাল।

ভাগবতে উল্লিখিত আছে, যে জগতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলে শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় ভালবাসিতেন এমন কি ব্রজগোপীগণ, তাঁহাকে নিজেদের সন্তানাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। ইহার কারণ আমরা উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।৫৩ শ্লোকে পাইতেছি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য—মৈত্রেয়ী সংবাদে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিলেন, যে পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, গৃহ, বিত্ত, পশু প্রভৃতি কাহারও ব্যক্তিগত বা বস্তুগত প্রিয়তা নাই, উহারা সকলেই আত্মার সম্পর্কে প্রিয়; কৃষ্ণ সেই আত্মার আত্মা, অতএব তিনি প্রিয়তম হইবেন না কেন? ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

প্রাণ বুদ্ধিমনঃ স্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো নু পরঃ প্রিয়ঃ।

ভাগঃ ১০।২৩।২১

—প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, দারা, অপত্য ধন প্রভৃতি যাহার সম্পর্কে প্রিয়, তাহা হইতে অধিক প্রিয় আর কে হইতে পারে? ভাগঃ ১০।২৩।২১

আত্মার সম্পর্কে সমুদায় প্রিয়, কৃষ্ণ অখিলস্থ আত্মাগণের আত্মা, (১০।১৪।৫৩) অতএব তিনি যে প্রিয়তম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি?

ভগবানে যে কোনও ভাব অর্পণ করিলে, তাহা নিঃশ্রেয়সের কারণ হয় :—

ভগবান মানবরূপে অবতার পরিগ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইলে, সকলে যে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, ভালবাসিবে, তাহার কারণ কি? আমরা কি আমাদের প্রতিবেশীগণের মধ্যে সকলকেই ভালবাসি, বা ভক্তি শ্রদ্ধা করি? ভগবান যখন মানবরূপে অবতীর্ণ, তখন তিনি মানবাতীত হইলেও, অন্য মানবগণ তাঁহাকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর ন্যায়, কেহ ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, কেহ ভালবাসিবে, কেহ উদাসীন থাকিবে, কেহ দ্বেষ হিংসা ইত্যাদি করিবে—ইহাত মানব স্বভাব। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার দ্বেষ্টা, হিংসক, শত্রু প্রভৃতির মহৎ অকল্যাণের কারণ উদ্ভূত হইতে পারে। শাস্ত্র বলেন, তাহা নহে, ভগবানে যে কোনও ভাব অর্পণ কর না কেন, তাহা অকল্যাণের কারণ হয় না, পরম পুরুষার্থের কারণ হয়। ভাগবত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ভাগঃ ১০।২৯।১৪

—যে কোনও প্রকারেই হউক, ভগবানে আসক্তি জন্মিলে, তাহা মুক্তির কারণ হয়; ভগবানের প্রতি নিত্য কাম, অথবা ক্রোধ, কিম্বা ভয়, অথবা স্নেহ, কিম্বা সম্বন্ধ অথবা ভক্তি বিধান করিয়া তন্ময়ত্ব (ভগবন্ময়ত্ব) প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগঃ ১০।২৯।১৪

এই তন্ময়ত্ব প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ লাভ। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিলাম, যে ভগবানের অবতার পরিগ্রহণ মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য।

অবতারের প্রকার ভেদ :—

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, তৎপ্রণীত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে ভগবানের অবতারগণের প্রকার ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবানের অবতার তিন প্রকার—(১) অংশাবতার (২) গুণাবতার (৩) শক্ত্যাবেশাবতার। তাঁহার উক্তি, তাঁহার ভাষাতেই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।
অংশ অবতার আর গুণ অবতার ॥
শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এ মত।
অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু ব্যাসমুনি ॥

অংশাবতার সম্বন্ধে আলোচনা উপরে করা হইয়াছে, উক্ত অবতারগণ সাক্ষাৎ ভগবানের মূর্ত্ত প্রকাশ এবং উঁহারা পূর্ণ। সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয় ভগবান হইতে পৃথক তত্ত্ব নহে। উহাদের ইতর বিশেষ সংমিশ্রণে সৃষ্টি, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহাতে সত্ব গুণের অত্যধিক প্রাধান্য, তিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণু, যাঁহাতে রজোগুণের সমধিক প্রাধান্য—তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, এবং যাঁহাতে তমোগুণের সমধিক প্রাধান্য—তিনি সংহার কর্ত্তা শিব। ভগবান উক্ত গুণ বিভাগানুসারে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বচক্র পরিচালনা করেন—এ কারণ এই তিন মূর্ত্তিকে গুণাবতার বলে। আমরা জানি, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ অপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি সমুদায় কারক ব্যাপার ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। উহাদের মধ্যে গুণাবতারগণ "কার্য্যব্রহ্ম" নামে পরিচিত—অর্থাৎ উহারা ব্রহ্মের প্রধান কর্ত্তৃমূর্ত্তি। বিশ্ব প্রপঞ্চ ব্রহ্মের কর্ম্মমূর্ত্তি। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার করণ মূর্ত্তি। সূর্য্য হইতে প্রাণ প্রবাহ অবিরাম ধারে প্রবাহিত, একারণ সূর্য্য প্রধান অপাদান মূর্ত্তি। আকাশে দৃশ্যতঃ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত—

একারণ আকাশ অধিকরণ মূর্ত্তি। গুণাবতারগণই বিশ্বের পরিচালক ও নিয়ন্তা বলিয়া, আমাদের দৈনিক কারবার তাঁহাদিগের সহিত, ইহা বলা বাহুল্য। বিষ্ণু পালন কর্ত্তা—বিশ্বের কল্যাণ সাধন তাঁহার কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয়ে, বিশ্বের কল্যাণের পথ অবরোধ প্রাপ্ত হইলে, তিনিই উক্ত পথ মুক্ত করিবার জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া দেহবানরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি ভগবানের পালনকারী কার্য্যমূর্ত্তি, সুতরাং তাঁহার গৃহীত অবতারই ভগবানের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শক্ত্যাবেশাবতার উক্ত উভয় বিধ অবতার হইতে পৃথক্। সংসারে যে সমুদায় অতি মানব মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত আমরা পুরাণেতিহাসাদিতে পাঠ করি— তাঁহারা সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত। জীবতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে ভগবান সমুদায় জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান। জীবের উপাধির বা আধারের নির্ম্মলতা বা মালিন্যের তারতম্যের উপর ভগবচ্ছক্তির প্রকাশের ইতর বিশেষ নির্ভর করে। আমি একজন রক্ত মাংস গঠিত শরীর বিশিষ্ট মানব, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ঐ প্রকার রক্ত মাংস গঠিত শরীর বিশিষ্ট একজন মানব ; কিন্তু উভয়ের প্রকাশের কত ইতর বিশেষ। অতি মলিন দর্পণ পরিবেষ্টিত দীপের ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আমার অন্তঃস্থিত ভগবচ্ছক্তি, উপাধির মলিনতায় আচ্ছাদিত, আত্মপ্রকাশে অসমর্থ। পরমহংসদেবের অন্তঃস্থিত এই একই ভগবচ্ছক্তি, উপাধির স্বচ্ছতায় জাজ্বল্যমান, প্রাণারাম স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত, অন্তর্বহিঃ উক্ত আলোকে আলোকিত, অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত, জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃতে জ্যোতিস্মান্। উপাধির স্বচ্ছতাসম্পাদনই সাধনার লক্ষ্য, ইহা উপাসনাতত্ত্ব আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে।

ভগবদ্ ভাবের সূক্ষ্ম স্পন্দন গ্রহণ করিতে হইলে, উপাধিকে উপযুক্তরূপ সূক্ষ্ম করা প্রয়োজন, অন্যথা উক্ত স্পন্দন প্রতিহত হইয়া, ফিরিয়া যাইয়া থাকে, সমজাতীয় স্পন্দন উৎপাদন করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রে, আহার, বিহার, কর্ম্ম, চিন্তা প্রভৃতি সংযমের উপদেশ, উপাধির সূক্ষ্মতা সম্পাদনের জন্য প্রদত্ত। পৃথু, বেদব্যাস, যিশু, নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ উপযুক্ত আধার বলিয়া, ঐ সকল আধারে ভগবচ্ছক্তির প্রকাশ অত্যধিক উজ্জ্বল, জগতের সমক্ষে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইঁহারা সকলে শক্ত্যাবেশাবতারের দৃষ্টান্ত। আবেশ সর্ব্ব সময়ে বর্ত্তমান থাকে না। প্রয়োজনানুসারে সাময়িক ভাবে উপযুক্ত আধার ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন, আবার কিছুক্ষণ পরে উক্ত আবেশ তিরোহিত হয়। শ্রীমচ্চৈতন্যদেবের, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনীতে আমরা ইহার নিদর্শন দেখিতে পাই। শক্ত্যাবেশাবতারগণের মধ্যে নানা স্তর বিদ্যমান। প্রকাশ কাহাতে অধিক এবং কাহাতে অল্প। এক কথায় সাধারণ মানবের অতিরিক্ত গুণ, শক্তি, ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন বিশেষ আধারে দেখা যাইলে, উক্ত

আধারে ভগবচ্ছক্তির অধিকতর প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফল কথা জগতে সর্ব্বত্রই ভগবদ্ বিভূতির নিদর্শন। ভগবান গীতায় ইহা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন :—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্। গীতা ১০।৪১

—যাহাকিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন অথবা প্রভাব-বলাদি গুণ দ্বারা শ্রেষ্ঠ, তৎ সমুদায়ই তুমি আমার প্রভাবের অংশ সম্ভূত জানিও। গীতা ১০।৪১

ইহাই শক্ত্যাবেশাবতারের মূলসূত্র, একারণ শাস্ত্রে কথিত আছে, যে অবতার অসংখ্য। এই কারণ ভাগবত বলিলেন :—

যৎ কিঞ্চলোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রী হ্রী বিভূত্যাত্মবদদ্ভূতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্॥
ভাগঃ ২।৬।৪৪

—এই জগতে ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজোযুক্ত, ইন্দ্রিয়শক্তিযুক্ত, মনঃশক্তিসম্পন্ন, দৃঢ়তাযুক্ত, ক্ষমাযুক্ত, শ্রী-হ্রীসম্পন্ন, সম্পত্তিশালী, বুদ্ধিমান্, আশ্চর্য্যবর্ণ বিশিষ্ট, রূপ সম্পন্ন ও অরূপ, সকলই সেই ভগবানের অবতার বা বিভূতি। ভাগঃ ২।৬।৪৪

বলা বাহুল্য ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোক গীতার ১০।৪১ শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র। উপাসনা তত্ত্ব আলোচনায় জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত জ্ঞানী, যখন জগতের কল্যাণের জন্য, নিজ ইচ্ছা বশতঃ, নিজ অসঙ্গ, উদাসীন জ্ঞানী ভাব পরিত্যাগ করিয়া উপাধি ধারণ করেন, তখন তিনি শ্রুতি কথিত "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২।৯) মন্ত্রাংশের মূর্ত্তিমান নিদর্শন স্বরূপ, ভগবদিচ্ছা পরিচালনার প্রণালী স্বরূপ হইয়া জগতের কল্যাণ বিধান করেন; প্রয়োজন হইলে স্থূল পঞ্চভূতাত্মক উপাধিতে অবতরণ পূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে আমাদিগের ন্যায় রক্ত মাংস গঠিত শরীর ধারণ করিয়া আমাদিগের দুঃখ সুখের অংশ গ্রহণ করতঃ বিচরণ করেন এবং নিজের উপদেশে, কর্ম্মে, অনুষ্ঠানে, আচরণে আদর্শ সংস্থাপন করতঃ জীবের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেন। এই সমুদায় ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত জ্ঞানীগণ, বিজ্ঞানীর পদবীতে অবতরণ করিয়া "ঋষি সঙ্ঘ" সংগঠিত করেন। পুরাণ ও মহাভারত প্রসিদ্ধ "নরনারায়ণ" ঋষিদ্বয় এই ঋষিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। নারদ উক্ত সঙ্ঘের একজন শ্রেষ্ঠ কার্য্য নির্ব্বাহক সদস্য। জগতের কল্যাণ বিধানই উক্ত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। জগতের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে, উক্ত ঋষিসঙ্ঘ হইতে জনৈক ঋষি ভূমণ্ডলে অবতরণ করিয়া জীবের কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে পরমহংসদেবের উক্তি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। যিশুর জন্ম

সময়ে বিশেষ জ্যোতিষ্মান্ তারার নির্দ্দেশে পরিচালিত প্রাচ্য পণ্ডিতগণের আগমন ও সদ্যজাত শিশুর দর্শন, ইহার প্রমাণরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে অংশাবতার ও গুণাবতার ঈশ্বর কোটির অন্তর্গত এবং শক্ত্যাবেশাবতার জীব কোটির অন্তর্ভুক্ত।

বেদে অবতার প্রসঙ্গ :—

কেহ কেহ মনে করেন, যে অবতার বাদ পৌরাণিকগণের কল্পনা প্রসূত, বেদে ইহার কোনও উল্লেখ এমন কি কোনও ইঙ্গিতও নাই। কিন্তু এ ধারণা প্রকৃত নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে, মাত্র দিক্‌দর্শনের জন্য কয়েকটি কথা বলিব। ঋগ্বেদের ১০।৭।৯০ সূক্ত পুরুষসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত পুরুষসূক্ত কথিত "সহস্রশীর্ষা" পুরুষই আদ্য অবতার—তিনি সমষ্টি বিশ্বের অধিষ্ঠাতা বিরাট্। শ্রীমদ্ ভাগবত ২।৬।৪১ শ্লোকে তাঁহাকে "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের ১।৫।২২।১৭ ঋকে বিষ্ণুর মহিমা বর্ণনায় শ্রুতি বলিতেছেন :—

> ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।
> সমূঢ়স্য পাংশুরে ॥

সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিতেছেন :—বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারধারীদং প্রতীয়মানং সর্ব্বং জগদুদ্দিশ্য বিচক্রমে"। ত্রিবিক্রমাবতারধারী (বামন) ভগবান বিষ্ণু এই প্রতীয়মান (পরিদৃশ্যমান) সমগ্র জগৎকে উদ্দেশ করিয়া বিশেষরূপে ক্রমণ (বিস্তার) করিয়াছিলেন।

সায়ণ স্পষ্টতঃ বামনাবতারের উল্লেখ করিলেন, দেখা গেল; কিন্তু বিষ্ণুপদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যিনি সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপীর সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া বিক্রমণ বা অবস্থান শ্রুতির লক্ষ্য হইতে পারে; একারণ উক্ত ঋকের অবতার বাদ প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সন্দেহ পোষণ করিবার অবকাশ থাকিয়া যায়।

কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী ১।৫।২২।১৯ ঋকে উক্ত সন্দেহের অবসর মাত্র নাই। ঋকটি এই :—

> বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
> ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ১৯

সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিতেছেন :—"হে ঋত্বিগাদয়! বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পালনাদীনি পশ্যত। যতো বৈ কর্ম্মভি র্ব্রতাগ্নিহোত্রাদীনি পস্পশে—

সর্ব্বো যজমানঃ স্পৃষ্টবান্ বিষ্ণোরনুগ্রহাদনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ তাদৃশো বিষ্ণুরিন্দ্রস্য যুজ্যো যোগ্যোঽনুকূলঃ সখা ভবতি।"

—হে ঋত্বিগাদি বন্ধুগণ! আপনারা (অমিততেজা) বিষ্ণুর কর্ম্মসমূহ দর্শন করুন। যাঁহা হইতে যে সকল কর্ম্ম দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি ব্রত সমূহ যজমানগণ স্পর্শ করিয়াছেন; অর্থাৎ যে বিষ্ণুর অনুগ্রহে তাঁহারা সেই কর্ম্ম সমূহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাদৃশ বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের অনুকূল সখা।

এখানে বিষ্ণুর বামন অবতার গ্রহণের সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার সহিত অগ্নিহোত্রাদি ব্রত সমূহের বিশেষ সম্বন্ধ কি হইবে? অথবা তিনি ইন্দ্রের অনুকূল সখা বা কিরূপে হইবেন? ঋগ্বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির স্তোত্র পাঠ করিলে তাঁহারা যে পরব্রহ্মের বিভূতির মূর্ত্ত বিকাশ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটি আছে :—

আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ।
তস্মিন্ প্রজাপতি র্ব্বায়ুর্ভূত্বাঽচরৎ।
স ইমামপশ্যত্তাং বরাহো ভূত্বাঽহরৎ। কৃষ্ণ যজুঃ ৭।১।৫

—বর্ত্তমানে গিরিনদী সমুদ্রাদিরূপে পরিদৃশ্যমান জগৎ পৃথিবীর উৎপত্তির পূর্ব্বে সলিল মাত্র ছিল। সেই সলিলে কেবল জল মাত্র ছিল, অন্য ভূত বা তাহাদের কার্য্য কিছুই ছিল না। তখন প্রজাপতি মূর্ত্ত শরীরের অবস্থান স্থান নাই দেখিয়া,—বায়ুরূপ ধারণ করিয়া সেই সলিলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াছিলেন এবং বিচরণ কালে সলিলে নিমগ্ন ভূমি দর্শন করিয়া বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, উক্ত ভূমি জলের উপরে আহরণ করিয়াছিলেন।

কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সায়ণ কৃত ভাষ্য উদ্ধার করিলাম না, উহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম। এক্ষণে বরাহ অবতারের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাইলাম।

শুক্লযজুর্ব্বেদে পুরুষসূক্তে ৩১ অধ্যায় ২১ কণ্ডিকায় শ্রী ও লক্ষ্মীদেবীদ্বয় আদিত্যের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। এ সমুদায় আলোচনা করিলে অবতারবাদের মূল যে শ্রুতিতে নিহিত, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ ভাগবত প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ ভাগবত সাহায্যে বেদান্তালোচনার হেতু নির্দ্দেশের প্রয়াস :—

মূলগ্রন্থে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত সাহায্যে বেদান্ত আলোচনা করিয়াছি। কেন করিয়াছি, তাহার কারণ নির্দ্দেশ প্রয়োজন মনে করি; এজন্য ভাগবত প্রসঙ্গের অবতারণা। শ্রুতি হইতে আমরা জানি, যে ব্রহ্ম সত্যাজ্ঞানানন্দ স্বরূপ বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। মূলগ্রন্থে ৪।৪।১ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে 'সৎ,' 'চিৎ' ও 'আনন্দ' পরস্পর পৃথক্ গুণ বা ধর্ম্ম নহে, এবং ভগবান উক্ত গুণ বা ধর্ম্মত্রয়ে গুণী বা ধর্ম্মী নহেন। উহারা তিনে এক, একে তিন, একেরই তিন ভাবে দর্শন। ভগবানে অনন্তশক্তি, অনন্তগুণ বর্ত্তমান, তাঁহাকে অনন্ত বিশেষণে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে তাঁহাকে বিশেষভাবে সচ্চিদানন্দ বলা হয় কেন, তাহার যুক্তি ও বিচার উক্ত সূত্রের আলোচনায় যথাশক্তি দেওয়া হইয়াছে। এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। এখানে উহার উল্লেখ করিবার কারণ এই যে শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি বেদান্তের ভাষ্যকারগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ভাষ্যে ব্রহ্মের 'চিৎ' ভাবের প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া বেদান্তের আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মের 'সৎ' ভাব আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। আমার নিজের সত্ত্বা, ব্রহ্মের 'সৎ' ভাবে সত্ত্বাবান। স্থাবর জঙ্গম যেখানে যত বস্তু আছে, সমুদায়ের থাকার মূলে ব্রহ্মের 'সৎ' ভাব। 'চিৎ' ও 'আনন্দ' ভাব স্থাবর জঙ্গম প্রত্যেক বস্তুতে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে; এ কারণ 'চিৎ' ও 'আনন্দ' ভাব শাস্ত্রে আলোচনার বিষয়। 'সৎ' ভাবের পৃথক্ ভাবে বিস্তৃত আলোচনা শাস্ত্র প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। উপরে কথিত শঙ্কর প্রমুখ ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মের 'আনন্দ' ভাব তাঁহাদের ভাষ্যে প্রকটিত করেন নাই। শ্রীমদ্ ভাগবত, ব্রহ্মের আনন্দ ভাব প্রাণারাম, অতুলনীয় চিত্রে চিত্রিত করিয়া লোক সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন।

জ্ঞান স্বরূপ যেমন নিজ আত্মস্থ স্বরূপভূত চিচ্ছক্তি বিকাশে নিজের জ্ঞাতৃত্ব প্রকটিত করিয়া সর্ব্বজ্ঞরূপে অভিব্যক্ত হন এবং জ্ঞানালোকে সর্ব্বভূত আলোকিত করেন, সেইরূপ আনন্দস্বরূপও নিজ আত্মস্থ স্বরূপভূত হ্লাদিনী বা সৌন্দর্য্যানুভাবিনী শক্তি বিকাশ করিয়া আনন্দের উপভোক্তারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন এবং নিজের আনন্দ কণায় জগতে আনন্দের বন্যা ছুটাইয়া দেন। জ্ঞানস্বরূপের যেরূপ জ্ঞাতৃত্বের ব্যভিচার হয় না, রস বা আনন্দস্বরূপও সেইরূপ নিত্যধামে রসকদম্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বরসের সিকরূপে প্রকটিত হন, এবং তাহাতে নিজে আনন্দ উপভোগ

করেন, ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আনন্দ প্রদান করেন। উপাসনা তত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, এই স্বরূপানন্দ হইতে অপৃথক্ ভজনানন্দ ভোগ করেন বলিয়া, তাঁহারা নির্ব্বাণমুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না, প্রত্যুত তাহা উপেক্ষা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিপাদ্য। ইহার মূলসূত্র তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দ বল্লীর ৭ মন্ত্র "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" "তিনি রসস্বরূপ। এই বিশ্ব সংসার সেই রস পাইয়া আনন্দ লাভ করে।" মূলে উক্ত শ্রুতিমন্ত্র থাকিলেও ভাগবতের সমুদায় প্রতিপাদ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত বেদান্তের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, উহা বেদপন্থীগণের গ্রাহ্য হইবে কেন? কোনও তত্ত্ব বেদবিরোধী হইলে, তাহা ভগবানের শ্রীমুখনির্গত হইলেও হিন্দুসমাজে গ্রহণীয় নহে। একারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীতাধর্ম্ম উপনিষদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই একই কারণে বুদ্ধদেব ভগবানের অবতার বলিয়া শাস্ত্রে স্বীকৃত ও পূজিত হইলেও তাঁহার ধর্ম্ম, ভারতবর্ষে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরিশেষে এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। সেই কারণেই শ্রীমদ্ ভাগবত, ভগবান বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের উপর আপন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অধিক কি ব্রহ্মসূত্রে যাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে আছে, শ্রীমদ্ ভাগবতে তাহাই পরিপুষ্ট, সংবর্দ্ধিত হইয়া, প্রাণারাম. হৃদয়োন্মাদনকারী, মধুরতম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট জনগণের আশ্রয় ও শান্তির স্থান হইয়াছে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি মানবের ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ করিতেছে, অমৃত প্লাবনে প্লাবিত করিতেছে। মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে শ্রীমদ্ ভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য, ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। যদি আমি অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দোষ নহে—আমার নিজের অক্ষমতা ও সাধন হীনতা, উহার জন্য দায়ী।

শ্রীমদ্ ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকার প্রণীত ভাষ্য :—

শ্রীমদ্ ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, ইহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যুগাবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন, যাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার মতদ্বৈধ নাই, তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, তাৎকালিক পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ শঙ্কর অনুগামী পূজ্যপাদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বেদান্ত বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে, চৈতন্যদেবের লোকাতীত শক্তি ও পাণ্ডিত্য দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে ভগবদ্ জ্ঞানে স্তবপূজা করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, উঁহারা উভয়েই পাণ্ডিত্যে, সূক্ষ্ম ও কূটতর্কে যে কোনও যুগে, যে কোনও দেশে গৌরব স্থল

ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত বিচারের উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় মহাপ্রভুর উক্তি পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছজ্ঞান।
ব্যাস সূত্রের গম্ভীরার্থ, ব্যাস ভগবান॥
তার সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃ শ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃ শ্লোক যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ॥

... ...

অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোকে উপনিষদ কহে একমত॥

... ...

ভাগবতের সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃ শ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥
আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম॥
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥

... ...

... ...

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্য স্বরূপ॥

... ...

... ...

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধনে প্রয়োজন॥

... ...

... ...

কৃষ্ণ ভক্তি রস স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ শাস্ত্র হইতে পরম মহত্ত্ব॥

....

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতি অর্থ সার॥

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২৫ অধ্যায়—

উপরে উদ্ধৃত অংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে শ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বুঝাইয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট করিয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারে উক্ত প্রকার স্পষ্ট উক্তি না থাকিলেও উক্ত বিচার পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে সেখানেও তিনি ভাগবতের ভিত্তিতে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখ হইতে বলাইয়াছেন :—

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
পরিণাম বাদ ব্যাসের সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥

... ...

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র হয়॥

... ...

ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল।
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল॥

সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥
ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয় ॥
চৈতন্য চরিতামৃত-মধ্য-৬ষ্ঠ অধ্যায়।

কবিরাজ গোস্বামী নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাঁহার কৃত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের রচনা শেষ হইল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন :—

শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

অর্থাৎ বৃন্দাবনে ১৫৩৭ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে প্রকট হইয়া ১৪৫৫ শকে তিরোহিত হন। তাঁহার তিরোধানের ৮২ বৎসর পরে গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। তখন গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী আপনাকে "বৃদ্ধ, জরাতুর, অন্ধ, বধির, নানারোগগ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরের অধিক। একারণ ইহা সহজেই অনুমেয়, যে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ পার্ষদগণের মধ্যে অনেককেই দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কথিত বিষয় হইতে তাঁহার গ্রন্থ রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন, অতএব, উহা যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

চৈতন্য মহাপ্রভূ ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন। তারপর ৬ বৎসর তিনি তীর্থ ভ্রমণ করেন। শেষ ১৮ বৎসর ৺ পুরীধামে অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহার ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বেদান্ত বিচার হইয়াছিল—অর্থাৎ চৈতন্য চরিতামৃত হইতে তাঁহার যে সমুদায় উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা তাঁহার ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে বা ১৪৩৭ শকাব্দের মধ্যে পুরী ও কাশীধামে কথিত হইয়াছিল। ১৪৩৭ শক—খৃষ্টাব্দের ১৫১৫ সাল। অতএব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে ভাগবত যে বেদান্তের সূত্রকার কৃত ভাষ্য, এবং উক্ত মত সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পাইলাম।

শ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভুর উপরে উদ্ধৃত উক্তির অনুকূলে শ্রীমজ্জীব গোস্বামী তাঁহার ভাগবতের ক্রম সন্দর্ভ টীকায় তত্ত্ববাদিধৃত গরুড় পুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, যে শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত মত, অতি প্রাচীনকাল হইতে পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত। গরুড় পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম এবং অন্যান্য মহাপুরাণের ন্যায় ব্যাসদেবের নামের সহিত ইহার রচনা অথবা সংকলন সংজড়িত। ব্যাসদেব

কুরুপাণ্ডবগণের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির পিতৃগণের বীজপ্রদ পিতা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তাঁহার জীবনকালে হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া ভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, কালে উহা "মহাভারত" আকার ধারণ করে। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের মতে উক্ত যুদ্ধ দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ব্যাসদেব কলির আরম্ভ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিই অষ্টাদশ মহাপুরাণকার। অতএব আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, যে গরুড় পুরাণ যখন তাঁহার কৃত, তখন উক্ত বচনানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত মত ব্যাসদেবের সময় হইতে অর্থাৎ কলির প্রাক্কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভাগবতও শ্রীমদ্ ব্যাসদেবের রচিত, ইহার আলোচনা পরে করা হইবে। অতএব বুঝা গেল যে ভাগবত রচনার সময় হইতে, উহা ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকার রচিত ভাষ্য এ বিশ্বাস আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত। নিম্নে গরুড় পুরাণের বচন উদ্ধৃত হইল।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধ যুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং" অংশটুকুই আমাদের অতীব প্রয়োজনীয়। ইহাতে শ্লোক রচয়িতা স্পষ্টই বলিলেন, যে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ ভাগবত নামধেয় মহাপুরাণ ব্রহ্মসূত্রের অর্থ স্বরূপ। শ্লোকটীতে আর একটি প্রণিধানযোগ্য বাক্যাংশ আছে "গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ" এই শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ গায়ত্রী ভাষ্যরূপ। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মৎস্য পুরাণের শ্লোকটিও ইহা প্রকাশ করে। উক্ত শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এই "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রী বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ"; যে ভাগবত পুরাণে গায়ত্রীকে অধিকার বা উপলক্ষ্য করিয়া "ধর্ম্ম বিস্তার" বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ ভাগবতের আরম্ভ গায়ত্রীতে, অন্তও গায়ত্রীতে, মধ্যেও গায়ত্রী এবং তৎপ্রতিপাদিত তত্ত্ব, কাব্যের ভাষায় মহাপুরাণের নানা উপাখ্যানের ভিতর দিয়া, অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা যাঁহারা ভাগবত আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইবে। গায়ত্রী যাহা, ব্রহ্মবিদ্যাও তাই। একারণ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের তৎকৃত টীকায় লিখিয়াছেন :—

"গায়ত্র্যা প্রারম্ভেন গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণম্"—গায়ত্রী দ্বারা আরম্ভন হেতু এই পুরাণ গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপ। ব্রহ্মসূত্রের লক্ষ্য ব্রহ্ম বিদ্যালাভ—উহারও আদি, মধ্য, অন্ত সর্ব্বত্রই ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্ম অনুস্যূত। শ্রীমদ্ ভাগবতেও তাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে মূল গ্রন্থে—ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিয়াছি। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করিবার প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মহামহোপাধ্যায়, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কৃত ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের টীকায়, উক্ত শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের কোন কোন সূত্রের অর্থ নিহিত, উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, উহা হইতে কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইবে, যে ভাগবতে কি গম্ভীরার্থ নিহিত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু কেন বলিয়াছেন, যে "ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ"। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন :—

"সত্যং পরং ধীমহি :—অনেন 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইতি সূত্রার্থো ফলতো বিবৃতঃ, ধ্যানস্যৈব জিজ্ঞাসায়া ফলত্বাৎ"—অর্থাৎ ধ্যান জিজ্ঞাসার ফল বলিয়া, ইহা দ্বারা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই ব্রহ্মসূত্রের ১।১।১ সূত্রের অর্থ ফলতঃ বিবৃত করা হইল।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—জন্মাদ্যস্য যতঃ (ব্রহ্ম সূত্র ১।১।২)

" 'অন্বয়াদিতরশ্চ'—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং উপাদান কারণং নিমিত্ত কারণঞ্চ…… ……… এবং জন্মাদ্যস্য যত ইতি তত্তু সমন্বয়াদিতি সূত্রদ্বয়মুক্তম্।" ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের "অন্বয়াদিতরতশ্চ" অংশ হইতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ প্রতিপাদিত হইল এবং ব্রহ্মসূত্রের ১।১।২ সূত্র ও "তত্তু সমন্বয়াৎ" ১।১।৪ সূত্রের অর্থ বিবৃত হইল।

" 'অর্থেষু অভিজ্ঞঃ'—অনেন 'ঈক্ষতে র্নাশব্দম্' ইতি সূত্রার্থো উক্তঃ" ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের "অর্থেষু অভিজ্ঞঃ" অংশ দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" ১।১।৫ সূত্রের অর্থ বিবৃত হইল।

" 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ'—এতেন 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' ইতি সূত্রার্থো বিবৃতঃ"—ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের "তেনে ব্রহ্ম ……সূরয়ঃ" অংশ ব্রহ্ম সূত্রের "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" ১।১।১৭ সূত্রের অর্থ প্রকাশ করে।

" 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং'—এতেন 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি' ইতি সূত্রার্থঃ সূচিতঃ।"—ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের "ধাম্না……কুহকং" অংশ হইতে ব্রহ্মসূত্রের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি" ২।১।১১ সূত্রের অর্থ সূচিত হয়।

ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের সহিত ব্রহ্মসূত্রের সূত্র সকলের যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহা বলি না। উপাখ্যান ভাগের অনেক শ্লোক ব্রহ্মসূত্রের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখে না, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে ১৮০০০ (আঠার হাজার) মোট শ্লোকের মধ্যে এমন কয়েক সহস্র শ্লোক আছে, যাহারা ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদিত তত্ত্বে জাজ্বল্যমান। ঐ কয়েক সহস্র শ্লোকের মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের সূত্রার্থ অনুসন্ধান যে বহু

সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাহার কথা কি? আমি মূল গ্রন্থে সে পথ অনুসরণ করি নাই। ব্রহ্মসূত্রের প্রতি সূত্র ভাগবতের সাহায্যে আলোচনা করিয়াছি এবং ভাগবতের যে শ্লোক বা, যে যে একাধিক শ্লোক সূত্রার্থ প্রকাশ করে, তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তবে মন্দর পর্ব্বত যেখানে তল পায় না, সেখানে একটি ক্ষুদ্র পরমাণুর শক্তি কতটুকু। তবে এইটুকু বলিতে পারি, যে আমি যে টুকু আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি, এবং শ্রীমদ্ ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে রচিত, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

শ্রীমদ্ ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম :—

অষ্টাদশ মহাপুরাণ বর্ত্তমানে প্রচলিত। উহাদের তিন প্রকার শ্রেণী বিভাগ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ৪৩ অধ্যায়ে কথিত আছে। সেই শ্রেণী বিভাগানুসারে উহাদিগের মধ্যে ছয়খানি সাত্ত্বিক মহাপুরাণ, ছয়খানি রাজসিক এবং ছয়খানি তামসিক মহাপুরাণ। উহাদের নাম ও শ্লোক সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল। পুরাণ সকলের মধ্যে উক্ত নাম সকলের এবং শ্লোক সংখ্যার সাধারণতঃ ঐক্য আছে। কেবল কোনও কোনও পুরাণে শৈব পুরাণের পরিবর্ত্তে বায়বীয় পুরাণের নাম আছে। যাহা হউক বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ ভাগবত অনুসারে নাম ও শ্লোক সংখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সাত্ত্বিক পুরাণ		রাজসিক পুরাণ		তামসিক পুরাণ	
নাম	শ্লোক সংখ্যা	নাম	শ্লোক সংখ্যা	নাম	শ্লোক সংখ্যা
পদ্ম	৫৫,০০০	ব্রহ্ম	১০,০০০	শিব	২৪,০০০
বিষ্ণু	২৩,০০০	মার্কণ্ডেয়	৯,০০০	অগ্নি	১৫,৪০০
শ্রীমদ্ ভাগবত	১৮,০০০	ভবিষ্য	১৪,৫০০	লিঙ্গ	১১,০০০
নারদীয়	২৫,০০০	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত	১৮,০০০	স্কন্দ	৮১,১০১
বরাহ	২৪,০০০	বামন	১০,০০০	কূর্ম্ম	১৭,০০০
গরুড়	১৯,০০০	ব্রহ্মাণ্ড	১২,০০০	মৎস্য	১৪,০০০
	১,৬৪,০০০		৭৩,৫০০		১,৬২,৫০১

মোট শ্লোক সংখ্যা ১,৬৪,০০০+৭৩,৫০০+১,৬২,৫০১=৪,০০,০০১। বিষ্ণু, মৎস্য, গরুড় প্রভৃতি পুরাণমতে মহাপুরাণ সকল পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত—(১) সর্গ (২) প্রতিসর্গ (৩) বংশ (৪) মন্বন্তর এবং (৫) বংশানুচরিত। শ্রীমদ্ ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মহাপুরাণের লক্ষণ দশটি বলেন যথা:—(১) সর্গ (২) বিসর্গ (৩) স্থান (৪) পোষণ (৫) উতি (৬) মন্বন্তর (৭) ঈশানুকথা (৮) নিরোধ (৯) মুক্তি ও

(১০) আশ্রয়। এচ, এচ, উইলসন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের ইংরাজী অনুবাদক। তিনি পুরাণবেত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁহার অনূদিত বিষ্ণুপুরাণের উপক্রমণিকায় বলেন, যে একমাত্র বিষ্ণুপুরাণেই উপরে লিখিত পঞ্চ লক্ষণ বিদ্যমান, অন্য পুরাণে উক্ত পঞ্চ লক্ষণ বিদ্যমান না থাকায়, সে পুরাণ সকল অর্ব্বাচীন কালে রচিত। কিন্তু তাঁহার এ অভিমত ভ্রান্তি প্রসূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাণ সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য—বেদ, উপনিষদ প্রভৃতিতে প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব, সাধারণ লোকের দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, উহা সাধারণের সুখবোধ্য করিবার জন্য, সরল ভাষায়, রুচিকর উপাখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়া, লোক সমাজে প্রচার করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তদন্তর্গত ভোগ্য বিষয় সকলের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া, অল্পবিস্তর বিরাগভাব উৎপাদন প্রয়োজনীয়। একারণ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত প্রভৃতির অবতারণা। ইহাতে উক্ত মুখ্য উদ্দেশ্য সুষ্ঠু সম্পাদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন আখ্যান, উপাখ্যান, কিম্বদন্তী, রীতি, নীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি যতকিছু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত, পঠিত, বর্ণিত, শ্রুত হইয়া উহাদের চিরস্মরণীয় করিয়া রাখারূপ অন্য মহান্ উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত পাঠে, জগৎ যে নিত্য পরিবর্ত্তন স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সমুদায় বস্তুই নশ্বর, কেহ নিত্য নহে, এই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া কোন নিত্য বস্তু আছে কিনা, তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জন্মায় এবং অনুসন্ধানে নিত্য বস্তু থাকা সিদ্ধ হইলে, তাহার প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট করে। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত প্রভৃতির সহিত মানব জ্ঞানের সমুদায় শিক্ষণীয় বিষয়ই জড়িত। একারণ পুরাণে ব্রত নিয়মাদির ব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির উল্লেখ, কাব্য-শিল্প-চিকিৎসা প্রভৃতির বর্ণনা, ভূম্যাদি সংস্থান, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রাদির নাম ও গতি, তিথি-মাস-অয়ন-বৎসর প্রভৃতির নির্দ্দেশ, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, দৃষ্ট হয়। একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে, উপরে লিখিত দশ লক্ষণ—পঞ্চ লক্ষণেরই অন্তর্গত। যে বিষয়গুলি পঞ্চলক্ষণের ভিতর গুপ্তভাবে ছিল, তাহারা দশ লক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে মাত্র। একারণ উইল্সন্ সাহেবের উক্ত অভিমতের কোনও যুক্তিযুক্ত হেতু নাই।

উপরে লিখিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ছাড়া অষ্টাদশ উপপুরাণ আছে। সে গুলিও ব্যাসদেবের নামের সহিত সংজড়িত। তাহাদেরও শ্লোকসংখ্যা কম নহে। এতদ্ভিন্ন ইতিহাস আখ্যায় আখ্যায়িত রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ বর্ত্তমান। এক মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ত ১,০০,০০০ একলক্ষ। সুতরাং পুরাণ ইতিহাস সাহিত্য যে কিরূপ বিশাল, তাহা বুঝা গেল। এরূপ বিশাল প্রাচীন সাহিত্য জগতের আর কোনও দেশে কোনও ভাষায় বর্ত্তমান নাই।

পুরাণের প্রাচীনত্ব :—

বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত এই, যে পুরাণ অর্ব্বাচীন কালে রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এই মত—পাশ্চাত্য, অধিকাংশ স্থলে পল্লবগ্রাহী, পণ্ডিতগণের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। নিজ নিজ স্বাধীনভাবে পরিচালিত অনুসন্ধান ও গবেষণার এবং তাহা হইতে লব্ধ সিদ্ধান্তের ফল নহে। পুরাণের প্রাচীনত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, প্রাচীনতায় ইহা বেদেরই সমকক্ষ। কয়েকটি প্রমাণ মাত্র উল্লেখ করিতেছে। অথর্ব্ব বেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণাং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ॥

অথর্ব্ববেদ ১১।৪।৩।৪।২৪

পুরাণ—ঋক, যজু ও সাম বেদের সহিত (প্রজাপতির) উচ্ছ্বাস হইতে জন্মিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে সপ্তম অধ্যায় নারদ-সনৎকুমারের সংবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখানে নারদ সনৎকুমারকে স্পষ্ট বলিলেন, যে তিনি ঋগ্বেদাদি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতির পাঠ সাঙ্গ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ২।৪।১০ মন্ত্রে ঋগাদি চারি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি পরম পুরুষের নিশ্বাস হইতে উদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ আছে। মূল গ্রন্থে ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ভাগবতের ৩।১২।১৯ হইতে ৩।১২।২৩ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যে ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি বেদের ন্যায় ইতিহাস, পুরাণ, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। মৎস্য পুরাণে স্পষ্ট কথিত আছে, যে সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে প্রথমে পুরাণ নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহার পর বেদ উৎপত্তি হইয়াছিল :—

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
নিত্যং শব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরম্॥ মৎস্য পুঃ ৩।৩
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিসৃতাঃ॥ মৎস্য পুঃ ৩।৪

মৎস্য পুরাণের মতে বেদেরও পূর্ব্বে পুরাণের উৎপত্তি, কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধারের প্রয়োজন নাই।

এই সকল প্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, যে পুরাকালে পুরাণের

শ্রেণী বিভাগ ছিল না। একমাত্র পুরাণ ছিল। উহার শতকোটি শ্লোক ছিল। মৎস্য পুরাণে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যথা :—

পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরম্॥ মৎস্য পুরাণ ৫৩।৪

শ্লোক সংখ্যা শতকোটি বলিবার হেতু এই যে, তৎকালে পুরাণের শ্লোক সংখ্যা গণনা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, অত্যধিক সংখ্যক বলিয়া এইরূপ বলা হইয়াছিল। গত দ্বাপরের শেষে, বর্ত্তমান কলির প্রাক্কালে, বিছিন্নভাবে অবস্থিত, লোকের মুখে মুখে অধিকাংশ প্রচলিত, অতিবিস্তর পুরাণ, বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া উহাদের শ্রেণীবিভাগ, ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্পাদিত হয় এবং উহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত হয়। ইহা সহজসাধ্য কার্য্য নহে—অতি গুরুতর। ইহার গুরুত্বের জন্য সম্ভবতঃ একটি পুরাণ পরিষৎ সংগঠিত হইয়াছিল এবং ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসদেব তাহার পরিচালক, অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ত্তমান কালে, যেমন Encyclopedia Brittanica, বিশ্বকোষ, বঙ্গীয় মহাকোষ সংকলনের জন্য অনেক লেখকের প্রয়োজন এবং সমুদায় লেখক যেমন একজন প্রধান সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও অধ্যক্ষতায় কার্য্য সম্পাদন করেন, এবং উক্ত প্রধান সম্পাদকের নামে উক্ত গ্রন্থ প্রথিত হয়, সে কালেও সেইরূপ হইয়াছিল। তবে সে কালে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের তুলনামূলক আলোচনা সুকর ছিল না, একবার লেখা হইয়া গেলে পর, পরিবর্ত্তন দুষ্কর ছিল, সে কারণ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে একই বিষয়ের বিভিন্ন উক্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। এবং একই পুরাণের কোনও কোনও অংশ অন্য পুরাণে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছিল॥

পুরাণালোচক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পুরাণগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব কল্পনা করিয়া পুরাণ প্রণয়নের কাল নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত চেষ্টা তাঁহাদের ভ্রান্তির পরিচায়ক। পুরাণ যে সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন বৈদিক ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবল। সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি তখন হয় নাই। বেদে যেমন, অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতির মাহাত্ম্য নির্দ্দেশক সূক্তে, প্রত্যেক দেবতাই পরমেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কথিত—প্রত্যেকেই পূর্ণ বলিয়া পরিচিত, কেহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। পূর্ণের বিভূতিও পূর্ণ। পুরাণে সেইরূপ একই তত্ত্ব, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছেন মাত্র। পরবর্ত্তী কালে সাম্প্রদায়িকগণ, উহার মূলে সম্প্রদায় গঠন করিয়া, উক্ত দেবতা সকল নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছেন, পরন্তু বেদে যেমন তেত্রিশ বা ততোধিক দেবতার প্রসঙ্গ থাকিলেও সমুদায়ের পরিণতি ও সমাধান এক অদ্বৈতে, পুরাণেও বহু দেবতার উল্লেখ থাকিলেও, সমুদায়ের পরিণতি ও সমাধান সেই এক অদ্বৈত-তত্ত্বে।

শ্রীমদ্ ভাগবতের রচয়িতা ও রচনাকাল নির্দ্দেশের প্রয়াস :—

উপরে গরুড় পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ভাগবত "সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ" বলিয়া উক্ত আছে। আমরা উপরে বলিয়াছি, যে ভগবান ব্রহ্মসূত্রকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই ভাগবতের রচয়িতা। বিষ্ণুপুরাণের ইংরাজী অনুবাদক উইল্‌সন্ সাহেব এতদ্দেশীয় বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণের মুখে মুখে প্রচলিত কিম্বদন্তীর মূলে মুগ্ধবোধকার বোপদেব, দেবগিরি রাজ হেমাদ্রির সন্তোষ বিধানের জন্য ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেকারণ উহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার এ মতের আলোচনা পরে করা যাইবে। যদি বেদব্যাস ভাগবতের রচয়িতা হন, তবে রচনা কালও সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশিত হইল। অন্যপক্ষে যদি ব্যাসদেব রচয়িতা না হন, তবে রচয়িতার নাম ও রচনা কাল নির্দ্দেশ উভয়ই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ নীচে উপস্থিত করিতেছি। প্রমাণগুলি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। (১) আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও (২) বহিঃ প্রমাণ। নিজ ভাগবত হইতে আমরা যে সমুদায় প্রমাণ পাই, সে গুলিকে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলি। আর ভাগবতের বাহিরে যে সকল প্রমাণ পাই, তাহারা বহিঃ প্রমাণ। এই বহিঃ প্রমাণ আবার দুইভাগে বিভাগ করা যায়; (ক) সমকালীন ও সমজাতীয় (খ) অসমকালীন ও বিজাতীয়। অন্যান্য মহাপুরাণ হইতে আমরা ভাগবত সম্বন্ধে যে সমুদায় প্রমাণ পাই, তাহারা সমকালীন ও সমজাতীয় প্রমাণ এবং পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যে সমুদায় প্রমাণ পাই, তাহাদিগকে অসমকালীন ও বিজাতীয় বলা যায়।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ :—

প্রথমতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে :—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥ ভাগঃ ১।৩।৪০
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরং।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥ ভাগঃ ১।৩।৪১
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতং।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ॥ ভাগঃ ১।৩।৪২

ইহা হইতে আমরা পাইলাম, যে ভগবান ব্যাসদেবই ভাগবতের রচয়িতা, তিনি সমুদায় বেদ ও ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার পুত্র শুকদেবকে উহা শিক্ষা করান। শুকদেব, গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট শ্রেষ্ঠ মুনিগণ পরিবেষ্টিত, মহারাজ পরীক্ষিৎকে উহা শুনাইয়াছিলেন।

ভাগবতের ১ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে কথিত আছে, যে ব্যাসদেব, ভারতাখ্যান ও পুরাণ প্রণয়ন করিবার পর চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহাকে বলেন, যে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমুদায়ে জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভগবানের স্বরূপ ও গুণ-কীর্ত্তনাদিরূপ প্রশস্ত কর্ম্ম তিনি করেন নাই, এজন্য চিত্ত প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। একারণ দেবর্ষি তাঁহাকে ভগবানের স্বরূপ ও গুণবর্ণনা করিয়া শাস্ত্র রচনা করিতে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ দিয়া দেবর্ষি গমন করিলে পর ব্যাসদেব সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে, শম্যাপ্রাস নামক নিজ আশ্রমে, নারদোপদিষ্ট শাস্ত্র প্রণয়নে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, ভগবানের প্রসাদ লাভের জন্য তাঁহার ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। ভক্তিযোগ সহায়ে তাঁহার মন সম্পূর্ণ নিশ্চল ও সর্ব্বকলুষ নির্ম্মুক্ত হইলে; তিনি পূর্ণ পুরুষ বাসুদেব ও তাঁহার সর্ব্বজন বিমোহিনী মায়া দর্শন করিলেন। সেই সময়ে সকল অনর্থের উপশম বিধায়ক ভগবানে ভক্তিযোগ ও তাঁহার সাক্ষাৎ নয়ন গোচর হইল। এই প্রকারে, ভগবানের, মায়ার ও ভক্তিযোগের সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া, তিনি ভাগবত নামধেয় সাত্বত সংহিতা প্রণয়ন করিলেন এবং তাহা নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন। দেখ ভাগবত ১।৭।২ -৩-৪-৫-৬-৭-৮।

উপরে ভাগবতের ১।৩।৪০-৪১-৪২ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, ইহা তাহারই পোষক। অতএব ভগবান বেদব্যাসই ভাগবতের রচয়িতা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালে পরীক্ষিতের জন্ম। তাঁহার ৩৬ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ এবং ৬০ বৎসর বয়সে তক্ষক দংশনে মৃত্যু ইহা আমরা পুরাণ পাঠে অবগত হই। সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৬০ বৎসর মধ্যে ভাগবত রচিত হইয়াছিল, ইহা আমরা পাইলাম।

যদি ভগবান বেদব্যাস ভাগবতের রচয়িতা, তবে গরুড় পুরাণে "সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ" বলা হইল কেন? ইহার উত্তর শ্রীমদ্ শ্রীধর স্বামী ভাগবতের ১।১।২ শ্লোকের "শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনি কৃতে" অংশের ব্যাখ্যায় প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অংশে 'মহামুনি' পদের অর্থ "নারায়ণ" বলিয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামীজীর ভাষায় বলি, "কর্ত্তৃতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণঃ তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে"—কর্ত্তাহিসাবেও শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন, মহামুনি নারায়ণ প্রথমে সংক্ষেপে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন:—"তেন (শ্রীভগবতা) প্রথমং চতুঃশ্লোকীরূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে"—শ্রীভগবান ব্রহ্মার নিকট সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা নারদকে উক্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ দেন (দেখ ভাগবত ২।৯।৩৪-৩৫-৩৬-৩৭), নারদ

উহা ব্যাসদেবকে শিক্ষা দেন। ভাগবতের মূলতত্ত্ব উক্ত চতুঃশ্লোকীতে বীজভাবে নিহিত বলিয়া, এবং ব্যাসদেব ভগবানকে ধ্যান করায়, তাঁহার হৃদয়ে ভাগবত তত্ত্ব ভগবানের প্রসাদে স্ফুরিত হওয়ায় ভাগবত "সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ" অথবা "মহামুনি (নারায়ণ) কৃত" বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভাগবত পাঠে আমরা অবগত হই যে কপিল দেবের পিতা কর্দ্দম ঋষির আশ্রম, সরস্বতী নদীতীরে (ভা ৩।২১।৫) বিন্দু সরোবর তীর্থে ছিল (ভা ৩। ২১।৩১)। কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে সাঙ্খ্য জ্ঞান উপদেশ দিয়া উক্ত আশ্রম হইতে উত্তর দিকে সমুদ্রতীরে গিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতঃ তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন—(ভা ৩।৩৩।৩০)। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে প্রদত্ত জড় ভরতের উপাখ্যান হইতে আমরা অবগত হই যে সিন্ধু সৌবীর দেশের রাজা রহুগণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া কপিলাশ্রমে গমন কালীন ইক্ষুমতী নদীতীরে একজন বাহকের প্রয়োজন হওয়ায় জড় ও উন্মত্তবৎ, মলদিগ্ধাঙ্গ ব্রাহ্মণ পুত্র জড় ভরতকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন (ভা ৫।১০।১)। তৎকালে উক্ত ইক্ষুমতী নদীতীরে আঙ্গিরস গোত্রজাত ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল, উহাদের মধ্যে জড় ভরতের পিতা একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন (ভা ৫।৯।১)। ইক্ষুমতী নদী ভাগবতে ৫।১৭।৮ শ্লোকে কথিত "বংক্ষু" নদীর সহিত অভিন্ন। এই নদী মাল্যবান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া কেতুমাল বর্ষের মধ্য দিয়া পশ্চিম সমুদ্রে পড়িয়াছে (ভা ৫।১৭।৮)। বর্ত্তমানে হিন্দুকুশ নামে পরিচিত পর্ব্বত উক্ত মাল্যবান পর্ব্বতের অংশ। কেতুমাল বর্ষ—তুর্কিস্থান, মধ্য রাশিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি দেশ লইয়া গঠিত। এবং ইক্ষুমতী বা বংক্ষুনদী বর্ত্তমান অক্ষু বা অক্সস্ নদী। "বংক্ষু" এর 'ব' অন্তঃস্থ 'ব' সুতরাং উহার উচ্চারণ 'উঅ'—সুতরাং বংক্ষু=উঅংক্ষু=ইক্ষু=অক্ষু=অক্সস্ (Oxus) ইহা সহজেই বুঝা যায়। সিন্ধু সৌবীর দেশ সিন্ধু নদের মোহানার দিকে উভয় তীরে অবস্থিত ছিল।

চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বিবরণী সি-য়ু-কী নামে খ্যাত। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, যখন হর্ষবর্দ্ধন মগধের রাজা, তখন ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। তাঁহার উক্ত ভ্রমণ বিবরণীতে বক্ষু নদীর উল্লেখ আছে, স্যামুয়েল বিল সাহেব উক্ত সি-য়ু-কী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। চ্যাং ইউএ (**Chang Yueh**) নামক একজন চীন দেশীয় পণ্ডিত ৭১৩ হইতে ৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীন দেশে রাজমন্ত্রী ছিলেন। তিনি উক্ত সি-য়ু-কী পুস্তকের উপক্রমণিকা লিখেন। বক্ষু নদী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :— **In the middle of Jumbudwipa there is a lake called—Anavatapta to the south of the Fragrant Mountains and to the north of the great snowy Mountains·········from the western side of the lake·········proceeds the river Vakshu, encircling the**

lake once, it falls into the North Western Sea' অর্থাৎ হিমাচলের উত্তরে গন্ধমাদন পর্ব্বতের দক্ষিণে, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে "অনভাতপ্ত" নামে একটি হ্রদ আছে, উক্ত হ্রদের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে বক্ষু নদী নির্গত হইয়া, উত্তর পশ্চিম সমুদ্রে পড়িয়াছে। বিল সাহেব উক্ত বক্ষু নদী অক্সস্ (Oxus) নদীর সহিত অভিন্ন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এম রলিন নামক একজন ফরাসী দেশীয় গ্রন্থকার প্রাচীন ইতিহাস নামে একখানি পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উক্ত পুস্তক ইংরাজিতে অনূদিত হইয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তক ৮ খণ্ডে বিভক্ত। উহার পঞ্চম খণ্ডে গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডন প্রদেশের রাজা আলেকজাণ্ডারের অভিযান নির্দ্দেশক একখানি প্রাচীন ম্যাপ আছে। উক্ত ম্যাপে অক্সস্ (Oxus) নদী হিন্দুকুশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম মুখে গমন করিয়া কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইয়াছে, চিত্রিত আছে। বর্ত্তমান কালের প্রকাশিত ম্যাপে উক্ত নদী আরাল হ্রদে পতিত হইয়াছে, দেখা যায়। কাল বিপ্লবে ভাগিরথী নদীর ন্যায় উক্ত নদীর মুখের কতক অংশ মজিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন সাং এর আগমনের সময়ে উক্ত নদীর উভয় তীরস্থ প্রদেশ সকলে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত ছিল. ইহা উক্ত সি-যু-কী পাঠে অবগত হওয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা যে সমস্ত তত্ত্ব পাইলাম তাহা হইতে সিদ্ধান্ত স্বতঃ আসিয়া পড়ে, যে ব্যাসদেবের আশ্রম সরস্বতী তীরে ছিল। সরস্বতী তখন প্রবহমানা নদী ছিল। কপিল মুনির আশ্রম, রাজা রহুগণের গমন সময়ে, হয় কাস্পিয়ান সাগরের তীরে, বা আরাল হ্রদের তীরে অথবা উত্তর মহাসাগরের তীরে ছিল। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে থাকাই অধিক সম্ভব। উক্ত নাম অদ্যাবধি কশ্যপ ঋষির স্মৃতি বহন করিতেছে। সরস্বতী নদী হইতে উক্ত আশ্রম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ হিন্দু বা ব্রাহ্মণ প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। অন্যথা ইক্ষুমতী নদীতীরে ব্রাহ্মণ পুত্র জড় ভরতের দর্শন লাভ কিরূপে হইবে? কপিল মুনির আশ্রম পরে হয়ত গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ভাগবতে উল্লিখিত উক্ত বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়, যে ভাগবত এমন এক সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন উক্ত দেশ সমূহে ব্রাহ্মণ প্রভাব অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল এবং রচয়িতা ইহা প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধ প্রভাব উক্ত দেশ সকলে প্রবেশ করে নাই। হিউয়েট সাহেব রচিত Primitive Traditional History নামক একখানি পুস্তক আছে, উহার সহিত সংগ্রথিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ম্যাপে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস রচিত Rigvedic India পুস্তকে প্রদত্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ম্যাপে সরস্বতী নদী পশ্চিম বাহিনী ও সিন্ধু নদীর উপনদীরূপে চিহ্নিত আছে। উহার অবস্থান সিন্ধুর উপনদী শতদ্রুর দক্ষিণে ছিল। এখন আর সে নদীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই।

ব্যাসদেবের আশ্রম উহার তীরে ছিল, ইহা ব্যাসদেবের এবং সে কারণে ভাগবতের অতি প্রাচীনত্বের প্রমাণ।

সিন্ধু সৌবীর দেশ হইতে কাস্পিয়ান সাগরের তীর পর্য্যন্ত এবং তাহারও উত্তর পশ্চিম বিস্তীর্ণ প্রদেশে ব্রাহ্মণ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তাহার অপর একটী প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। উপরে রলিন সাহেবের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে প্রদত্ত যে ম্যাপের কথা বলিয়াছি, তাহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত ম্যাপের ৬০° হইতে ৬৮° দ্রাঘিমা ও ৩৮° হইতে ৪২° অক্ষাংশের মধ্যে মার্কণ্ড নামে একটি প্রদেশ অবস্থিত দেখিতে পাই। উহার 'মার্কণ্ড' নাম অহৈতুক এবং কাকতালীয়ের ন্যায় মার্কণ্ডেয় ঋষির নামের সহিত আকস্মিক ঐক্যভাব প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। পুরাণ বর্ণিত মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম উক্ত দেশে ছিল বলিয়া মনে হয়। ভাগবত ১২।৮।১৪ শ্লোকে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। শ্লোকটি এই :—

তে বৈ তদাশ্রমং জগ্মুর্হিমাদ্রেঃ পার্শ্ব উত্তরে।
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা প্রভো॥ ১২।৮।১৪

—তাহারা হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বিচিত্র শিলা নির্ম্মিত মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে গমন করিল।

উপরে কথিত ম্যাপে প্রদর্শিত মার্কণ্ড প্রদেশের মধ্য দিয়া অক্সাস্ নদীর উপনদী পলিটাইমিটাস (Polytimeetus) প্রবাহিত। কে বলিবে, যে উহা পুষ্পভদ্রা নদীর গ্রীক সংস্করণ নহে? সমরকন্দ ও বোখারা নগরদ্বয় উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত। মনে হয় সমরকন্দেই মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম ছিল এবং উক্ত নাম এখনও ঋষির স্মৃতি বহন করিতেছে। বোখারা শব্দ সংস্কৃত পুষ্কর অপভ্রংশ—পুষ্কর=পোখরা=বোখারা—ইহা সহজেই বুঝা যায়। খিবা নাম যে সংস্কৃত ক্ষীব—(মদ্যপ বা মত্ত) শব্দ হইতে উৎপন্ন নয় ও তত্রস্থ অধিবাসীগণের মদ্যপানাসক্তি নিবন্ধন যে উক্ত নাম প্রদত্ত হয় নাই, তাহা কে বলিবে? হুয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে খোটানে ভারতীয় ভাষা বর্ত্তমান ছিল, দেখিয়াছিলেন। উক্ত খোটান নাম সংস্কৃতে 'গোস্থান' নামের অপভ্রংশ, অনেকে বলেন। গোষ্ঠ=গোস্থান=গোঠান=খোটান ইহা সহজে বুঝা যায়। ষ্টীন সাহেব খোটানে ও গোবী মরুভূমির নানাস্থানে খনন কার্য্য করিয়া যে সমুদায় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে ২,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। পুরাণ ইতিহাস কথিত হরি পর্ব্বত যখন 'তক্ত—ই—সুলেমান' নাম ধারণ করিয়াছে, তখন বর্ত্তমান নাম হইতে প্রাচীন নাম আবিষ্কার করা সহজ সাধ্য নহে। বাল্খ (Bactria) যে সংস্কৃত বাহ্লীক নামের অপভ্রংশ তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত দেশ মার্কণ্ড প্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত।

উপরে কথিত বংক্ষু নদী ছাড়া ভাগবতে আরও তিনটি প্রধান নদীর নাম কথিত আছে :—অলকানন্দা, সীতা ও ভদ্রা (ভা ৫।১৭।৬)। ইহাদের মধ্যে অলকানন্দা—ভারতবর্ষে প্রবাহিত গঙ্গার অপর নাম—তাহাতে সন্দেহ নাই। সীতা—গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ভদ্রাশ্ব বর্ষের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে পড়িয়াছে। ভদ্রাশ্ব বর্ষ চীন দেশ প্রভৃতি এবং সীতা নদী উক্ত দেশে প্রবাহিত ইয়াংসিকিয়াং নদী। চীন দেশের সহিত ভারতের সংযোগ বহু প্রাচীন কাল হইতে ছিল এবং এতদ্দেশে অনেক প্রকার কোষেয় বস্ত্র বর্ত্তমান থাকিলেও সূক্ষ্ম চীনাংশুক ভারতীয় ধনীগণের বিলাসের উপকরণ ছিল। উপরে উল্লিখিত চ্যাং ইউয়ে লিখিত সি—যু—কী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় সীতা নদী সম্বন্ধে লিখিত আছে :—From the north side of the lake, proceeds the river Sita, encircling the lake once, it falls into the north eastern sea" এই বর্ণনার সহিত ভাগবতে বর্ণিত ভদ্রা নদীর মিল আছে। সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদে শ্রীমদ্ ভাগবতে ভদ্রার স্থানে সীতা এবং সীতার স্থানে ভদ্রা লেখা হইয়াছে। কারণ ভদ্রাশ্ব বর্ষের সহিত ভদ্রা নাম সংজড়িত। সীতা নদী বর্ত্তমান সীর দরিয়া বা জ্যাক্জারটিস নদীর সহিত অভিন্ন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ভদ্রা নদী উত্তর মুখে উত্তর কুরুর ভিতর দিয়া উত্তর সমুদ্রে পতিত বলিয়া ভাগবতে কথিত আছে (ভা ৫।১৭।৯)—ইহা উপরে ইংরাজীতে লিখিত সীতা নদীর বর্ণনার সহিত মিলে। বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গল পদ্ধতি এবং 'সীর' শব্দের অর্থও লাঙ্গল। দরিয়া জলাশয়ের সাধারণ নাম, ইহা আমরা জানি। সুতরাং সীতা নদী যা সীর দরিয়াও তাই। একারণ মনে হয় যে লিপিকর প্রমাদে ভাগবতে উক্ত উভয় নামের বিনিময় সংঘটিত হইয়াছে। যাহা হউক এই সকল বিষয় হইতে ইহা সুস্পষ্ট, যে প্রাচীন কালে, চীন দেশে, তুর্কিস্থানে, মধ্য আসিয়া, রাসিয়া, ইউরোপে ভারতীয়গণের গতিবিধি ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

রলিন সাহেব প্রদত্ত পূর্ব্ব কথিত ম্যাপে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত ম্যাপে কাস্পিয়ান এবং কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে, উভয়ের সংযোজক একটি প্রদেশের নাম শার্ম্মেশিয়া (Sarmatia Asiatica)। এতদ্ভিন্ন ইউরোপে হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, যুগোস্লেভিকা, জার্ম্মানীর কিয়দংশ প্রভৃতি লইয়া ইউরোপীয় সার্ম্মেশিয়া বর্ত্তমান ছিল। ইহা উক্ত ম্যাপে প্রদর্শিত হয় নাই। Encyclopedia Brittanica ৯ম সংস্করণ হইতে আমরা অবগত হই যে হিরোডোটাসের সময় (হিরোডোটাসের জন্ম খৃঃ পূঃ ৪৮৪) অর্থাৎ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ডন নদী ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যে সরোমাটী (Sauromatoe) গণ বাস করিতেন। হিরোডেটাসের কথিত সরোমাটী (Saromatoe) পদের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ লইয়া নানাপ্রকার মত বিভেদ উপস্থিত হইয়াছে। মনে হয় উহা সংস্কৃত "শর্ম্মণ্বতী" পদের গ্রীক সংস্করণ।

"শর্ম্মণ" শব্দের উপর "বতুপ্" প্রত্যয় করিয়া, তাহার স্ত্রীলিঙ্গে "শর্ম্মণ্বতী" পদ সিদ্ধ হয়। বর্ত্তমান "চর্ম্মণ্বতী" পদ এই "শর্ম্মণ্বতী" পদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। সরস্বতী, দৃষদ্বতী প্রভৃতি পদ শর্ম্মণ্বতীর ন্যায় এক প্রকারেই সিদ্ধ হইয়াছে। আধুনিক কালে বর্ত্তমান "সবরমতী" নদী (উচ্চারণ "সওরমতী" কেননা "সবরমতী" পদের 'ব' কার অন্তঃস্থ বকার উহার উচ্চারণ "উঅ" এর মত) গুজরাটে অবস্থিত, আমরা জানি। উক্ত নদীতীর বাসীগণ পুরাকালে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইক্ষুমতী (Oxus) এবং সীতা (Sirdarya) নদীর মধ্যস্থ ও উভয় পার্শ্বস্থ ভূভাগ অধিকার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরে "শার্ম্মেশিয়ান" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, যে শার্ম্মেশিয়ানগণ ইরাণীয় জাতির শাখা। এবং উহাদের ভাষা ও ধর্ম্ম—আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ও ইরাণীয় উভয়ে পৃথক্ জাতি নহে। উভয়ে একই আর্য্যজাতির বংশধর। উভয়ে পুরাকালে এক সঙ্গে পঞ্চনদ দেশে বাস করিতেন। কাল বিপ্লবে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায়, উভয়ের মধ্যে বৈরভাব, বিবাদ, এবং ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয় এবং পরিণামে ইরাণীয়গণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া ইরাণ অধিত্যকায় উপনিবেশ সংস্থাপন করেন এবং তখন হইতে "ইরাণীয়" জাতির নামানুসারে উক্ত দেশের নাম "ইরাণ" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়। ফলতঃ ইরাণ শব্দ আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। ইহা হইতে ইংরাজী "এরিয়ান" (Aryan) পদের উৎপত্তি।

৩৩২-৩৩৭ খৃষ্টাব্দের রোমীয় ইতিহাসে আমরা পরিচয় পাই যে তিন লক্ষ শার্ম্মেশিয়ানদিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য রোম সম্রাট কর্ত্তৃক প্যানোনিয়া, থ্রেস, ম্যাসিডোনিয়া এবং ইটালীর উপযুক্ত অংশ দেওয়া হইয়াছিল (দেখ Historians' History of the World Vol. VI. Page 465. and Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. I Chapter XVIII.)। শার্ম্মেশিয়ানগণ সাইথিয়ান বলিয়া পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন। Encyclopedia Brittanica Vol. 21, 9th Edition Page 576 হইতে আমরা পাই, যে সাইথিয়ান ও শার্ম্মেশিয়ানগণের ভাষা সমপ্রকার এবং তাহারা আর্য্যবংশেরই শাখা; অক্সাস্ ও সির দরিয়া হইতে হাঙ্গেরী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ উহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। অতএব শার্ম্মেশিয়া দেশের নাম ব্রাহ্মণগণের সাধারণ উপাধি "শর্ম্মণ" হইতে উৎপন্ন, এ অনুমান সহজেই মনে উদয় হয়। ব্রাহ্মণগণ অনাচারী হওয়ায় স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হওন হেতু তাঁহারা উক্ত দেশ সকলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন একারণ উক্ত নাম। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনে করেন, যে প্রাচীন জার্ম্মান জাতিরও জার্ম্মান প্রদেশের নাম উক্ত সংস্কৃত "শর্ম্মণ" শব্দেরই অপভ্রংশ। এই সমুদায় আলোচনা হইতে স্পষ্ট ধারণা হয়, যে সুদূর অতীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে—উক্ত সমুদায়

দেশে ব্রাহ্মণ প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। ভাগবত রচয়িতা তাহাই স্মৃতি পথে আনিয়া উপরে নির্দ্দেশিত ভাগবতের শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নহি। প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান আমার উদ্দেশ্য নহে, এবং তাহার স্থানও ইহা নহে। আমাদের শাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে হৃদয়ে যে ধারণা হয়, তাহা উল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

তৃতীয়তঃ, শ্রীমদ্ ভাগবত আলোচনায় আর একটি প্রধান ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, যে ভাগবত এমন সময় রচিত হইয়াছিল, যখন বেদের অপৌরুষেয়তা ও স্বতঃ প্রামাণ্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রে যেমন ভগবান সূত্রকার সমুদায় উপনিষদের আপাত দৃষ্ট বিরোধের সমাধান করিয়া, ব্রহ্মে তাহাদিগের সমন্বয় প্রতিপাদন করিয়াছেন, ভাগবতেও ভাগবতকার বেদের কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সমুদায় ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে এবং সমুদায়ের পর্য্যবসান ব্রহ্মে, ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মতত্ত্বে ১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২১।৪১ ও ১১।২৮।২০ শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রের ও ভাগবতের উদ্দেশ্য অভিন্ন। ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকার রচিত ভাষ্য বলিয়া এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

চতুর্থতঃ, গীতা ও ভাগবত তুলনা করিলে বুঝা যায়, যে উভয়ের উদ্দেশ্য এক। ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলে পৃথক্ পুস্তক লিখিতে হয়। অতি সংক্ষেপে আমার কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। গীতার ১৭শ অধ্যায়ের সহিত ভাগবতের ১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ের তুলনা করিতে বলি। উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ঐক্য বিদ্যমান। গীতায় ২।৬২ ও ২।৬৩ শ্লোকের সহিত ভাগবতের ১১।২১।১৯-২০-২১ শ্লোকত্রয়ের তুলনা করিলেও উভয়ের ঐক্য বুঝা যাইবে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বেদের কর্ম্মকাণ্ডসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের নিন্দা করিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" ২।৪৫

ভাগবতও বলিলেন :—

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে॥ ভাগঃ ১১।২১।২৭

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ॥ ভাগঃ ১১।২১।২৮

—যাহারা কামী, কৃপণ, লুব্ধ এবং অগ্নিসাধ্য কর্ম্মে বিবেক শূন্য ও আসক্ত হইয়া অবান্তরফলে পরমফল বোধ করত, কর্ম্মানুষ্ঠানে ধূমমার্গে প্রবৃত্ত হয় তাহারা স্বীয় প্রাপ্য লোক অবগত নহে। এই জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন

ও আমা ব্যতিরিক্ত নহে এবং আমি সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান, কিন্তু কামাভিলাষী ও প্রাণতর্পণপর লোকেরা নীহারাবৃত চক্ষুঃশালী ব্যক্তির ন্যায় আমাকে দেখিতে পায় না। ভাগঃ ১১।২১।২৭-২৮

ইহাতে কি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করা হইল? তাহা নহে। কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু যাঁহারা উক্ত প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হইয়া, উহাই এক মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, বলেন, গীতা ও ভাগবত তাঁহাদেরই নিন্দা করিয়াছেন। ভাগবত ইহার পূর্ব্বেই বলিতেছেন;

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥ ভাগঃ ১১।২১।২৬

—কর্ম্ম মীমাংসকেরা বেদের মন্ত্র মাত্রেরই কর্ম্মপরত্ব এবং তদ্‌ফলপরত্ব বলিয়া থাকেন, কিন্তু কুবুদ্ধিলোক বেদের অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া অবান্তর ফলরোচনার্থ বেদে মন্ত্রোক্ত ফলশ্রুতিকেই পরম বলিয়া বলেন, কিন্তু বেদজ্ঞ ঋষিগণ তাহা বলেন না। ভাগঃ ১১।২১।২৬

গীতায় ও ভাগবতে—বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, যে উহারা বুদ্ধদেবের জন্মের পর, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পরে, রচিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম কোন বিভিন্ন নূতন ধর্ম্ম নহে। হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে, যে চিন্তা ও ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই পরিণতি ও ফল একদিকে যেমন পরম্পরাক্রমে বুদ্ধগণ ও তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম। অন্যদিকে ঋষভদেব, অরিষ্টনেমি, পার্শ্বনাথ ও বর্দ্ধমান (মহাবীর) প্রভৃতি তীর্থঙ্করগণ এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ও সংস্কৃত জৈনধর্ম্ম এবং তৃতীয় দিকে ভাগবত ধর্ম্ম। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর কেবল একমাত্র বুদ্ধ বা তীর্থঙ্কর নহেন; উঁহাদের পূর্ব্বে বহু বহু বুদ্ধ ও তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, ঐতিহাসিক কালে আবির্ভূত গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর যথাক্রমে পঞ্চবিংশতিতম ও চতুর্ব্বিংশতিতম বুদ্ধ ও তীর্থঙ্কর ছিলেন। গৌতম বুদ্ধদেব ও বর্দ্ধমান (মহাবীর) খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতকে বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উন্নতি ও সংস্কার সাধন করেন। জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ খৃঃ পূঃ ৯ম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি জৈনধর্ম্মে যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা বর্দ্ধমান (মহাবীরের) সময়ে বর্ত্তমান ছিল এবং শেষোক্ত তীর্থঙ্কর উহার উপরই সামান্য সংস্কার সম্পাদন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম—নূতন ধর্ম্ম নহে। উভয়ই উপনিষদের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে উক্ত উভয় ধর্ম্মে আত্মা, পরমাত্মা বা ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই। উভয়েই প্রধানতঃ বেদোক্ত

নিবৃত্তিমার্গীয় ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের উপর সংস্থাপিত। বুদ্ধদেব, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে গৃহস্থ উপাসকেরও স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সকল নিবৃত্তিমার্গীয়। বেদোক্ত প্রবৃত্তিমার্গীয় কর্ম্মকাণ্ড, কি বৌদ্ধ, কি জৈন—উভয়ের পক্ষে সমভাবে নিন্দা ও উপেক্ষার বিষয়। ভাগবত ধর্ম্ম—আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপে উভয় সীমা অঙ্গীকার করিয়া, উহাদের কোনওটিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় না করিয়া, উভয়ের মধ্যে, যে প্রাণারাম, শান্তিশীতল, সহজ সাধ্য সুখগম্য মধ্য পথ আছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ধর্ম্মে ভগবান ওতপ্রোতভাবে সংজড়িত। উহাতে তিনি কঠোর বিচারক নহেন, ন্যায়নিষ্ঠ হইলেও নির্ম্মম নহেন, তাঁহার মাধুর্য্যে জীব ও জগৎ মধুময়, তাঁহার করুণাধারায় সমুদায় স্নাত, স্নিগ্ধ, হাস্যোজ্জ্বল। বেদের শিব, শান্ত, অদ্বৈত তত্ত্ব—প্রাণোন্মাদনকারী, সকলসুন্দরসন্নিবেশ মধুর মূর্ত্তিতে প্রকটিত। শ্রুতিতে যিনি সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, রসস্বরূপ, তিনি সর্ব্বরসের রসিক, রসকদম্ব মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত। এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন অর্ব্বাচীন কালে নহে, মহাভারতে নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১৫ অনুবাকে ১০৪ সূক্তে ৬ ঋকে আমরা ইহার মূল নিহিত দেখিতে পাই। উক্ত ঋকটির একটি অংশ এই :—

স ত্বং ন ইন্দ্র সূর্য্যে সো অপ্‌স্বনাগাস্ত্ব
আভজ জীবশংসে ॥

সায়ণ ইহার অর্থ করিতেছেন :—হে ইন্দ্র স ত্বং নোঽস্মান্ সূর্য্যে সর্ব্বস্য প্রেরক আদিত্য আভজ—আভাজয় আভিমুখ্যেন ভক্তান্ সন্তক্তান্ কুরু। তথা স ত্বম্ অপ্‌সু অব্দেবতাসু অস্মান্ আভাজয়। অপি চ জীবশংসে জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীয়ে কাময়িতব্যে অনাগাস্ত্বে—অপাপত্বে—পাপরাহিত্যে অস্মান্ আভাজয়।

> অর্থাৎ হে ইন্দ্র—বলৈশ্বর্য্যাধিপতে ভগবন্! সেই আপনি আমাদিগকে সকলের প্রেরক আদিত্যে ভজনযুক্ত করুন, আর সেই আপনি, অপ্‌দেবতার মধ্যে আমাদিগকে ভজনযুক্ত করুন। অপিচ জীবগণের —প্রাণিগণের কর্ত্তৃক শংসনীয়—কাময়িতব্য অপাপত্বে পাপরাহিত্যে আমাদিগকে ভজনযুক্ত করুন।

উক্ত ঋকের অংশ হইতে, ইহা সুস্পষ্ট, যে ভক্তিতত্ত্বের এবং সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসা তত্ত্বের মূল, উক্ত ঋকে নিহিত। এ প্রকারে অন্যান্য ঋক মন্ত্র উদ্ধার করা যাইতে পারে, বাহুল্য ভয়ে বিরত হইলাম। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, যে ঋগ্বেদের সময় হইতেই ভক্তিবাদ ও অহিংসাবাদ প্রচলিত। উহারা অর্ব্বাচীন কালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বৈদিক সময় হইতেই ধীরে ধীরে উহাদের ক্রিয়া চলিতেছিল। পরম্পরাগত

বুদ্ধগণের ও তীর্থঙ্করগণের বর্ত্তমানতা ইহার প্রমাণ। ভাগবত ধর্ম্মে উহা বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং মহাভারতের সময় উহা প্রচলিত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণী, যাহা অধুনা বর্ত্তমান নাই, অন্যান্য গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশমাত্র বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে জানি, যে তাঁহার ভারতাগমন সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে শৌরসেনী প্রদেশে মথুরা ও অন্য একটি বৃহৎ নগরে যাহাকে তিনি Cliesobora বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, (সম্ভবতঃ স্বান্বীশ্বর) কৃষ্ণ (Heracles) পূজা অতিব্যাপক ভাবে বর্ত্তমান ছিল। উহা যে উক্ত সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাগবত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা, অভ্যুদয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। একারণ সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এই ভাগবত ধর্ম্ম পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম নামে খ্যাত হয় এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত রামানুজ চরিত হইতে আমরা জানি, যে দ্রাবিড় দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে এমন কি কলিযুগারম্ভের পূর্ব্বে দ্বাপর যুগেও ভগবদ্ ভক্ত বৈষ্ণব আলোয়ারগণের নাম ও কীর্ত্তি গুরুপরম্পরাক্রমে তদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত আছে। আবহমান কাল হইতে পুরুষপরম্পরা কর্ত্তৃক লিখিত ও সংরক্ষিত ইতিহাস অবিশ্বাস করিবার কারণ কি?

ভাগবত ধর্ম্মের প্রধান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার উপদিষ্ট গীতাই ভাগবত ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ উপনিষদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতার কাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। আমাদের দেশে আবহমান প্রচলিত বিশ্বাস, যে ইহা মহাভারতের সহিত কলির প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বভাবতঃই গীতার এত প্রাচীনতা মানিতে স্বীকৃত নন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অনেক প্রকার কাল নির্ণয় করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের প্রত্যেকের যুক্তি ও বিচার পরস্পরের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। যাহা হউক, স্বনাম খ্যাত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে নানাপ্রকার প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যে শালিবাহন শকের ৫০০ (পাঁচশত) বৎসর পূর্ব্বে গীতার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল, ইহা নির্ব্বিবাদ। অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গীতা বর্ত্তমান ছিল। ইহা হইতে এ সিদ্ধান্ত হইল না, যে গীতা ঐ সময়ে রচিত। ইহার অর্থ এই যে, এখন পর্যন্ত যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গীতা বর্ত্তমান ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে, উহার পূর্ব্বেও উহার অস্তিত্ব ছিল প্রমাণীকৃত হইতে পারে। গীতা মহাভারতের অপরিহার্য্য অংশ। মহাভারত ব্যাসদেবের কৃত। সুতরাং যতদিন না, গীতার অর্ব্বাচীন কালে প্রণয়ন সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, ততদিন আমাদের দেশে আবহমান কাল

হইতে প্রচলিত বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গীতা সম্বন্ধে যে যুক্তি বর্ত্তমান, তাহা সমবলে ভাগবত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

গীতার সহিত ভাগবতের মিল অন্য প্রকারেও ব্যাখা করা যাইতে পারে। গীতার পরে ভাগবত অন্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত হইলে, উক্ত গ্রন্থকার গীতার ভিত্তি অবলম্বনে ভাগবত রচনা করিতে পারেন। কিন্তু উপরে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, যে ভাগবত বেদব্যাসেরই রচনা এবং উহা গীতার পরে রচিত হইলেও, অতি অল্প পরেই রচিত এবং উভয়ে একজনের রচিত বলিয়া উভয়ের মধ্যে একতা। বহিঃ প্রমাণ নীচে দেওয়া হইল, তাহা হইতেও আমরা বুঝতে পারি যে অন্যান্য মহাপুরাণের ন্যায় ভাগবত ব্যাসদেবেরই রচনা।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে উত্থাপিত আপত্তি নিরসন :—

ভাগবতে বুদ্ধাবতার ও কল্কীঅবতার ভবিষ্যৎকালে ঘটিবে বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহাতে পণ্ডিতেরা মনে করেন, যে বুদ্ধদেবের বহুকাল পরে ভাগবত রচিত— ভবিষ্যৎ বর্ণনা পুরাণের প্রাচীনতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণগণের অসৎ অভিসন্ধি মাত্র। কিন্তু এ আপত্তি বিচারসহ নহে। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে কল্কীঅবতার এখনও হয় নাই। যদি শাস্ত্র বিশ্বাস করা যায় তবে কল্কী অবতারের এখনও বহুকাল বাকী, অথচ পুরাণ মাত্রেই কল্কীঅবতার ভবিষ্যৎ অবতার বলিয়া উল্লেখ আছে, ইহাতে কি বলিতে হইবে, যে কল্কীঅবতার ভাগবত রচনার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা ত প্রকৃত নহে। সুতরাং বুদ্ধাবতারের সহিত পুরাণোক্ত ভবিষ্যদুক্তি অংশত মিল হইয়াছে বলিয়া, বুদ্ধের জন্মের এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচারের পর পুরাণ রচিত হইয়াছিল, বলা সঙ্গত নহে। পুরাণকার ঋষি তাঁহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে যে তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কথিত ব্যাপার মিলিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন পন্থীগণ কল্কী অবতার সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ।

ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে মগধে জরাসন্ধ বংশের রাজত্বের পর প্রদ্যোত বংশ, তৎপর শিশুনাগবংশ, নন্দবংশ, মৌর্য্যবংশ, শুঙ্গবংশ, কাণ্বংশ, তৎপরে অন্ধ্রবংশ রাজত্ব করিবেন বলিয়া ভবিষ্যৎউক্তি আছে, তৎপরে ৭ জন আভীর, ১০ জন গর্দ্দভী, ১৬ জন কঙ্ক, ৮ জন যবন, ১৪ জন তুরস্ক, ১০ জন স্রুণ্ডা, ১১ জন মৌলা বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিবেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তারপর মগধে গুপ্ত রাজগণ রাজত্ব করিবেন। ভাগবত যদি গুপ্ত বংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বের পর অথবা তৎসমকালে রচিত হয়, তবে এ প্রকার উক্তি সম্ভব হইতে পারে, এ প্রকার আপত্তি স্বতঃই মনে উদিত হয়। কিন্তু এ আপত্তি কি সমীচীন? মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোকের

রাজত্বের পর এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রায় চারিশত বৎসরের ভারত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে সময়ে ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহার সম্বন্ধে সংশয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তীর্ণ হইলেও যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছিল, তাহা নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রগ্রন্থ সমুদায় যে লোপ পাইয়াছিল তাহা নহে। ব্রাহ্মণগণের গৃহে গৃহে উক্ত গ্রন্থ সমুদায় রক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং পুরাণগণের অস্তিত্ব সেকালে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই, তবে উহা দ্বারা লোকসাধারণ শিক্ষাদানরূপ মহাব্রত, প্রকাশ্যভাবে আচরিত হইবার পথে প্রতিবন্ধক থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ হইতে বা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ আত্মসংগোপন হইতে মুক্তিলাভ করিতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরাণসকলও বহিঃ প্রকাশ করে, কাল বিপর্য্যয়ে, প্রকাশ্য আলোচনার অভাবে, এবং লিপিকর প্রমাদে একই পুরাণের বিভিন্ন পাঠ সংগঠন, অবশ্যম্ভাবী হওয়ায়, সেই সময়ে পুরাণ সকলের পরস্পরের পাঠৈক্য সম্পাদন এবং অভিনব সংস্করণ সম্পাদিত হয়। পুরাণে "বংশানুচরিত" একটি অপরিহার্য্য, অবশ্য সন্নিবেশিতব্য বিষয়। "বংশানুচরিত"—রাজবংশ বিবরণ। পুরাণের ঐতিহাসিকতার মূল্য ঐ রাজবংশ বিবরণের সত্যতায়। এই সত্যতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁহার পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমাদের দেশের প্রাচীন পন্থী পণ্ডিতগণ সর্ব্বতোভাবে একমত হইতে পারেন না, তথাপি, পুরাণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

যাহা হউক গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে যখন পুরাণের অভিনব সংস্করণ সম্পাদিত হয়, তখন রাজবংশ বিবরণ, গুপ্ত সময় পর্য্যন্ত তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। উপরে কথিত ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ যে একের পর একটি রাজত্ব করিয়াছিল, তাহা নহে, উহাদের মধ্যে অনেকে সমসাময়িক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অন্ধ্র বংশীয় রাজগণ কয়েকশত বৎসর অন্ধ্রদেশে রাজত্ব করিবার পর খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দে মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেন এবং ২২৫ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রবংশ ধ্বংস হয়, সুতরাং অন্ধ্রবংশের মগধে রাজত্ব পরিমাণ ২৭+২২৫=২৫২ বৎসর। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে উক্ত বংশের শাসনকাল ৪৫৬ বৎসর লিখিত আছে। সুতরাং ২০৪ বৎসর উক্ত বংশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সে সময়ে উহারা মগধের কাণ্ব ও শুঙ্গ রাজবংশের সমসাময়িক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেষোক্ত আভীর, গর্দ্দভী, কঙ্ক, যবন, তুরস্ক, গুরুণ্ডা ও মৌলা বংশীয়গণ যে অনেকে সমসাময়িক তাহাতে সন্দেহ নাই। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব, তাঁহার ভারতেতিহাসে ইহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব আমরা পাইলাম, যে পুরাণে অর্ব্বাচীন কালের রাজবংশের নাম উল্লেখ আছে বলিয়া, পুরাণ যে বাস্তবিক অর্ব্বাচীন কালে রচিত, তাহা নহে। পুরাণ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল, অর্ব্বাচীন কালের

রাজবংশের নামোল্লেখ, উহার ঐতিহাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য, সংযোজিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, উহা পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, উহা অতিগৌণ, একারণ অতি সংক্ষেপে উহা সংসাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আর একটী আপত্তি উইলসন্ সাহেব, তাঁহার অনূদিত বিষ্ণুপুরাণের উপক্রমণিকায় উত্থাপন করিয়াছেন, যে ভাগবতেই আছে, যে ব্যাসদেব, ইতিহাস ও পুরাণ রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য রোমহর্ষণকে উহা প্রদান করেন, পরে নারদের উপদেশে ভগবানের স্বরূপ ও গুণ সম্যকভাবে বর্ণনা করিয়া ভাগবত রচনা করিয়া তৎপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। সুতরাং ভাগবত যখন পুরাণ রচনার পরে রচিত হইয়াছিল, তখন উহা পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিরূপে? এবং তৎপূর্ব্ব রচিত অন্যান্য পুরাণে উহার নাম থাকিবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই, যে ভাগবতে কোথাও নাই যে ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পর ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন, সুধু আছে, যে ইতিহাস ও পুরাণ সকল রোমহর্ষণকে দিয়াছিলেন, ইহা হইতে ১৮ খানি পুরাণই যে পূর্ব্বে—রোমহর্ষণকে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা প্রমাণিত হয় না। ভাগবত অন্য পুরাণ সকলের পরে রচিত হইয়াছিল বটে, এবং তৎপূর্ব্বে যে গুলি রচিত হইয়াছিল, সে গুলিই রোমহর্ষণকে দিয়াছিলেন, ইহাই সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ। সুতরাং এ আপত্তি গ্রহণীয় নহে। বিশেষতঃ আমরা বলিয়াছি যে পুরাণ সকল পূজ্যপাদ বেদব্যাসের অধ্যক্ষতায় পুরাণ পরিষদ্ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। সুতরাং উহাদের রচনা প্রায় সমকালেই হইয়াছিল। রচনাকাল মাত্র অল্প বিস্তর পূর্ব্বাপর ছিল। তখন মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত ছিল না, সুতরাং পুরাণসকল অল্প বিস্তর পূর্ব্বপরে রচিত হইলেও প্রত্যেক পুরাণে অন্য সমুদায়ের নাম নির্দ্দেশ অসম্ভব নহে। কারণ ব্যাস শিষ্য দ্বারাই পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব রচনার পর আবশ্যকমত সংযোগ বিয়োগ করিয়া শিষ্যাধ্যাপনা করা অসম্ভব নহে, প্রত্যুত তাহাই স্বাভাবিক এবং তাহাই প্রকৃত ব্যাপার।

তৃতীয় আপত্তি :—ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে একটি শ্লোক আছে,

কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণ পরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥ ভাগ : ১১।৫।৩৫

—হে মহারাজ! কলিতে উৎপন্ন লোকসকল কোন কোন স্থানে অবশ্যই নারায়ণপর হইবেন, কিন্তু দ্রবিড় দেশে ভূরি ভূরি নারায়ণপর লোক জন্মগ্রহণ করিবেন, যে দ্রবিড়ে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, মহাপুণ্যা কাবেরী ও মহানদী প্রভৃতি বর্ত্তমান। ভাগ : ১১।৫।৩৫

এই শ্লোক হইতে আপত্তি উত্থাপিত হয়, যে দ্রবিড়ে বিষ্ণুভক্ত হইবে লিখিত থাকায় ভাগবত, রামানুজের পর রচিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এ আপত্তি যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি বিষ্ণুভক্ত রামানুজের জন্ম দ্রবিড় দেশে দর্শনের পর ভাগবত লিখিত হইয়াছে বল, তবে নাথমুনি, যামুনাচার্য্য ও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরযুগে বর্ত্তমান আলোয়ারগণের সম্বন্ধে বা উক্ত যুক্তি কেননা প্রযোজ্য হইবে? উপরে আমরা বলিয়াছি, যে দাক্ষিণাত্যে দ্বাপর যুগে অনেক ভগবদ্ ভক্ত ছিলেন, ইহা গুরু-শিষ্য পরম্পরা দ্বারা রক্ষিত বিবরণ হইতে জানা যায়। সুতরাং দ্বাপর যুগে বিদ্যমান উক্ত ভক্তগনের নিদর্শনে ভাগবতে উক্ত শ্লোক লিখিত হইয়াছিল, ইহা অধিকতর সম্ভব। আরও একটি কথা আছে, উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে "ক্বচিৎ ক্বচিৎ" পদ আছে, উহা হইতে বুঝা যায় যে দ্রবিড় ভিন্ন অন্যান্য দেশেও ভগবদ্ ভক্ত জন্মিবে, ইহা প্রকাশ করা ভাগবতের অভিপ্রায়। শ্রীমচ্চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভৃতি যে পরম ভক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে উক্ত আপত্তির মূলে কি বলিতে হইবে যে ভাগবত চৈতন্য দেবের পরে লিখিত হইয়াছিল? ইহা যে নিতান্ত অলীক, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

অন্য চতুর্থ আপত্তি—ভাগবতের ভাষা সম্বন্ধে। অন্যান্য পুরাণের ভাষা অপেক্ষা ভাগবতের ভাষা, কি শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্যে, কি অর্থ গৌরবে, কি বর্ণনার ঔজ্জ্বল্যে, কি কবিত্বের জ্যোতিঃতে সর্ব্ববিষয়ে অন্যান্য মহাপুরাণ অপেক্ষা অতিশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কারণ কেহ কেহ বলেন, যে ইহার রচয়িতা ও অন্যান্য পুরাণের রচয়িতা অভিন্ন নহেন। ভাষাতত্ত্ব আলোচনার স্থান ইহা নহে। এবং উহা বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্যের বাহিরে। কেবল পাঠকগণের সমক্ষে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন প্রণীত মেঘনাদ বধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য উপস্থিত করিয়া উভয়ের ভাষা সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিতে বলিব। যদি কালবিপ্লবে উভয় কাব্যের গ্রন্থকারের নাম বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলে উভয়ের ভাষা আলোচনা করিয়া, অতি নিপুণ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ও বলিতে পারিবেন না, যে উভয়ই এক গ্রন্থকার রচিত। মহাভারতের ও কোনও কোনও স্থলের ভাষা অন্য স্থলের ভাষা অপেক্ষা কত পৃথক্, তাহা মহাভারতের পাঠক মাত্র অবগত আছেন। বিশেষতঃ ভাগবত হইতে আমরা জানি, যে ব্যাসদেব, ভগবান, তাঁহার মায়া ও ভক্তিযোগের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিবার পর ভাগবত রচনা করেন, সুতরাং সুধু উহা মানব চেষ্টার ফল, এবং শুষ্ক কবিত্বের নিদর্শন নহে। ভগবানের প্রসাদ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত অন্তঃপ্রেরণা উহার মূলে, সুতরাং উহা যে অন্যান্য সাধারণ পুরাণ অপেক্ষা, সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, তাঁহাদেরই আত্মীয় বন্ধুগণের দ্বারা শাসিত, অধুনা অবনতির চরম নিম্ন স্তরে উপনীত ভারতীয়গণের সভ্যতা, শাস্ত্র, শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানগৌরব যে জগতের সভ্যতাদির মূলে, ইহা স্বীকার করা কষ্টকর বলিয়া, তাঁহারা উহাদিগের অর্ব্বাচীনতা প্রমাণ করিতে স্বভাবতঃই যত্নশীল। কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য।

উহা চিরকাল অসত্যের আবরণে বদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। ভারতীয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত বিশেষজ্ঞগণের চেষ্টায় সত্য ক্রমশঃ আত্ম প্রকাশ করিতেছে—ইহা শুভচিহ্ন।

বহিঃ প্রমাণ—সমকালীন ও সমজাতীয় :—

উপরে আমরা ব্যাসদেবের অধ্যক্ষতায় পুরাণ পরিষদের দ্বারা দ্বাপরান্তে কলিযুগের প্রাক্কালে পুরাণ রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছি। সুতরাং সমুদায় পুরাণ সমকালে রচিত। এখন যদি অন্য পুরাণে ভাগবতের উল্লেখ ও বিবরণ দেখিতে পাই, তাহা হইলে, উহা সমকালীন ও সমজাতীয় প্রমাণরূপে গণ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? শ্রীমজ্জীব গোস্বামীধৃত গরুড় পুরাণের বচন, উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে ভাগবত—সূত্রকার রচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। শ্রীধৎ শ্রীধরস্বামী ১।১।১ শ্লোকের টীকায় মৎস্য পুরাণের ৫৩ অধ্যায়ের ২০, ২১ ও ২২ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন; শ্লোক কয়টি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ ভাগবতমুচ্যতে॥ মৎস্য ৫৩।২০
সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরোত্তমাঃ।
তদ্‌বৃত্তান্তোদ্‌ভবং লোকে তদ্ ভাগবতমুচ্যতে॥ ঐ ২১
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেম সিংহ সমন্বিতম্।
পৌর্ণমাস্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ঐ ২২
অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রচক্ষতে॥

এই শ্লোক কয়টি প্রায় অবিকল স্কন্দ পুরাণে প্রভাসখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৯ হইতে ৪২ শ্লোকে কথিত আছে। উহাদের সরল অর্থ এই:—যে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক যুক্ত পুরাণে গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম তত্ত্ব ও বৃত্রাসুর বধ বর্ণিত আছে, তাহাই ভাগবত পুরাণ বলিয়া কথিত। উক্ত পুরাণে সারস্বত কল্পের নরোত্তমগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি উক্ত পুরাণ লিখিয়া স্বর্ণ সিংহের সহিত ভাদ্রমাসে পূর্ণিমা তিথিতে দানকরে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। এই পুরাণ দান প্রস্তাব নিজ ভাগবতেও আছে, যথা :—

প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহ সমন্বিতং।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্॥

ভাগবত ১২।১৩।১১

স্কন্দ পুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, উক্ত মাহাত্ম্য হইতে তিনটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইল।

শ্রীমদ্ ভাগবতস্যাথ শ্রীমদ্ ভগবতঃ সদা।
স্বরূপমেকমেবাস্তি সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্॥
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদো সোঽসৌ ব্যাসেন কীর্ত্তিতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রো যোঽসৌ ভাগবতাভিধঃ॥

শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রীমান ভগবান—উভয়েই এক সচ্চিদানন্দ লক্ষণ স্বরূপ। ব্যাস, পরীক্ষিৎ শুকসংবাদাত্মক অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক পূর্ণ যে পুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে আছে :—

গ্রন্থাষ্টাদশ সাহস্রং শ্রীমদ্ ভাগবতং বিদুঃ।

ব্রহ্ম বৈঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ১৩৬।১৩

পরং পুরাণশাস্ত্রেষু চাহং ভাগবতং বরম্।

ব্রহ্ম বৈঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ৭৩।৭৮

শেষের শ্লোকার্দ্ধ (৭৩।৭৮) ভগবানের উক্তি। ভগবান বলিতেছেন, পুরাণ শাস্ত্র সকলের মধ্যে ভাগবতই তাঁহার বিভূতির পরিচায়ক।

পদ্ম পুরাণে ভাগবতের গৌরব প্রকাশক অনেকগুলি শ্লোক আছে, তাহাদিগের মধ্যে মাত্র কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ঐ সকল শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে. যে ভাগবত অতি প্রাচীন কাল হইতে শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়া আসিতেছে।

অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্য সর্ব্বতঃ।
কৃতবান্ ভগবান ব্যাসঃ শুকঞ্চাধ্যাপয়ৎ সুতম্॥
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভির্যুক্তং ব্রহ্মবিদ্যাসমন্বিতম্।
বেদবেদান্তসারং তৎ পুরাণানাঞ্চ সত্তমং॥
যত্র সংকীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো ভগবান্ বৈ পদে পদে।
শ্রী ভাগবতমিত্যেব যে স্মরন্তি নরাঃ কচিৎ॥
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যোংযথা নাম্না গদাভৃতঃ॥

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড ৭১ অধ্যায়

ভগবান ব্যাস সর্ব্বতঃ সার আকর্ষণ করিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণ ভাগবত রচনা পূর্ব্বক নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যাপনা করিলেন। এই পুরাণে দ্বাদশস্কন্ধ আছে, ইহা বেদ বেদান্ত সার এবং ব্রহ্মবিদ্যা ইহাতে বর্ত্তমান, ইহা পুরাণ সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার প্রতিপদে ভগবান কৃষ্ণ সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তিত। যে ব্যক্তি শ্রীভাগবত কখনও স্মরণ করে, সে গদাধারী ভগবানের নাম কীর্ত্তনের ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে, যে শ্রীমদ্ ভাগবতকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত শ্লোক সকল রচিত হইয়াছে। দেবী ভাগবতের সহিত উহাদের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। নারদীয় পুরাণে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থ পাদে ৯৬ অধ্যায়ে ভাগবতের স্কন্ধানুযায়ী অনুক্রমণিকা table of contents দেওয়া আছে। বলা বাহুল্য এই অনুক্রমণিকার সহিত শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিস্কন্ধে বর্ণিত বিষয় সকলের মিল আছে। সুতরাং উহা শ্রীমদ্ ভাগবতকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, দেবী ভাগবতের নয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বিস্তারভয়ে, তাহার উদ্ধার করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ভাগবতের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে উক্ত নারদীয় পুরাণে আছে :—

বক্তুঃ শ্রোতুশ্চোপদেষ্টু রনুমোদিতুরেব চ।
সাহায্যকর্ত্তুর্গদিতং ভক্তি-ভুক্তি-বিমুক্তিদম্॥
প্রৌষ্ঠপদ্যাং পূর্ণিমায়াং হেমসিংহ সমাচিতম্।
দেয়ং ভাগবতায়েদং দ্বিজায় প্রীতিপূর্ব্বকম্॥

বক্তার, শ্রোতার, উপদেষ্টার, অনুমোদিতার, সাহায্য কর্ত্তার, ভক্তি, বিষয় ভোগ, ও মুক্তি দানকারী বলিয়া খ্যাত। ভাদ্রমাসে পূর্ণিমায় হেমসিংহের সহিত ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রীতিপূর্ব্বক এই ভাগবত পুরাণ দেয়। বিষ্ণু, লিঙ্গ, মৎস্য, গরুড় পদ্ম, স্কন্দ প্রভৃতি সমুদায় পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম লিখিত আছে, উহাতে ভাগবতের নাম প্রত্যেকেই আছে। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে পারায়ণ মাহাত্ম্যে ৭১ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের পাঠানুক্রম বর্ণিত আছে এবং সাতদিনে সম্পূর্ণ ভাগবত পাঠ কি প্রকারে করিতে হয়; অর্থাৎ প্রথম দিনে কোন স্থান হইতে কত দূর, দ্বিতীয় দিনে কতদূর, ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এই পাঠক্রম হইতে বুঝা যায়, যে দেবী ভাগবতের সহিত ভ্রম হইবার কোনও কারণ নাই। অতএব আমরা পাইলাম, যে প্রত্যেক মহাপুরাণে অন্যান্য পুরাণের নামের সহিত ভাগবতের নাম উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন—গরুড়, মৎস্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, স্কন্দ, পদ্ম, নারদীয় এই ছয়খানি মহাপুরাণে ভাগবতের নাম ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কথিত আছে। এই সকল প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া উহা অর্ব্বাচীন কালে রচিত বলিবার কোনও কারণ নাই।

বহিঃ প্রমাণ—অসমকালীন ও বিজাতীয় :—

উইলসন্ সাহেব তাঁহার অনূদিত বিষ্ণুপুরাণের উপক্রমণিকায় পুরাণ রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাগবত—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকার বোপদেব প্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। উইলসন সাহেবের এই উক্তি ভ্রান্তি পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ

হেমাদ্রি—দেবগিরির রাজা ছিলেন না, তিনি দেবগিরির রাজার "শ্রীকরণাধিপ" ছিলেন; পরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন না, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। হেমাদ্রির প্রধান মন্ত্রীত্ব কালে আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি রাজ্য অধিকার করেন। দ্বিতীয়তঃ, বোপদেব ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই। তিনি ভাগবতের উপর মুক্তাফল ও হরিলীলা নামে দুইখানি নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। হরিলীলা গ্রন্থে বোপদেব স্পষ্ট লিখিয়াছেন, যে তিনি মন্ত্রী হেমাদ্রির তুষ্টি সাধনের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের স্কন্ধ, অধ্যায় ও অর্থাদি নিরূপণ করেন। শ্লোকটি এই :—

শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রী হেমাদ্রিতুষ্টয়ে।

সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভাগবত বর্ত্তমান ছিল। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ভাগবতের বিখ্যাত টীকা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রীটেনিকা ৯ম সংস্করণ ৩১ খণ্ড পৃঃ ২৮৩ হইতে আমরা জানি যে বল্লালসেন খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভাগবত হইতে শ্লোক তাঁহার নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অতএব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভাগবত বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাইলাম।

চতুর্থতঃ, আল্‌বারুণী নামক একজন মুসলমান পণ্ডিত গজনীরাজ মামুদের ভারত অভিযানের সময় ভারতবর্ষে আসেন এবং মামুদের সহিত ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, তাঁহার ভ্রমণ বিবরণী প্রণয়ন করেন। বার্লিন ইউনিভারসিটীর প্রফেসার এডওয়ার্ড সাচৌ উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। মামুদের অভিযান খৃষ্টীয় ৯৯৭ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শেষ হইয়াছিল। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হয়। আলবারুনীর বিবরণে বিষ্ণুপুরাণের নাম আছে এবং তিনি লিখিয়াছেন, যে উক্ত পুরাণানুসারে তিনি হিন্দুগণের অষ্টাদশ পুরাণের নাম জানিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে নামগুলি এই :—(১) ব্রহ্ম (২) পদ্ম (৩) বিষ্ণু (৪) শিব (৫) ভাগবত (বাসুদেব) (৬) নারদ (৭) মার্কণ্ডেয় (৮) অগ্নি (৯) ভবিষ্য (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (১১) লিঙ্গ (১২) বরাহ (১৩) স্কন্দ (১৪) বামন (১৫) কূর্ম্ম (১৬) মৎস্য (১৭) গরুড় ও (১৮) ব্রহ্মাণ্ড। আলবারুণী একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে যে সমুদায় নাম যে পারম্পর্য্যভাবে প্রদান করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণেও সেই সেই নাম, সেই সেই পরম্পরাক্রমে দৃষ্ট হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হয় যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদের পূর্ব্বে উক্ত সমুদায় পুরাণ বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং ভাগবতও বর্ত্তমান ছিল।

পঞ্চমতঃ, ভাস একজন প্রাচীন মহাকবি। তিনি কালিদাসের পূর্ব্বতন কবি। পণ্ডিতবর গণপতি শাস্ত্রী তাঁহাকে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন।

কালিদাস যদি সম্বৎ প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম হন, তবে এই সময়ই অধিকতর সঙ্গত। কিন্তু কালিদাসের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে, অতএব ভাসেরও কাল নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিবে না কেন? কেহ কেহ বলেন, যে তিনি খৃষ্টীয় ২য়, ৩য় শতাব্দীর লোক। ভাস প্রণীত বালচরিত্রে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি আছে বলিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয় বলিয়াছেন :—

চঞ্চলচূড়ঞ্চ চপলৈর্বৎসকুলৈঃ কেলিপরম্।
ধ্যায় সখে স্মের মুখং নন্দসুতং মানবকম্॥

শ্লোকটি পড়িলেই মনে হয়, যে রচয়িতা ভাগবতের ১০।৮।১৮ শ্লোক স্মরণ করিয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে উক্ত পুরাণ তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান ছিল, বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, আচার্য্য ডি, আর ভাণ্ডারকার প্রণীত The Aspects of Ancient Hindu Polity নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক আছে। উক্ত পুস্তক কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কৌটিল্য—চাণক্যের নামান্তর এবং তিনি মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩২২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজত্ব লাভ করেন। ভাণ্ডারকার মহাশয় তাঁহার উল্লিখিত পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন :—

"And while defining the limits and extent of Bharatbarsha, he (Kautilya) shows his indebtedness to the Puran. Precisely these limits and this extent have been specified in বায়ুপুরাণ (chap. 45 vs. 80-7) and also মৎস্যপুরাণ (ch. 144 vs. 9—15)." অর্থাৎ কৌটিল্য, তাঁহার অর্থশাস্ত্রে ভারতবর্ষের সীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ বিষয়ে পুরাণের নিকট ঋণী। বায়ুপুরাণের ৪৫ অধ্যায়ে ৮০ হইতে ৮৭ শ্লোকে এবং মৎস্যপুরাণের ১১৪ অধ্যায়ে ৯ হইতে ১৫ শ্লোকে যে সীমা ও পরিমাণ লিখিত আছে, কৌটিল্য ঠিক তাহাই তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন। সুতরাং উক্ত উভয় পুরাণ কৌটিল্যের সময় বর্ত্তমান ছিল, ইহা বুঝা যায়। পুরাণকার অর্থ-শাস্ত্র হইতে ভারতবর্ষের সীমা ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং উক্ত পুরাণদ্বয় হইতে কৌটিল্য উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। উপরে দেখাইয়াছি যে মৎস্যপুরাণে ৫৩ অধ্যায়ে ২০ হইতে ২২ শ্লোক পর্য্যন্ত ভাগবতের নাম, শ্লোক সংখ্যা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। সুতরাং কৌটিল্যের সময়ে ভাগবত পুরাণ বর্ত্তমান ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব এই সমুদয় প্রমাণ হইতে আমরা পাইলাম, যে ভাগবত অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান। কৌটিল্যের পূর্ব্বে কোনও প্রমাণ এখন দিতে পারা গেল না বলিয়া, যে তৎপূর্ব্বে ভাগবত বর্ত্তমান ছিল না, তাহা নহে। যতদিন না, ইহার রচনা সম্বন্ধে অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায়, ততদিন আবহমান কাল হইতে প্রচলিত অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত, কলির প্রাক্কালে ইহার রচনা কাল সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

শ্রীমদ্ ভাগবত ও দেবী ভাগবত মধ্যে কোনটি মহাপুরাণ ? :—

শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী, তাঁহার ১।১।১ শ্লোকের টীকায় এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া, প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে তিনি যাহার টীকা লিখিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ ভাগবতই মহাপুরাণ, অন্যখানি মহাপুরাণ নহে। তাঁহার লেখা হইতে মনে হয়, যে সে সময়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের মহাপুরাণত্বের বিরুদ্ধে এক সাম্প্রদায়িকমত প্রচলিত ছিল। কবে এই মত প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা জানা যায় না। সেই সময়ে, বা তাহার অব্যবহিত পরে এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বাগবিতণ্ডা হয় এবং উভয় পক্ষই সুরুচিকর নাম দিয়া অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা করেন; তন্মধ্যে উইলসন্ সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পুস্তকালয়ে তিনখানি পুস্তক দেখিয়াছিলেন। উহাদের নাম, যথাক্রমে, (১) দুর্জ্জন-মুখ-চপেটিকা, (২) দুর্জ্জন-মুখ-মহা-চপেটিকা, (৩) দুর্জ্জন-মুখপদ্মপাদুকা। ইহাদের মধ্যে একখানিও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। যাহা হউক, আমি সেই পুরাতন বিতণ্ডা উত্থাপন করিয়া সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমি মাত্র তিনটি অতি সহজে উপলব্ধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং পাঠকগণকেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ করি।

প্রথম বিষয়টি এই, উপরে লিখিত হইয়াছে, যে পদ্ম, গরুড়, স্কন্দ, নারদীয় অন্ততঃ এই চারিখানি মহাপুরাণে শ্রীমদ্ ভাগবতের মাহাত্ম্য, অনুক্রমণিকা প্রভৃতি এরূপভাবে বর্ণিত আছে, যাহাতে কোনও প্রকার সন্দেহই থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, দেবী ভাগবতের ১।৩।৩৪, ১।৩।৩৯ ও ১২।১৪।১ শ্লোকে উক্ত পুরাণের নাম শ্রীমদ্ ভাগবত বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত নামে ঐ পুরাণ লোকসমাজে প্রসিদ্ধ নহে। অন্য পক্ষে অন্য পুরাণখানি শ্রীমদ্ ভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পূজিত। এবং উহার সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, অন্য পুরাণখানি "দেবী ভাগবত" নামে প্রচলিত। উহা শ্রীমদ্ ভাগবতের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। তৃতীয় বিষয়টি এই, যে দেবী ভাগবতের ১।৩।৩৬ শ্লোকে ও ১।৩।৩৯ শ্লোকে স্পষ্ট কথিত আছে, যে ব্যাস পুরাণ রচনা করিয়া উহা স্বীয় পুত্র শুককে অধ্যাপনা করেন, কিন্তু দেবী ভাগবতে শুক বক্তা নহেন এবং শুক যে কোনও প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত নাই। এই তিনটি বিষয় বিশেষ প্রাণিধান যোগ্য এবং এই তিনটি হইতে সহজ সিদ্ধান্ত হইবে, কোন পুরাণখানি আসল এবং কোনখানি তাহার অনুকরণে রচিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

ভারতবর্ষ জগতের সমুদয় ধর্ম্মের অভিনয় ক্ষেত্র, ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ সমন্বয় ক্ষেত্র হইবে :—

শ্রীভগবানের অনুগ্রহে ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষেপালোচনা যথাশক্তি সমাপন করিয়া উপসংহারে উপস্থিত হইয়াছি। ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদিত তত্ব, কত উদার, কত সার্ব্বজনীন, কত কল্যাণকর, যদি ইহার ক্ষীণতম আভাস দিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে করিব। ব্রহ্মতত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে জগতের সমুদায় বাদ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে, এবং জগত্তত্ব, জীবতত্ব প্রভৃতি সমুদায় ব্রহ্মতত্বের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মের লিঙ্গভেদ নাই, একারণ ক্লীবলিঙ্গ "তৎ" ও "সৎ" শব্দ দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ ; সমুদায় শব্দ কি লৌকিক, কি বৈদিক, মুখ্যভাবে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে এবং মাত্র গৌণ ভাবে তত্তৎ বস্তুকে নির্দ্দেশ করে। এই সমুদায় হইতে আমরা পাইলাম যে, যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও দেশে, যে কোনও নামে উপাসনা করুন না কেন, উহা তাঁহাতেই পৌঁছিবেই। ইহা অপেক্ষা উদার, সার্ব্বজনীন ও কল্যাণকর শিক্ষা আর কি হইতে পারে? ভারতবর্ষের ঋষিগণ এ শিক্ষা এ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই, যখন অগ্ন্যুপাসক পারসিকগণ নিজ স্বদেশে উৎপীড়িত হইয়া, উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন তাঁহারা ভারতবর্ষে আশ্রয়স্থান পাইলেন। এই একই কারণে ভারতবর্ষ সমুদায় ধর্ম্মের অভিনয় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যতে সমুদায় ধর্ম্মের সমন্বয় এখান হইতেই হইবে, এ আশা দুরাশা বলিয়া মনে হয় না।

ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদিত তত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা ? :—

বৈজ্ঞানিক পন্থা, বৈজ্ঞানিক উপায়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রভৃতির ধূয়া, আজকাল সর্ব্বত্র। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা মনে করেন, যে পাশ্চাত্য দর্শনই বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত, ভারতীয় দর্শন তাহা নহে, কেননা উহা ন্যায়ানুসারী হইলেও, তর্কশাস্ত্রানুযায়ী প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া, বেদ ও উপনিষদ্

Foot-note :—Extracts from letter dated Fort William, the 7th September, 1853, from the Principal of the Sanskrit College, Calcutta to F. J. Mouat Esqr. M. D. Secretary to the Council of Education.

সমূহকে স্বতঃ প্রমাণ গণ্য করিয়া, তাহাদের উক্তির উপর ভিত্তি স্থাপন করতঃ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অতএব উক্ত দর্শন বিজ্ঞান সম্মত কি করিয়া বলা যাইবে। কথিত আছে যে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উক্ত মত পোষণ করিতেন (দেখ পাদটীকা)। এই মত কতদূর সঙ্গত তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করা যাউক।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল পর্যালোচনা করিলে, ইহা সহজে বুঝা যায় যে, কি জড় বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সমুদায়ের মূলে ইন্দ্রিয়ানুগ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়াতিগ জ্ঞান হইতে পারে, ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করিতে পারেন না। জড় বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয় সহায়ক, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র সহযোগে সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়া বিজ্ঞানের জয়গান করিলেন; উদ্ভিদের দেহে বিষ প্রয়োগ করিয়া, উক্ত বিষের ক্রিয়া প্রাণিদেহের ন্যায়

Para 3... ... ...

With regard to Bishop Berkeley's Inpuiry, I beg leave to remark that the introduction of it as a class book would beget more mischief than advantage. For certain reasons which it is needless to state here, we are obliged to continue the teachings of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. *That the Vedanta and Sankhya aro false systems of Philosophy is ro more a matt r of dispute. These systems false as they are, command unbounded reverence from the Hindoos. Whilst teaahing these in theSanskrit College, we should oppose them by sound Philosophy in the English Course to counteract their influence.* Bishop Berkeley's Inquiry which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and *which is no more considered in Europe as a sound system of* Philosophy will not serve that purpose. ... ...

... ...

Para 4 :— ... ...

It must be confessed however, that there are many passages in Hindu Philosophy, which cannot be rendered into English with ease and sufficient intelligibility, *only because there is nothing substantial in them.*

I have etc.

Sd. Eshwar Chandra Sharma.

Principal, Sanskrit College.

উদ্ভিদ দেহে, যন্ত্রণার নিদর্শন স্বরূপ আকুঞ্চনাদি সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও, সহায়ক যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিলেন। যন্ত্র সাহায্যে বিশেষ আলোক কিরণ প্রত্যক্ষীকৃত করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। রাসায়নিক, পার্থিব বস্তুজাতের সুকৌশল ব্যবহারে, নূতন বস্তুর অভিব্যক্তি করিলেন, বস্তুর সার—(দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাদ্যদ্রব্যের ভাইটামিন) পৃথকীকৃত করিয়া লোক-সমাজে উপকার সাধন করিলেন। মনোবিজ্ঞানবিদ্ ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানবিদ্, মস্তিষ্কের সুকৌশল পরিচালনে, বুদ্ধিবৃত্তির পটুতম ব্যায়ামে, তর্ক শাস্ত্রানুমোদিত পন্থার রেখামাত্র অনতিক্রমণে, যুক্তি ও বিচারের অতি নিপুণ প্রয়োগে, নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া, লোক সমাজে ধন্যবাদার্হ হইলেন এবং সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, যে তাঁহাদের গবেষণা, যুক্তি, বিচার, পরীক্ষা, প্রমাণ, সিদ্ধান্ত সমুদায়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে লব্ধ-জন্ম অনুমানের উপর নির্ভর করে, সুতরাং উহারা ইন্দ্রিয়ানুগ ও দেশ-কাল-পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় সহায়ক যন্ত্র কখনই নির্দ্দোষ হইতে পারে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুগ জ্ঞান উহাদের প্রকৃতিগত দোষে দুষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্য শাস্ত্র ইন্দ্রিয়ানুগ জ্ঞান মাত্রেই "করণাপাটব" দোষ আছে, বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। "করণাপাটব' অর্থ করণের বা সাধনের বা উপায়ের অপাটব—অপটুতা, অনিপুণতা। এই দোষের জন্য ইন্দ্রিয় ও তৎসহায়ক যন্ত্রের সাহায্যে উপলব্ধ জ্ঞান কখনই সম্যক্‌জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং জড় বিজ্ঞানবিদ্ তাঁহার পরীক্ষাগারে সূক্ষ্মতম বিক্ষেপ প্রতীতিকারী অতি উচ্চাঙ্গের যন্ত্র সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান নহে। উচ্চগণিতের সিদ্ধান্তও এ দোষ হইতে মুক্ত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণিতবিদ্ একটি কাল্পনিক সম্পূর্ণ দৃঢ় বস্তু (a perfect rigid body) ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতঃ গবেষণা করিলেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত উহার উপরে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার কল্পনা প্রসূত উক্ত বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব সৃষ্টিতে নাই। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত বস্তুগত মিল নাই, প্রত্যুত সিদ্ধান্তের কাছাকাছি (close approximation) যায় বটে। একারণ গণিত বা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত সত্য নহে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কেপ্‌লারের সিদ্ধান্ত নিউটন কর্তৃক ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছিল, আবার নিউটনের সিদ্ধান্ত ২৫০ সার্দ্ধ দুইশত বৎসরের অধিক কাল অব্যাহত ভাবে চলিয়া, বর্ত্তমানে আইনষ্টাইন কর্ত্তৃক ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ এই "করণাপাটব" দোষের জন্য যে ভ্রম সংঘটিত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া, এবং সেজন্য তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলে কিছু যোগ বিয়োগ করিয়া (giving an allowance for error) সমীকরণ করিবার চেষ্টা করেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কি জড়বিজ্ঞানবিৎ, কি মনোবিজ্ঞানবিৎ, কি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবিৎ, কি গণিতজ্ঞ, সকলেই দেশ-কাল-পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত বস্তুনিচয়ের

আলোচনা করিয়া থাকেন। যে বস্তু দেশ কালের অতীত, বাক্য মনের অগোচর, ভাষা যেখানে মূক, চিন্তা যেখানে পঙ্গু, ইন্দ্রিয়ানুগ চিন্তা ও জ্ঞান যেখানে অন্ধ, পথ দেখিতে পায় না, তাঁহারা সে বস্তুর আলোচনা করেন না। কেহ্ কেহ উক্ত আলোচনায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেও, উহা অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য ইত্যাদি বলিয়া দূর হইতে পরিহার করিয়াছেন। উহার আলোচনায় তাঁহাদের মূল্যবান মস্তিষ্ক বিলোড়িত করেন নাই। উহার অপরোক্ষ অনুভূতি লাভের চেষ্টা, বাতুলের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। মন যে দেশ-কাল-পরিচ্ছেদের উপর উঠিতে পারে, এবং তাহার উপরে যে তত্ত্ব, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, তাহার অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারে এবং উক্ত লাভ—পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি মনে করিয়া তাহাতে সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ, গুরু-শিষ্য পরাম্পরাক্রমে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনা সহযোগে, উক্ত অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য তত্ত্বের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ঐকান্তিক সাধনা, প্রাণপাত চেষ্টা কি কখনও বিফলে যায়? সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদের নিকট মানবের অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক সাধনার কথা কি? পরমতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়ানুগ জ্ঞানে, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য হইলেও, স্বয়ম্প্রকাশ, জ্যোতিঃস্বরূপ ত বটে। যিনি স্বয়ম্প্রকাশ, যাঁহার জ্যোতিঃতে সমুদায় প্রকাশিত, যাঁহাকে প্রকাশ করিতে, অন্য জ্যোতিঃর প্রয়োজন হয় না, তাঁহার আত্ম-প্রকাশ ত নিত্যসিদ্ধ, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান, কোথাও উহার ব্যাভিচার নাই। আমরা আবরণ সৃষ্টি করিয়া উহা আচ্ছাদিত করি মাত্র। এই আচ্ছাদনের অপসারণে উহা স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার কথা কি? এই আবরণ কিরূপে অপসারিত হইতে পারে, তাহা আমরা উপাসনাতত্ত্ব আলোচনায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, কি ভারতীয় ঋষি, উভয়েই জানিতেন, যে জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম উভয়বিধ তত্ত্ব বর্ত্তমান এবং তত্ত্ব যত সূক্ষ্ম হইবে, সংযত করিতে পারিলে উহা তদপেক্ষা স্থূলতত্ত্বের উপরে তত অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে এবং উহাকে অভিভব করে; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাঁহার এই জ্ঞান জড়শক্তির (আলোক, তাপ, তড়িৎ, চৌম্বুক প্রভৃতি শক্তির) ভিতর সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং তাহাদিগকে সংযত করিয়া ব্যবহারিক জগতে মানবের সুখ সম্ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় ঋষি, তাঁহার এই জ্ঞান অধিকতর সূক্ষ্ম অধ্যাত্মশক্তি (চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি) তে প্রয়োগ করিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সূক্ষ্মতম পরমতত্ত্ব অধিগত করিতে পারিলে, অন্যান্য সমুদায় তত্ত্ব, কি জড় জগতের, কি অধ্যাত্ম জগতের, আপনাপনি অভিভূত হইয়া জ্ঞানের অধিগম্য হইয়া পড়িবে। এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা, এই সিদ্ধান্তের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দিতেছে।

ভারতীয় ঋষি, সেই সূক্ষ্মতম পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং দেখিলেন, যে জড়তত্ত্বের আলোচনা ও জ্ঞান ছেলেখেলা মাত্র। পরম পুরুষার্থ লাভের নিকট উহা অতি হেয়। উহার বাস্তবিক সত্তা নাই। বিশেষতঃ পরমতত্ত্ব অধিগত হইলে জড় জগতের কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। তিনি তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি লব্ধ আনন্দ সংবাদ লোক সমাজে প্রকাশ করিয়া সকলকেই সেই পথে আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার সেই আনন্দ সংবাদ প্রথম পরিচ্ছেদে ৮ পৃষ্ঠায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩।৮ মন্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

উক্ত মন্ত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি ইন্দ্রিয় দ্বারে লব্ধ অনুভূতি নহে। ইহা "অনুভূতি স্বরূপের অনুভব, জ্ঞান স্বরূপের জ্ঞান," ইন্দ্রিয়ের দোষে ইহা সম্পৃক্ত নহে, ইন্দ্রিয়ানুগ জ্ঞান অপেক্ষা, ইহা "লক্ষ লক্ষ গুণে ঘনিষ্ঠ, সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, প্রাণারাম, দ্বিধাসংকোচ শূন্য।" জীবতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি "ব্রহ্ম যেমন অজ, নিত্য ও শাশ্বত, জীবও তদ্রূপ অজ, নিত্য ও শাশ্বত" এবং জীবের স্বরূপাভিব্যক্তিতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং তখন তাহার শক্তি অসীম। জীব তখন ব্রহ্মের অনুভব করিতে সমর্থ। একের স্পন্দন তখন অপরে প্রতিস্পন্দন জাগাইয়া তোলে। জীব স্বরূপে ও ব্রহ্ম স্বরূপে তখন ভাবের আদান প্রদান চলিতে থাকে। আত্মায় আত্মায় তখন মিলন বা সংবেদন প্রবাহ ছুটিতে থাকে। প্রাচীন ঋষিগণ দেখাইয়া গিয়াছেন, যে সাধনাবলে, তাহা ইহজীবনে অধিগম্য। তবে তখন জাগতিক বিষয় ও তাহাদের উপভোগের সাধন স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ হইতে আত্ম স্বরূপকে পৃথক্ করিয়া কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। তাহা কি প্রকারে করা সম্ভব, তাহারও উপায় নির্দেশ করিতে তাঁহারা কার্পণ্য করেন নাই। এবং যে কেহ, তাঁহাদের কথিত উপায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের লব্ধ অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, যে জড় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সমুদায়, যেমন ইন্দ্রিয়ানুগ জ্ঞান এবং তাহার সহায়ক যন্ত্রাদি দ্বারা পরীক্ষাসিদ্ধ, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সকলও সেইরূপ ইন্দ্রিয়াতিগ জ্ঞান এবং তৎসাধনভূত প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষাসিদ্ধ। উভয় বিজ্ঞানের পরীক্ষা সমুদায়ের উল্লেখ সম্ভব নহে। জড় বিজ্ঞানের এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অঙ্গভূত এক এক বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থনিচয় যখন সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ, তখন একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহাদের স্বল্পমাত্র উল্লেখও সম্ভব নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

আমরা আরও বুঝিলাম, যে জড় বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্যও অত্যন্ত পৃথক্ ; সুতরাং উহাদের প্রতিপাদনের হেতুভূত পরিদর্শন (observation) এবং পরীক্ষা (experiment) প্রভৃতির ধারা যে বিভিন্ন হইবে, তাহার কথা কি ? একারণ পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান বা দর্শনের পরিদর্শন ও পরীক্ষার ধারার সহিত, ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উক্ত উভয়বিধ ধারার ঐক্য নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উক্ত ধারা অবৈজ্ঞানিক বলা যায় না। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণের বিজ্ঞানের পরিভাষার সহিত ভারতীয় ঋষিগণের উক্ত পরিভাষার মিল নাই। যদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিজ্ঞানের পরিভাষানুসারে ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, অবৈজ্ঞানিক বল, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, যে বিজ্ঞানের ভারতীয় পরিভাষানুসারে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন, সুধু অবৈজ্ঞানিক নহে, অসৎ, হেয় তুচ্ছ। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ শাস্ত্র ও গুরূপদেশ লব্ধ জ্ঞানকে জ্ঞান এবং অপরোক্ষানুভূতি লব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞান আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অপরোক্ষানুভূতি ইন্দ্রিয়াতিগ জ্ঞান পর্য্যায়ে পড়ে এবং তাহা জীবের স্বরূপাভিব্যক্তিতে অধিগম্য, ইহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক ভারতীয় ঋষিগণের বিজ্ঞানের উক্ত পরিভাষানুসারে, তাঁহাদের অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সিদ্ধান্ত সকল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সিদ্ধান্ত সকল, স্বরূপাভিব্যক্তিতে অপরোক্ষানুভূতি পরিস্ফুট হইলে, পরিদৃশ্যমান হয় না বলিয়া, অবৈজ্ঞানিক, অসৎ, হেয়, তুচ্ছ বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত।

উপরে যে অপরোক্ষানুভূতি বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কথা বলা হইল, উহা আমাদের নিজের উক্তি নহে। পাতঞ্জল দর্শনে তাহার স্পষ্ট উক্তি আছে। পতঞ্জলি মুনি তাঁহার যোগদর্শনে সমাধিপাদে ৪২, ৪৩, ৪৫ সূত্রে, সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার, এই চারি প্রকার সবীজ সমাধির উল্লেখ করিয়া, উহাদিগের মধ্যে নির্বিচার সমাধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্পষ্ট বলিলেন এবং উক্ত সমাধিপাদের ৪৭ সূত্রে নির্ব্বিচার সমাধিতে "বৈশারদ্য" লাভ করিলে, অর্থাৎ উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলে "অধ্যাত্মপ্রসাদ" লাভ হয়। ব্যাসদেব তাঁহার উক্ত সূত্র ভাষ্যে "অধ্যাত্মপ্রসাদঃ" পদের অর্থ বলিলেন, "ভূতার্থ বিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটপ্রজ্ঞালোকঃ" টীকাকার ইহার অর্থ বলিলেন "জ্ঞানালোক-প্রকর্ষেণাত্মানং সর্ব্বেষামুপরি পশ্যন্ দুঃখত্রয়পরীতান্ শোচতোজনান্ জানাতীত্যর্থঃ" প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানালোক উদ্ভাসন হেতু, আত্মা সমুদায়ের উপরে, ইহা দর্শন করিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট অনুশোচনকারী জনগণকে জানিতে পারেন—অর্থাৎ তখন তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং আত্মদর্শন হইলে, সংসারের লোকগণের ত্রিতাপজ্বালা এবং তাঁহার কারণাদি তাহার নিকট অব্যক্ত থাকে না, তখন তাঁহার "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা" লাভ হয়, ইহা উক্ত পাদের ৪৮ সূত্রে কথিত আছে। "ঋতম্ভরা" পদের অর্থ—ব্যাসদেব বলিলেন :—"অন্বর্থা সা, সত্যমেব বিভর্ত্তি, ন তত্র বিপর্য্যাসগন্ধোঽপ্যস্তি"—"ঋতম্ভরা" নাম অন্বর্থ বটে, কেননা "এ প্রজ্ঞা (জ্ঞানালোক) কেবল ঋত বা সত্যকেই প্রকাশ করে, তৎকালে ভ্রম প্রমাদের লেশও থাকে না" যোগীগণ এই "ঋতম্ভরা" প্রজ্ঞাদ্বারা সমুদায় বস্তু যথাবৎ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ইহাই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। পাতঞ্জল দর্শন এবং উক্ত দর্শনে কথিত তত্ত্ব সকল—কাল্পনিক অতিশয়োক্তি নহে। উহাতে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের উপায়, উহাদের কার্যতঃ অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া, অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিলে অপরোক্ষানুভূতি লাভ, এবং অপরোক্ষানুভূতিতে সমুদায় স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। অনুষ্ঠানসাপেক্ষ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া "কিছুই নয়" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া মূর্খতার পরিচায়ক,

তাহাতে সন্দেহ কি? উপরে লিখিত পাতঞ্জল দর্শনের কয়েকটি সূত্রের অতি সংক্ষেপ আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা" লাভ মানবের আয়ত্ত। উহা লাভ করিতে পারিলে, কি জড়, কি চেতন, কি ভূত, কি ভৌতিক, সমুদয়ের প্রকৃততত্ত্ব, উক্ত প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত সাধকের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। কিছুই জানিবার বাকি থাকে না। প্রাচীন ঋষিগণ, ইহা বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া অত জোরের সহিত "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" প্রতিজ্ঞা শ্রুতিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের বা দর্শনের এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিভিন্ন এবং প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন। আমাদের জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, এবং তখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সাহায্যেই জ্ঞানলাভ করি, ইহা ইন্দ্রিয়ানুগজ্ঞান বলিয়া উপরে কথিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা দর্শনের প্রতিপাদিত তথ্য সকল, উক্ত বিজ্ঞান বা দর্শনবিদ্‌গণের জাগ্রদবস্থায় পরিদর্শন, পরীক্ষা ও তাহা হইতে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তির উপর নির্ভর করে। তাঁহারা জাগ্রদবস্থার অতীত অবস্থায় জ্ঞান হইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃত সত্য জ্ঞান, এরূপ মনে করা বাতুল্যের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ জাগ্রদবস্থার জ্ঞানের উপর কিছুমাত্র আস্থা প্রদান করেন নাই। তাঁহারা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছিলেন, যে জাগ্রদবস্থায় লব্ধজ্ঞান, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব প্রভৃতি দোষে দুষ্ট, এ কারণ যে জ্ঞানে উক্ত প্রকার দোষ মাত্রের সম্পর্ক লেশ নাই, তাঁহারা সেই জ্ঞানলাভের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক জগতে, আকাশ-ব্যাপ্ত তড়িৎশক্তিকে সংযত ও যন্ত্রবদ্ধ করিয়া, আলোক উদ্গীরণে অন্ধকারনাশ, ব্যজনীসঞ্চালন, সংবাদপ্রেরণ, পাক-কার্য্য-সম্পাদন, জলোত্তোলন, ট্রাম ও রেলের দ্রুত গমন প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিয়া লোকের সুখ ও সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উক্ত বৈজ্ঞানিক, জড়শক্তিকে সংযত করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া তাহা দৈনিক কার্য্যে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম বৈজ্ঞানিকের সংযমের উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি জানেন ও বুঝেন, যে বাহ্যজগৎ—আত্মশক্তির বিলাস মাত্র। আত্মশক্তি সংযত করিতে পারিলেই, সমুদায় শক্তি আপনাপনি সংযত হইতে বাধ্য। তখন সমুদায় জড় শক্তির উপর প্রভুত্ব আপনাপনিই আসিয়া পড়ে। এই সংযমের উপায় তাঁহার শাস্ত্রে সর্ব্বত্র। ভগবান গীতায় ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

যা নিশা সর্ব্ব ভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ গীতা ২।৬৯

—"সাধারণ ভোগী মানবের পক্ষে যেটি রাত্রির ন্যায় চিন্তার অবিষয়, ত্যাগী সংযমীর পক্ষে সেইটিই আলোকময় দিবার ন্যায় চিন্তা বা অনুসন্ধানের বিষয়। সাধারণ জীব হৃষ্টান্তঃকরণে উত্তেজিত হইয়া যে বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন মননশীল মুনির পক্ষে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিবৎ উপেক্ষার বিষয় হয়, সন্দেহ নাই।" শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী কৃত ব্যাখ্যা।

সাধারণ মানবের পক্ষে জাগ্রদবস্থাই উত্তেজনা, অনুশীলন, কর্ম্ম প্রচেষ্টার প্রকৃত কাল, কিন্তু মননশীল সংযমীর পক্ষে, তাহা রাত্রির ন্যায় চিন্তার বিষয় নহে। অন্য পক্ষে সাধারণ মানব, যাহাতে সম্পূর্ণ প্রসুপ্ত, সংযমী তাহাতে পূর্ণ জাগ্রত। গীতার এই উক্তির প্রতিধ্বনি আমরা শান্তি গীতায় শুনিতে পাই।

জাগ্রদপি সুষুপ্তিস্থো জাগ্রদ্ধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
সৌষুপ্তে ক্ষয়িতে ধর্ম্মে ত্বজ্ঞানে চেতনঃ স্বয়ম্॥

শান্তি গীতা ৭।৩৪

হিত্বা সুষুপ্তাবজ্ঞানং যদ্ভাবো ভাববর্জ্জিতঃ।
প্রজ্ঞয়া স্বরূপং জ্ঞাত্বা প্রজ্ঞাহীনস্তথা ভব॥ শান্তি গীতা ৭।৩৫

—"জাগ্রৎ থাকিয়াও সুষুপ্তিস্থ—অর্থাৎ জাগ্রদ্ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার ও সুষুপ্তিধর্ম্ম অজ্ঞান বিবর্জ্জিত। সুষুপ্তিধর্ম্ম অজ্ঞান বিলীন হইলে কেবল স্বয়ং শব্দবাচ্য চৈতন্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। সুষুপ্তিধর্ম্ম অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে, যে ভাববর্জ্জিত ভাব স্ফূর্ত্তি পায়, প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা আপনার স্বরূপ জানিয়া প্রজ্ঞাহীন হও।"

উপরে শান্তি গীতার শ্লোক দুটীতে যাহা কথিত হইল, তাহা যে কেবল শব্দ বিন্যাসের চাতুরী মাত্র এবং উহা রচয়িতার কল্পনা প্রসূত, তাহা নহে। "যদ্ভাবো: ভাববর্জ্জিতঃ" ভাববিবর্জ্জিত ভাব—সাধারণ দৃষ্টিতে উহা পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, সমুদায় বিরোধীগুণের ও ধর্ম্মের সমাধান তাঁহাতে, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে অভিন্ন; সুতরাং আত্মতত্ত্বেও সমুদায় বিরোধীগুণের ও ধর্ম্মের সমাধান। বিশেষতঃ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ভাব বর্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তখনও ভাবের অভাব হয় না, যাহা ভাবস্বরূপ, তাহার অভাব কোনও কালে নাই, সৎ স্বরূপের অসদ্‌ভাব কখনই হইতে পারে না, এ কারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে "যদ্ভাবো ভাববর্জ্জিত" বলা ভিন্ন উপায় নাই।

যাহা হউক আমরা বুঝিলাম, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তাঁহাদিগের জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধজ্ঞান হইতে সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্ম

বৈজ্ঞানিক ঋষি জাগ্রদবস্থার উপর কিছুমাত্র আস্থা না দিয়া, জাগতিক তিন অবস্থা (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি) পরিত্যাগ করিয়া তাহার উর্দ্ধে তুরীয় অবস্থায় আপনাকে উন্নীত করিয়া, মূল কারণ স্বরূপ পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন, তখন তাঁহার নিকট সমুদায় বস্তুর তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বয়ম্প্রকাশ জ্ঞান স্বরূপের অব্যভিচারী জ্ঞান তখন স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। ইহাই ইন্দ্রিয়াতিগ জ্ঞান বলিয়া উপরে কথিত হইয়াছে। তখন ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব প্রভৃতি দোষের লেশ-সংস্পর্শ তাঁহাদের সিদ্ধান্তে থাকে না। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি এই প্রকারে লব্ধ অপরোক্ষানুভূতির ফলে পরিপূর্ণ, এ কারণ উহারা অপৌরুষেয় নিত্যসিদ্ধতত্ত্বে জাজ্বল্যমান। সে সকলে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব প্রভৃতি দোষের লেশমাত্র নাই। এ কারণ আমাদের দেশীয় জগন্মান্য আচার্য্যগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া, উহাদের স্বতঃ প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার উপর আপনাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অতএব ইহা সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল, যে, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র সমুদায় অবৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত নহে। উহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত সত্যে পরিপূর্ণ এবং সে বিজ্ঞান, জড় বৈজ্ঞানিকের তথা কথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইতে উচ্চতম পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শ্রুতি প্রমাণের সম্বন্ধজ্ঞাপক কয়েকটি দৃষ্টান্ত :—

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত জগৎ ব্যাপার সুষ্ঠু পরিদর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় ঋষির নিকট উক্ত পদ্ধতি উপেক্ষিত হয় নাই। শিক্ষার্থী অল্পজ্ঞ শিষ্যের জন্য উহা একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতীয় দর্শনানুসারে প্রত্যক্ষ একটি প্রবল প্রমাণ। জাগতিক, ইন্দ্রিয় দ্বারে উপলব্ধ, ব্যবহারিক ব্যাপারে উহা প্রবলতম প্রমাণ। ভারতীয় ঋষি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিক বস্তুতে প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা সিদ্ধান্ত, কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর স্থাপন করেন নাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণলব্ধজ্ঞান, যেমন উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করিয়া, তবে তাহার উপর সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, ভারতীয় ঋষি ও সেইরূপ শাস্ত্রসঙ্গত বিশেষ বিশেষ অনুশীলনে, ইন্দ্রিয়াতিগজ্ঞান যথোচিত বিকাশ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত অতিজাগতিক, অতীন্দ্রিয় বস্তু, যেরূপ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার সহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণলব্ধ জ্ঞান মিলাইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অত্যধিক বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে শ্রুতি প্রমাণও তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূল বারংবার এইরূপ অনুরূপ শ্রুতি প্রমাণ পাইয়া, তিনি শ্রুতি প্রমাণের উপর বিশেষ আস্থাবান হইয়া পড়িলেন। যে সকল ঋষি এই প্রকার আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে প্রতি ক্ষেত্রে শ্রুতি প্রমাণের সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়াতিগ জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্তের অবিরোধ দেখিয়া, শ্রুতির

স্বতঃ প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব শাস্ত্রমত আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের সহিত উহার সম্বন্ধ বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভারতীয় ঋষি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন, যে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্বভাবতঃ নিষ্কম্প, স্থির, বায়ু প্রবাহের বেগের তারতম্যানুসারে, অল্প বিস্তর স্পন্দনে, উহাতে তরঙ্গ, বীচি, হিল্লোল, ফেন, বুদ্‌বুদ্ প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এক খণ্ড কাঠ জড় ও স্থির। অগ্নি সংস্পর্শে উহা হইতে ধুম, তাপ, আলোক, অঙ্গার, পাংশু প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন, যে বায়ু সূক্ষ্ম, জল তদপেক্ষা স্থূল; অগ্নি সূক্ষ্ম, কাষ্ঠ স্থূল। তাঁহারা বুঝিলেন যে স্থূলতত্ত্বের সহিত সূক্ষ্মতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ মিলনে বিভিন্ন নামরূপের অভিব্যক্তি হয়। তাঁহারা জানেন যে, চৈতন্য সূক্ষ্মতম তত্ত্ব, উহার সহিত জড়ের সংমিশ্রণে জগতে নামরূপের অভিব্যক্তি হওয়া স্বাভাবিক, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদর্শন হইতে অনুমানলব্ধ জ্ঞান। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে ইহা উপলব্ধি করিলেন। শ্রুতিতেও ইহার উল্লেখ স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন। ছান্দোগ্য ৬।৩।২ ও বৃহদারণ্যক ১।৪।৭ মন্ত্রে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন।

তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে মাটি হইতে কলসী, সরাব প্রভৃতি নামরূপের অনেক প্রকার বস্তু প্রস্তুত হইলেও উহাদের প্রত্যেকের অণু পরমাণুতে মাটি ভিন্ন আর কিছুই নাই। উহাদের সকলের উৎপত্তি মাটি হইতে, স্থিতি মাটিতে এবং ধ্বংস মাটিতে, সেইরূপ বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের মূল অন্বেষণ করিলে, মূলে এক সৎস্বরূপই পাওয়া যায়। বিশ্বস্থ সমুদায়ের কি মহাভূত, কি তন্মাত্রগণ, কি দেব-মানব-তির্য্যক-বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপে অভিব্যক্ত বস্তুজাত, সমুদায়ের উৎপত্তি, সেই এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ হইতে, স্থিতি তাহাতে, এবং লয় ও তাহাতে—ইহা তাঁহারা যুক্তি বিচারে এবং সাধনলব্ধ অপরোক্ষানুভূতিতে বুঝিতে পারিলেন। ছান্দোগ্য শ্রুতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে উহা স্পষ্ট কথিত দেখিতে পাইলেন এবং "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের সাক্ষাৎকার পাইয়া, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা তখন স্পষ্ট বুঝিলেন, যে বিভিন্ন নামরূপের অভিব্যক্তি হইলেও, মূলকারণ আত্মা চিরপূর্ণ, কিছুতেই তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। কারণ নামরূপে অভিব্যক্ত সমুদায়ের অণু-পরমাণুতে এক অদ্বিতীয় আত্মা বা সৎস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

ভারতীয় ঋষি দেখিলেন, যে মানব-দেহ অসংখ্য জীব-কোষে গঠিত। শরীরাভ্যন্তরে রক্তকণিকা গুলিও জীবাণু। উহারা সকলেই সজীব। উহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানোৎপাদন, অপক্ষয় ও মৃত্যু প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে এবং সে সমুদায়, মানব প্রমাণের অতি অল্পকাল মধ্যেই সংসাধিত হয়।

মানবদেহ উহাদের সমবায়ে উৎপন্ন ও পুষ্ট হইলেও, উহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, উহাদের জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণাম, মৃত্যু প্রভৃতি পৃথক্ ভাবে পরিচালিত। একজন স্বাস্থ্যবান মানবের আয়ুষ্কাল মানবমাণের ১০০ বৎসর ধরিলে উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত মানবদেহস্থ জীবকোষ ও জীবাণুগণে কত সহস্র সহস্রবার জন্ম মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও, উহাদের সমবায়ে উৎপন্ন মানবদেহ ১০০ বৎসর ধরিয়া প্রবাহরূপে অব্যাহত ভাবে চলিয়া থাকে। এই সমবায়ে উৎপন্ন মানবদেহকে সমষ্টি ও প্রতি জীবকোষ বা রক্তকণিকাকে ব্যষ্টি বলা যাইতে পারে। এই জীবকোষ সমূহের সমবায়ে গঠিত সমষ্টিরূপ মানবদেহের অধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ। মানবদেহের নিদর্শনে এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি শরীর এবং ইহার অধিষ্ঠাতা হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি জীব। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ব্যষ্টি জীবের মৃত্যু ব্যক্তিগতভাবে দৈনিক সংঘটিত হইলেও সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ তাঁহার পরিমাণের ১০০ বৎসর আয়ুষ্কাল ভোগ করেন এবং তাহা করিবার পর তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

কর্ম্মতত্ত্বালোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে জীবের কর্ম্মই তাহার জন্ম মৃত্যুর কারণ। ব্যষ্টি জীবের পক্ষে যে নিয়ম, সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ পক্ষেও সেই নিয়ম। বিশ্বে কর্ম্ম প্রবাহ যতদিন চলিবে, ততদিন তাঁহাকে জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে উত্থিত, পতিত হইতে হইবে, অর্থাৎ বিশ্বের স্থিতি ততদিন। কোনও বিশেষ মানবের সাধনা প্রভাবে, তাঁহার কর্ম্ম-প্রবাহ রুদ্ধ হইলে, তাহার জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ হইতে অব্যাহতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্বস্থ সমুদায় জীবের কর্ম্মপ্রবাহ যুগপৎ রুদ্ধ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব এবং হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠাতৃত্ব অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। তাঁহারা প্রত্যক্ষ যুক্তি, বিচার এবং অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে এইতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বেদেও হিরণ্যগর্ভের সকলের পূর্ব্বে জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। শ্রুতি বলিলেনঃ—"হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।" (ঋগ্বেদ ৮৷৭৷৩৷১)।

বিশ্বের সমষ্টি কর্ম্ম প্রবাহ, যে ব্যষ্টি জীবের উপর আধিপত্য করে, ইহা ভারতীয় ঋষি বিশেষভাবে জানেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যুগবাদ ও যুগধর্ম্মবাদ ইহার মূলে। ঋষি প্রত্যক্ষ দেখিলেন, যে ভাঁটায় জল নির্গত হইয়া যাওয়ায়, নদী, খাল, নালা প্রভৃতিতে মালবাহী নৌকা প্রভৃতির গমনাগমন অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সমুদ্রে জোয়ার উত্থিত হইয়া ঐ সকল নদী প্রভৃতির ভিতর বেগে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদের সুপ্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা উদ্দীপিত করে। নৌকা প্রভৃতি জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া জোয়ারের অনুকূলে ছুটিতে থাকে। জোয়ারের জলের প্রবেশ আপনাপনিই হয়, উহা নিবারণ করিতে হইলে, প্রবল প্রতিরোধ শক্তির প্রয়োজন। সেইরূপ যুগধর্ম্মের স্রোতে ব্যষ্টি মানব প্রভাবিত হইয়া থাকে, উহার প্রভাব প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে অতি প্রবল শক্তির প্রয়োজন, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। সকলকেই

যুগধর্ম্মের প্রভাবে চালিত হইতে হয়। এজন্য শাস্ত্রে বিভিন্নযুগে যুগধর্ম্মানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা। অতি উচ্চস্তরের সাধক, সদ্‌গুরুর করুণালব্ধ আনুকূল্যে উহার প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। এবং উহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যাহাহউক আমরা বুঝিলাম যে বিশ্বের সমষ্টি কর্ম্ম প্রবাহ সুপ্তকর্ম্মপ্রচেষ্টার হেতু হয়, এবং যতদিন পর্যন্ত সমষ্টি কর্ম্ম প্রবাহ নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন জন্ম মৃত্যু প্রবাহে উত্থিত পতিত হইতে হয়। সাধারণ জীবের মৃত্যুর সহিত যেমন তাহার কর্ম্ম প্রবাহ নিঃশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, কর্ম্মাবশেষ তাহার পুনর্জ্জন্মের উদ্দীপক কারণ হয়, সেইরূপ প্রলয়ে বিশ্বের ধ্বংসের সহিত, বিশ্বের সমষ্টি কর্ম্ম প্রবাহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সমষ্টি কর্ম্মের অবশেষ বিশ্বের পুনঃ সৃষ্টির উদ্দীপক কারণ হয়। এই প্রকার অনাদিকাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। সুতরাং সৃষ্টি নূতন কিছু রচনা নহে। পুরাতনের অভিব্যক্তি। ঋগ্বেদে এই তত্ত্বই "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" মন্ত্রাংশে স্পষ্ট কথিত আছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিলাম, যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শ্রুতি সিদ্ধান্তের বিরোধ নাই। এবং যে বস্তু সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগোচর, তাহার সম্বন্ধে সাধনা হইতে উদ্‌ভূত অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ জ্ঞান, যাহা অনাদি কাল হইতে শ্রুতিতে মন্ত্রবদ্ধ আছে, তাহাই অবলম্বনীয়, ইহা বুঝিতে পারা গেল।

বেদান্ত কি কর্ম্মহীনতা শিক্ষা দেয়?:—

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, যে বেদান্ত জগৎ মিথ্যা, মায়াবিলাসমাত্র শিক্ষা দিয়া কর্ম্মহীনতার প্রশ্রয় দেয়। ইহা যে অতীব ভ্রান্ত ধারণা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ এবং আত্মতত্ত্বের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয় বেদান্তের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য জগত্তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, দেশকালতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব কর্ম্মতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনার প্রয়োজন এবং সেই আলোচনার ফলে ইহারা কেহই ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তর নহে, অথচ ইহারা কেহই ব্রহ্ম স্বরূপ নহে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য সত্য বস্তু। অন্যান্য সমুদায়ের প্রতিভাসমান নিত্যতা বা সত্যতা, একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে উহারা অধিষ্ঠিত বলিয়া। জীবের আত্মস্বরূপ অভিব্যক্ত হইলে, এই পারমার্থিক সত্যতত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হয়। পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, আমাদের কৃতকর্ম্ম, চিরোজ্জ্বল স্বয়ং-প্রকাশ আত্মতত্ত্বকে আচ্ছাদিত রাখে বলিয়া সেই আবরণ অপসারণের প্রয়োজন এবং উহা সংরাধন রূপ কর্ম্মের দ্বারা সংসাধিত হয়। আমরা আরও বুঝিয়াছি, যে, জগতে এমন একটী অণু পরমাণু নাই, যাহার বিশিষ্ট স্থান ও বিশিষ্ট কর্ম্ম বর্ত্তমান নাই।

সকলকেই কোনও না কোনও প্রকারে কর্ম্ম করিতেই হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কিছু কর্ম্ম করিব না বলিয়া চুপ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয় না, উহাও এক প্রকার কর্ম্ম। উহা হেয় কর্ম্ম এবং উহার অনুষ্ঠান হেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও উহা "মিথ্যাচার" বলিয়া গীতায় কথিত। আমরা বুঝিয়াছি, কর্ম্ম দ্বৈত অপেক্ষা করে। আত্ম-স্বরূপ উদ্‌ভাসিত হইলে, দ্বৈত প্রপঞ্চের জ্ঞান না থাকায়, তখন কোনও কর্ম্ম থাকে না। তখন নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি আপনাপনিই সংঘটিত হয়। উহার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। আত্ম-স্বরূপ সকলের প্রকাশিত হইবেই হইবে, উহা কাল সাপেক্ষ। জীবের আত্মস্বরূপ যখন নিত্য, কাল এবং কালে প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টি যখন প্রবাহরূপে নিত্য, তখন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি কালে সকলেরই হইবে। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে সৃষ্টির এক কেন্দ্রে সাধারণ কর্ম্ম, যাহাকে কাম্য কর্ম্ম বলা যায়, এবং অপর কেন্দ্রে নৈষ্কর্ম্ম্য—উভয় কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত জীবজাত। ভগবান গীতায় ৬।৩ শ্লোকে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত যোগারূঢ়াবস্থা লাভ হয় নাই, কর্ম্ম ততদিন উক্ত অবস্থা প্রাপ্তির সাধন, যোগারূঢ়াবস্থা প্রাপ্তি হইলে শমই সাধন। এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে যাইবার এক সুগম মধ্যপথ আছে, তাহা আশ্রয় করিলে গমন সুকর হয়, শ্রীমদ্ ভাগবত ইহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৭

—যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করত ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ফলশ্রুতি রুচির উৎপাদন নিমিত্ত মাত্র।

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, জগতে বর্ত্তমান থাকা কালে, কর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকিবার উপায় নাই, এবং আড়ম্বর করিয়া সাজিয়া গুজিঁয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির উপায় নহে। বিহিত কর্ম্মের শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকোক্তরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি আপনাপনিই হইবে। সুতরাং বেদান্ত কর্ম্মহীনতার উপদেশ দেয় না। পরম তত্ত্ব কর্ম্মলভ্য নহে, উহা বেদান্তের উপদেশ বটে; কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম্ম পরিত্যজ্য নহে—আবরণ অপসারণে নিত্য সিদ্ধ আত্মতত্ত্বের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশমান করায় কর্ম্মের উপযোগিতা; আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে কর্ম্ম আপনাপনিই লয়প্রাপ্ত হয় এবং নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ হয় ইহা বুঝা গেল।

বেদান্ত উপদিষ্ট "সংরাধন" কি অসমর্থের কাতর অনুনয়, ভিক্ষুকের করুণ রোদন?

শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তুবিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

মুণ্ডক ৩।২।৪

—এই আত্মা বলহীন কর্তৃক লভ্য হয় না বা আত্মনিষ্ঠার অমনোযোগ হইতে অথবা বৈরাগ্য রহিত মাত্র কায়ক্লেশসহনরূপ তপস্যা হইতে ইহা লভ্য হয় না ; পরন্তু যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিয়া থাকে।

সুতরাং বেদান্তের উপদিষ্ট সংরাধন রূপ কর্ম্ম অসমর্থের কাতর অনুনয় বা ভিক্ষুকের করুণ রোদন নহে। ইহা শক্তিমানের শক্তি বিকাশের প্রচেষ্টা। অজাযূথে প্রতিপালিত সিংহ শাবকের আত্ম প্রতিষ্ঠা। অন্তরায় দূরীভূত করিয়া নিজ স্বরূপাভিব্যক্তির দৃঢ়সংকল্প। বলহীনের ইহা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আত্মস্বরূপাভিব্যক্তিতে সমুদায় বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, চরাচর জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় তত্ত্বের উপর আধিপত্য করিবার যোগ্যতা প্রাপ্তি হয়, বিশ্বশক্তি পরিচালনা করিবার সামর্থ্য অধিগত হয়, তখন উহাতে দুর্ব্বলের স্থান কোথায়? উপাসনাতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি, যে পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চ বিশ্ব যেমন ভগবানের সংকল্প হইতে জাত, আমাদের মানস জগৎও আমাদের মনের সংকল্প হইতে উৎপন্ন, এবং আমাদের মানস জগৎই আমাদের বন্ধের কারণ। সংখ্যাতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমরা যে সমুদায় সংকল্প পোষণ করিয়াছি, তাহাদের ফলে আমাদের বর্ত্তমান স্থূল সূক্ষ্মদেহ ও পারিপার্শ্বিক পরিদৃশ্যমান সমুদায়। উহারাই স্বরূপাভিব্যক্তির প্রবল অন্তরায়। উহাদের দূর করিয়া তিরোহিত করিতে পারিলে তবে স্বরূপাভিব্যক্তি সম্ভব। সুতরাং উহাদের দূর করিবার জন্য অসংখ্য পূর্ব্বাতীত জন্মের সংকল্পরাশির প্রতিরোধ-সামর্থ্য সম্পন্ন দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। তাহা কত দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা ভগবান বুদ্ধদেবের উক্তি হইতে পাই। বুদ্ধদেব বোধি (আত্মজ্ঞান) লাভের জন্য বোধিদ্রুমের তলে যখন আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন তিনি সংকল্প করিলেন,

ইহাসনৈব শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং বিপ্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভং নৈবাসনাৎ কায়ঃ সমুচ্চলিষ্যতে॥

—এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হউক, আমার ত্বক্, অস্থি, মাংস বিলয় প্রাপ্ত হউক, বহু কল্পেও দুর্লভ যে আত্মতত্ত্ব তাহা এই আসনে বসিয়া লাভ না করা পর্য্যন্ত আমার শরীর এই আসন হইতে একটুও নড়িবে না।

সংকল্প এই প্রকার দৃঢ় হওয়া চাই। ইহা প্রচণ্ড শক্তিমানের আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস জনিত উক্তি। ইহাতে বলহীনের দ্বিধা সংকোচ নাই। অসমর্থের কাতর অনুনয় নাই। দরিদ্রের করুণা ভিক্ষা নাই। ইহা বলবানের নিজের জোরে জোর করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা সংস্থাপন। উপাসনাতত্ত্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে উপাসনা করিতে বাধ্য। সেই প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যদি দৃঢ় সংকল্পাত্মক আত্মশক্তি নিয়োগ করা যায়, তবে সিদ্ধি আসন্ন। সংকল্প এই প্রকার দৃঢ় হইলে এবং আকাঙ্ক্ষা ইহার উপযুক্ত তীব্র হইলে, ভগবানের নিয়মানুসারেই সমুদায় অন্তরায় দূরীভূত হয়। আত্মতত্ত্ব স্বতঃ আত্ম-প্রকাশ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে ব্রহ্ম বা ভগবানে "তিনি" ও "তাঁহার" এই উভয়ের পৃথকত্ব নাই। তিনিও যাহা, তাঁহার নিয়মও তাহাই। স্বতরাং তাঁহার নিয়মানুসারে ইহা সংঘটিত হয়, অথবা তাঁহার দ্বারা হয়, কিম্বা তাঁহার করুণায় হয়, যাহাই বলা যাউক না কেন, সমুদায় ফলে এক।

পরিসমাপ্তি :—

বেদান্তালোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, যে জগৎ, জগতস্থ বিভিন্ন জীব, উহাদের মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়, সমুদায় একই তত্ত্বের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি নীতিশাস্ত্র, কি ব্যবহারশাস্ত্র, সমুদায়ের মূলে এই এক পরম সত্য নিহিত। "আত্মৌপম্যেন" সর্ব্বত্র ব্যবহাররূপ উদার নীতির মূল, এই পরম সত্যে। আমি অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইলে সন্তুষ্ট হই, অপরের প্রতি আমারও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—ইহা এই চিরন্তন পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সমুদায়ে ব্রহ্ম দর্শন, প্রকৃত দর্শন, সম্যক্ দর্শন ;—অন্যথা দর্শন, ভ্রান্তি দর্শন, অপ্রাকৃত দর্শন, ইহা উক্ত পরমতত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। সমুদায়ের সত্তা, সেই পরমতত্ত্বের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সমুদায় ক্রিয়া সেই এক মাত্র পরমতত্ত্বের সঙ্কল্পরূপ ক্রিয়ার অতি ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া। জড় ও চেতনের বিভেদ আপেক্ষিক মাত্র। যখন কি জড়, কি চেতন, সমুদায় একই পরমতত্ত্বের অভিব্যক্তি, তখন দৃশ্যমান বিভেদ বস্তুস্বরূপগত হইতে পারে না, মাত্রাগত এবং গুণ কর্ম্মজাত মাত্র, এবং ইহা পরমতত্ত্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত সত্তা ও জ্ঞান স্বরূপত্ব নির্দ্দেশ করে 'অস্তি' ও 'ভাতি' ইহা দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ে প্রযোজ্য। তাঁহার সংকল্প হইতেই উক্ত বিভেদ প্রতীয়মান হয়, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

আবার জগতে প্রতি ব্যাপারে আমরা দেখিতে পাই, যে সকলেই কোনও না

কোনও উপায়ে আনন্দের অনুসন্ধানে প্রধাবিত। এ অনুসন্ধানের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে সেই একই পরম তত্বে উপস্থিত হইতে হয়। আমরা বুঝিতে পারি, যেমন কিরণ সমষ্টিরূপ সূর্য আকাশে দেদীপ্যমান থাকায়, উহার কিরণ কণা বিশ্বের সর্ব্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ এক আনন্দ স্বরূপ, আনন্দ ঘন মূর্ত্তিতে বিশ্বের কেন্দ্রে বিরাজিত থাকায়, বিশ্বের সর্ব্বত্র আনন্দের খেলা। সত্তা ও জ্ঞানস্বরূপত্বের নির্দ্দেশ পূর্ব্বে পাইয়াছি। এখন আনন্দ স্বরূপের নির্দ্দেশ পাইলাম। সুতরাং পরমতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম। সচ্চিদানন্দস্বরূপ যখন বিশ্বের এবং বিশ্বস্থ সমুদায়ের মূলে, তখন বিশ্বস্থ সমুদায়ে যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ অনুস্যূত থাকিবে তাহার কথা কি? সমুদায়ে এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের সন্ধানই বেদান্তের লক্ষ্য। যদি ইহা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবে আমার চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম সমুদায় সার্থক মনে করিব।

পরিদৃশ্যমান জগতের যে কোনও পদার্থের বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে প্রত্যেক পদার্থে পাঁচটি ভাব বর্ত্তমান। সেই পাঁচটি ভাব প্রাচীন ঋষিগণের ভাষায় বলিতে গেলে, উহারা যথাক্রমে অস্তি, ভাতি, প্রিয়, নাম ও রূপ অর্থাৎ উহাদের অস্তিত্ব, প্রকাশমানত্ব, প্রিয়ত্ব, নাম ও রূপ উহাদের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংজড়িত। এই পাঁচটির মধ্যে প্রথম তিনটি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপগত ভাব বলিয়া, উহারা উপাদেয়, অপর দুইটি অর্থাৎ নাম ও রূপ তাঁহার স্বরূপেতের ভাব, একারণ উহারা তুচ্ছ। এই পাঁচটি ভাবের পৃথক্ প্রতীতি, ভগবানের মায়া বা সংকল্প বশতঃ সংঘটিত। নাম ও রূপ তাঁহার সংকল্প বশতঃই দেশকালাবচ্ছিন্ন প্রপঞ্চের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। আমরা নামরূপের প্রভাবের মধ্যে জাত, স্থিত, বৃদ্ধি প্রাপ্ত। সুতরাং নামরূপের প্রভাব আমাদের উপর সর্ব্বতোভাবে কার্য্য করে। অথচ নামরূপের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভই পুরুষার্থপ্রাপ্তি। উক্ত অব্যাহতি লাভ নামরূপের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই প্রচেষ্টব্য; এবং নামরূপের সাহায্যেই উহা সহজে লাভ করা যায়, একারণ শাস্ত্রে ইষ্টনাম জপের ও ইষ্টরূপ চিন্তনের উপদেশ বিহিত হইয়াছে। জগতের নিম্নস্তরে অনন্ত প্রকারের নামরূপ হইতে মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহৃত করিয়া উচ্চস্তরের এক মাত্র নাম ও রূপে নিষ্ঠা পুরুষার্থ সিদ্ধির সহজ উপায়। ইহা কথার কথা নহে, ইহা বাস্তবিক অনুষ্ঠান জাত এবং একনিষ্ঠতা হইতে লব্ধ ফল। কৃতকর্ম্মা সাধকগণের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত। ওঁঙ্কার উপাসনার মূলে ও উচ্চস্তরের সর্ব্ব আদিম নামরূপের সাহায্যে নিম্নস্তরের বহুধা বিভক্ত নামরূপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একত্বে অবস্থিতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্য। উপাসনাতত্ত্বে যে প্রতীকোপাসনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার মূলে ও ঐ একই উদ্দেশ্য। নামরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, তাঁহার জ্ঞানলাভ সহজে হয় না। ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নামরূপের মধ্য দিয়া নামরূপাতীত বস্তুতে পৌঁছিতে পারা যায়, একারণ ওঁঙ্কারোপসনা,

ইষ্টোপাসনা, প্রতীকোপাসনা, দেবতোপাসনা প্রভৃতির ব্যবস্থা। আশা করি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে।

মৎ প্রণীত "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ ভাগবত" গ্রন্থের ভূমিকারূপে (Introduction) বর্ত্তমান গ্রন্থের আরম্ভ করা হইয়াছিল। নানা বিষয়ের আলোচনায় ক্রমশঃ ইহার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। জ্ঞানতঃ কোনও অবান্তর বিষয় আলোচিত হয় নাই। এবং আলোচনা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। জানিনা, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। ইহাতে যে সমুদায় তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, ভগবদ্ কৃপা ভিন্ন উহাদের স্ফুরণ অসম্ভব। উপযুক্ত অধিকারী না হইলে ভগবদ্ কৃপা লাভ করা যায় না। সেরূপ অধিকারী হইবার অভিমান নাই। তবে বুঝি না বুঝি, শাস্ত্রালোচনায় সময় ক্ষেপন, সৎ সংসর্গে অবস্থান বলিয়া বিশ্বাস করি, এই বিশ্বাসে এবং ভগবানের চরণে নিজের জ্ঞান, অজ্ঞান, বুদ্ধি, অভিমান, কর্ম্ম, প্রচেষ্টা, ফল অর্পণ করিয়া এই আলোচনা শেষ করিলাম। ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন,

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥
গীতা ১৬।১৫

তিনিই বেদান্ত কর্ত্তা ও এক মাত্র বেদান্তবেত্তা তিনি, যদি তিনি অন্তর্য্যামী-রূপে বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থান করিয়া প্রকৃত অর্থ স্ফুরণ করিয়া থাকেন, তবে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি, নতুবা সমুদায় বেদ বেদান্তের তিনিই একমাত্র প্রতিপাদ্য বলিয়া, তাঁহার কথা লইয়া জীবনের কতক দিন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাও যথেষ্ট লাভ। অথবা লাভের আকাঙ্ক্ষা, বা লাভের প্রসঙ্গ কেন ?

যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ।
তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্॥

পরিসমাপ্তি